যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম এক টাকা বারো আনা

প্রথম সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৪০
দ্বিতীয় সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৪২

লেখকের অন্যান্য বই

১। রণ ও রাষ্ট্র—২৲
২। বর্ত্তমান জাপান—১৷০
৩। মহাযুদ্ধে সোভিয়েট—১৷০

মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫ ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

সমরবিজ্ঞান এক দুরূহ বিষয়। এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের নাই বলিলেও চলে। নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে দীর্ঘকাল আমরা দেশরক্ষার দায়িত্ব হইতে দূরে পড়িয়া আছি। নাগরিক জীবনে সেই দায়িত্ববোধকে উপলব্ধি করাইবার রাষ্ট্রীক কর্ত্তব্যবোধেরও একান্ত অভাব। দেশরক্ষা বিভাগ আজও সরকারী দপ্তরখানার অন্তঃপুরেই অবগুণ্ঠনবতী। যতদিন তাহা সর্ব্বসাধারণে আত্মপ্রকাশ না করিতেছে ততদিন বিলাতি পুস্তকাদি ব্যতীত আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে জানিবার কোন উপায়ই আমাদের নাই। এতদসম্পর্কিত বিলাতি পুস্তক আমাদের দেশে একে তো দুর্লভ—তদুপরি বিভিন্ন পুস্তকে পরস্পরবিরোধী মত ও তথ্য প্রবল। তথাপি সেই বিলাতি পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাদি হইতেই এই পুস্তকের মালমসলা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। পরস্পরবিরোধী মতামত যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীতে 'শ্রীসঞ্জয়' নামে লিখিয়াছি এবং অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রবন্ধাকারে অংশবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে সমরপ্রণালী ও মারণাস্ত্রসমূহের যে-সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতিবিধান হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই পুস্তক পাঠে কাহারও মনে যদি সমরবিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের সামান্য স্পৃহাও জাগে—তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—গ্রন্থকার।

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক। আমরা যখন ইহা প্রকাশ করিয়াছিলাম যুদ্ধের আবহাওয়া তখনও আমাদের দেশে এভাবে ঘনাইয়া আসে নাই; য়ুরোপেই তাহা সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই আমরা সামান্য ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে বই এদেশে সমাদৃত হইবে কিনা; কিন্তু সুখের বিষয় পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র অকুণ্ঠিত প্রশংসা লাভ করে এবং বাঙ্গালী পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর পায়। কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়, কিন্তু কাগজ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত।

দ্বিতীয় সংস্করণে সাম্প্রতিক বিষয়গুলিও গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে সন্নিবেশ করিয়াছেন। আকাশযুদ্ধের কৌশল, বিভিন্ন শ্রেণীর বিমান, নৌবলে রূপান্তর, স্থলসেনার গঠন এবং গোলন্দাজ ও পদাতিক—এই কয়টি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। আমরা আশা করি তাঁহার এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক সমাজে অধিকতর সমাদর লাভ করিবে।

কাগজের দুর্মূল্যতা এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির জন্য আমরা কিছু দাম বাড়াইতে বাধ্য হইলাম। ইতি—প্রকাশক।

সূচীপত্র

যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র

প্রারম্ভিকা

মানুষের মধ্যে যত শুভ বুদ্ধিই জাগ্রত হোক না কেন, যুদ্ধবিগ্রহের আদিম প্রবৃত্তিটা যেন তাহার মন হইতে কিছুতেই বিদায় লইতেছে না। সেই পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি এই প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় তাহার মধ্যে বিদ্যমান। বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া মানুষ অন্ধকার যুগ হইতে আলোকের যুগে আসিয়া উপনীত হইলেও যুদ্ধের প্রবৃত্তিটাকে সে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। মানুষের বিজ্ঞানী মন বরঞ্চ প্রস্তরযুগ হইতে যন্ত্রযুগে আসিয়া নিত্য নূতন মারণাস্ত্র আবিষ্কারে অধিকতর উৎসাহী ও তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার প্রলেপে মানবজীবনের এই দুষ্ট ক্ষত সাময়িক ভাবে ঢাকা পড়িলেও সুযোগ-সুবিধা পাইলেই যে তাহা আবার মারাত্মক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মানবজাতির ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ই তাহার সাক্ষ্য দেয়। যুদ্ধের নৃশংসতা মানবমনে যেটুকু আতঙ্ক ও বিষাদ সৃষ্টি করে, তাহা খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সাময়িক আক্ষেপের পরই মানুষের চিত্তপট হইতে তাহা বিলুপ্ত হয়। তাহা না হইলে বিগত মহাযুদ্ধের মর্ম্মন্তুদ ধ্বংসলীলার পর এত শীঘ্রই আবার য়ুরোপে দ্বিতীয় নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইতে পারিত না।

আবহমানকাল যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু উহার কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যও এ পর্য্যন্ত কম প্রচেষ্টা হয় নাই। মানুষের শুভ বুদ্ধি

বারংবার তাহার মনে প্রশ্ন তুলিয়াছে—যুদ্ধ কি একান্তই অনিবার্য্য ও সত্যই অপরিহার্য্য? উহার উর্দ্ধে কি একটা চির অচঞ্চল শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি কিছুতেই হইতে পারে না?

মানুষের মনে এই প্রশ্ন প্রবল হইয়া ওঠে বলিয়াই যুদ্ধোত্তরকালে শান্তি স্থাপনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূর করিবার আশায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হয় এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি সামরিক বলের সমতা রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু কি বিচিত্র ব্যাপার! চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি একে অপরকে অনাক্রমণের যতখানি আশ্বাস দিল, চুক্তির বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনাকে তাহারা ঠিক ততখানি ঘনাইয়া তুলিল। নিরস্ত্রীকরণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াও ভিতরে ভিতরে সকলে সমরসম্ভারে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। অতিস্ফীতির দরুণ য়ুরোপে আজ তাহা বেলুনের মত ফাটিয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে এবং শান্তির স্বপ্নরাজ্য এক ফুৎকারে বুদ্বুদের মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভিত্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা—কাল তাহাকে স্বাভাবিক পরিণতির পথেই টানিয়া লইয়াছে।

সামরিক মাদকতা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান। রাজ-পরিবারে নবজাত শিশুর অভ্যর্থনা হয় কামানগর্জ্জনে। আজীবন শান্তিকামী কোন নরপতি বা রাষ্ট্রনায়কের লোকান্তর ঘটিলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় সামরিক আড়ম্বরে। রাজপরিবারে বিবাহ অনুষ্ঠানে বরানুগমন করে সৈন্যবাহিনী। রাজায় রাজায় বিনিময় হয় সমরপরিচ্ছদ। রাজপুরুষের সংবর্দ্ধনা হয় তোপধ্বনিতে। শান্তির বার্ত্তা বহন করে রণতরী। নকলযুদ্ধে আদায় হয় সাহায্য ভাণ্ডারে চাঁদা। যুদ্ধাবসানকালেও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে যেখানে সমরদেবতার এতখানি প্রভাব, সেখানে মানুষের মন যে স্বভাবতঃই যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিবে—তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যুদ্ধের মাদকতা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে এভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে কেন? আরও প্রশ্ন জাগিতে পারে, প্রতি যুদ্ধের পর বিজয়ী-বিজিতের স্কন্ধে যে অশেষ দুর্গতির বোঝা নামিয়া আসে, রক্তমোক্ষণের ফলে এক একটা জাতির মধ্যে যে অপরিমেয় অবসাদ দেখা দেয়, তারপরও মনুষ্যজাতির মধ্যে আবার যুদ্ধের স্পৃহা জাগা সত্যই কি বিস্ময়কর নয়? কেহ কেহ বলেন, এক শ্রেণীর যুদ্ধবাদী আছেন যাঁহারা যুদ্ধকেই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত জার্ম্মান জেনারেল লুডেনডর্ফ ছিলেন এই মতের পরিপোষক। ভার্সাই সন্ধির পর জার্ম্মানীতে নাৎসী শক্তির অভ্যুত্থানকালে তিনি সার্ব্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহার সেই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়াই হিটলারের সমরায়োজন। জেনারেল লুডেনডর্ফের মতে সার্ব্বিক নীতিই হইল এই যে, যুদ্ধের সময় জাতি তাহার সমস্ত শক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত করিবে এবং শান্তির সময় পরবর্ত্তী যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত হইবে। যুদ্ধই জাতীয় জীবন বিকাশের পথ; কাজেই রাজনীতি সমরনীতিকে অনুসরণ করিবে। এই শ্রেণীর যুদ্ধবাদীদের মতে যুদ্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা নয়, তাহাই জাতির লক্ষ্য। অতএব তাঁহারা মনে করেন, যুদ্ধের কখনও শেষ নাই; সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুদ্ধও অনন্তকালব্যাপীই চলিবে।

জগতে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য এই যুদ্ধবাদীরা যে আংশিক ভাবে দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ অনুসন্ধানে মানবের বুদ্ধি আরও অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। একদল লোকের অনুমান, মানবসভ্যতার মূলে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান, তাহাই বার বার যুদ্ধকে ডাকিয়া আনিতেছে। কেবল অনুমান নয়; তাহার পশ্চাতে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রহিয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব।

আধুনিক শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রগুলি এমন ভাবে গঠিত যে, ঐ সকল রাষ্ট্রের উৎপন্ন মালের একটা বৃহদংশ বাহিরে রপ্তানী না করিলে চলে না। অবশ্য

কোন রাষ্ট্র কোন বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদনে অগ্রণী হইলে তাহাতে আপত্তির কিছু কারণ নাই ; তাহাতে শিল্পোৎপাদন উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং অর্থনীতির দিক দিয়া তেমন আন্তর্জ্জাতিক কর্ম্মবিভাগ অবাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু আধুনিক শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রগুলি এই আন্তর্জ্জাতিক কর্ম্মবিভাগকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রায় একই ধরণের পণ্য উৎপাদন করে এবং তাহার ফলে বাহিরে পণ্য বিক্রয়ের বাজার লাভ ও কাঁচা মাল সংগ্রহ লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়।

প্রত্যেক দেশের পুঁজিবাদীরাই চান, কোন একটা বাজারে তাঁহাদেরই ব্যবসাবাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার থাকুক ; অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজি-বাদীর দল সেখানে প্রবেশ করিয়া যেন কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারেন। এই একচেটিয়া অধিকার রাখিবার জন্যই পুঁজিবাদীদের প্রয়োজন স্ব স্ব প্রভাবিত এলাকার। প্রত্যেক পুঁজিবাদী দলই এতদুদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের সুর ধরেন এবং বাজার হাতে রাখিবার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে স্ব স্ব রাষ্ট্রের শাসকদিগকে উৎসাহিত করেন। পুঁজিবাদীদের পক্ষচ্ছায়াপুষ্ট শাসকগণ তখন কোন একটা অজুহাতে দেশ বিশেষকে হয় আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেন, অথবা সুবিধা পাইলে একেবারে তাহা গ্রাস করিয়াই বসেন। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের মূলে রহিয়াছে এই নীতি।

পণ্য রপ্তানী অপেক্ষা পুঁজিবাদীদের মূলধন রপ্তানী আরও বেশী মারাত্মক। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা হয়ত পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক, কোন একটি অনগ্রসর দেশে রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য আর এক দেশের ধনপতিরা মূলধন দিলেন। এই বিদেশী ধনপতিদের তখন লক্ষ্য থাকিবে, যাহাতে প্রথমোক্ত দেশের শাসন-ব্যাপারে কোন গোলযোগ উপস্থিত না হয় ; কারণ সেখানকার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার উপরই তাঁহাদের মূলধন ও তাহার সুদের নিরাপত্তা নির্ভর করিবে। কোন অশান্তি বা রাজনৈতিক গোলযোগ হইলেই বিপদ ; নিশ্চিন্তে মূলধন বিনিয়োগ এবং তাহার সুদ গণনা আর চলিবে না।

কাজেই যে-দেশে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তাহার শাসন-ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য ধনপতিরা স্বদেশে শাসকদের উপর চাপ দেন এবং শাসকরাও ধনপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বাহক হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ লয়েড জর্জ্জ বৃটিশ অর্থসচিব রূপে পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতায় বলেন, "বিদেশে বৃটেনের প্রায় ৪ শত কোটি পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৫২ শত কোটি টাকা) মূলধন হিসাবে খাটে।" বলা বাহুল্য, এই মূলধনের নিরাপত্তা দেখা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য।

পণ্য রপ্তানীর বিনিময়ে অন্য পণ্য আমদানী করিয়া তবু নিরপেক্ষ ভাবে কোন রকমে বাণিজ্য করা চলে; কিন্তু কোথাও মূলধন রপ্তানী করিয়া সেখানে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিলে ধনপতিরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কাজেই বলিয়াছি, পুঁজিবাদী শিল্প-প্রধান দেশসমূহের পণ্য রপ্তানী অপেক্ষা মূলধন রপ্তানী ঢের বেশী মারাত্মক।

আধুনিক যুদ্ধের আর এক কারণ কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে-সব দেশে শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল অধিক পরিমাণে বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়, সেই সব দেশের শিল্পপতিরা স্বভাবতঃই চান যাহাতে কাঁচা মাল সরবরাহকারী দেশগুলির উপর স্বদেশের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; তাহা না হইলে নির্ব্বিবাদে কাঁচা মাল লাভ করা যায় না। তেল, লোহা প্রভৃতির ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় মাল বাহির হইতে লাভ করিতে হইলে শিল্পপতিরা রাজ-শক্তির সাহায্য লইবেনই লইবেন। এই একই উদ্দেশ্যে গত মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী জাতিসমূহ ম্যাণ্ডেট-শাসিত এলাকাগুলিতে সভ্যতার ধ্বজা বহনের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কোন এলাকায় প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যই হইল সেখানে অবাধে পণ্য বিক্রয়, মূলধন বিনিয়োগ এবং কাঁচা মাল সংগ্রহ করা।

এই শোষণনীতি লইয়াই আজ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী

বনিয়াদে যাহারা শোষণব্যবস্থাকে কায়েম করিয়া লইয়াছে, তাহারা প্রাণপণে তাহা রক্ষার জন্য চেষ্টিত ; আর যাহারা মনে করে যে, এই শোষণের 'সঙ্গত' অধিকার হইতে অন্যায় ভাবে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহারা নববিধানের সুর ধরিয়া প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। বাহ্যতঃ পৃথক বলিয়া মনে হইলেও মূলে একই কারণ বিদ্যমান—আসল উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তিতে পুঁজিবাদের পরিবর্দ্ধন।

অতএব দেখা যায়, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টানিতে হইলে এই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান একান্ত আবশ্যক। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে রপ্তানী লইয়া পারস্পরিক বিরোধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় বিধানের ফলে শ্রমিকগণ যেমন কেবল উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তেমন হইতে পারে না। সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও অনেকখানি উন্নত হইবে এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া ক্রয়শক্তি বাড়িবে। এই ক্রয়শক্তির মান নির্ণয় করিয়াই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবে। শিল্পসমূহ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের অবসর না থাকায় সাম্রাজ্যবাদী শিল্প-প্রধান রাষ্ট্রগুলির ন্যায় সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল উৎপাদন করা হইবে না এবং কাঁচা মাল সংগ্রহ, মূলধন বিনিয়োগ ও পাকা মাল বেচিবার জন্য সে সাম্রাজ্যেরও প্রয়োজন বোধ করিবে না। কাঁচা মাল উৎপাদন ও শিল্পজাত মাল বিক্রয়ের দিক দিয়া সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে ; বিশেষ কোন পণ্য বিনিময়ের প্রয়োজন হইলে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি বিনিময়ের সাধারণ নিয়মানুসারে শান্তিপূর্ণ ভাবেই তাহা করিবে ; গোলাগুলী লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইবে না। উপনিবেশ বলিয়া কিছু থাকিবে না, কাজেই বলপূর্ব্বক বাজার দখলের কোন প্রশ্নই উঠিবে না। তারপর ব্যক্তিগত

মুনাফার অবসর না থাকায় বণিকদের আয় বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হইবে; বাহিরে রপ্তানী করিয়া মুনাফা করার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল উৎপাদন করা হইবে না। কেবল অন্য রাষ্ট্রের সহিত বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হইলে বিশেষ শ্রেণীর পণ্য স্বরাষ্ট্রের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করা চলিবে। পুঁজিবাদী দেশের মত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থাকিবে না এবং এই দ্বন্দ্বহীনতার মধ্যেই দেখা দিবে লোকের প্রাণশক্তি ও সামাজিকবোধ। ইহা স্বপ্ন নয়, কাব্য নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর যে যন্ত্রবিপ্লব পুঁজিবাদীদের হাতে পড়িয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করিতেছে, তাহাই সোভিয়েট রুশিয়ায় মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তথাকার সমাজজীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। জগতের নিপীড়িত জনগণের একমাত্র আশার প্রদীপ সেই সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্র আজ ফাসিস্ত আক্রমণে বিপন্ন।

ভাবীকালে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ হইবে কি? তাহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণসমূহ থাকিয়াই যায়, তবে স্থায়ী শান্তি কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাময়িক ভাবে চাপা পড়িলেও অন্তর্নিহিত স্বার্থসংঘাতের ফলে আবার অশান্তির আগুন জ্বলিয়াই উঠিবে—রাষ্ট্রসংঘেরই মত তাহা আর এক প্রহসনে পরিণত হইবে। স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে হইলে যুদ্ধের মূল কারণগুলি দূরীভূত করা একান্ত আবশ্যক এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বারাই তাহা সম্ভব। অতএব ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ লইয়া বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেই শুধু স্থায়ী শান্তি সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া চলে; নতুবা ক্ষত আরোগ্য না করিয়া চাপা দিতে গেলে তাহাতে বিড়ম্বনা আরও বাড়িবে মাত্র।



যুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবিকা

বিমানযুদ্ধ

এইবারের মহাযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হইল বিমান আক্রমণ। গত মহাযুদ্ধেও বিমান আক্রমণ চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু তখন ছিল উহা একরকম শৈশব অবস্থায়। সেই সময় জলপথে ও স্থলপথেই যুদ্ধ হইত বেশী। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বিমানপোতের সংখ্যা ছিল অতি সামান্যই। যুদ্ধের শেষদিকে অর্থাৎ তিনচারি বৎসরের মধ্যে বিমানপোতের অনেকখানি উন্নতি হয় এবং সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়ে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণে বিমানযুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে এবং বিমান আক্রমণ ও তাহা প্রতিরোধের যে সকল নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত গত মহাযুদ্ধের বিমানসজ্জার কোন তুলনাই হইতে পারে না। সে সময় বিমানপোতও এতখানি উৎকর্ষ লাভ করে নাই এবং এমন সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত বিমানবাহিনীও তখন ছিল না। সাধারণ নাগরিক জীবনের নিরাপত্তাও তখন এতদপেক্ষা কম বিপন্ন ছিল।

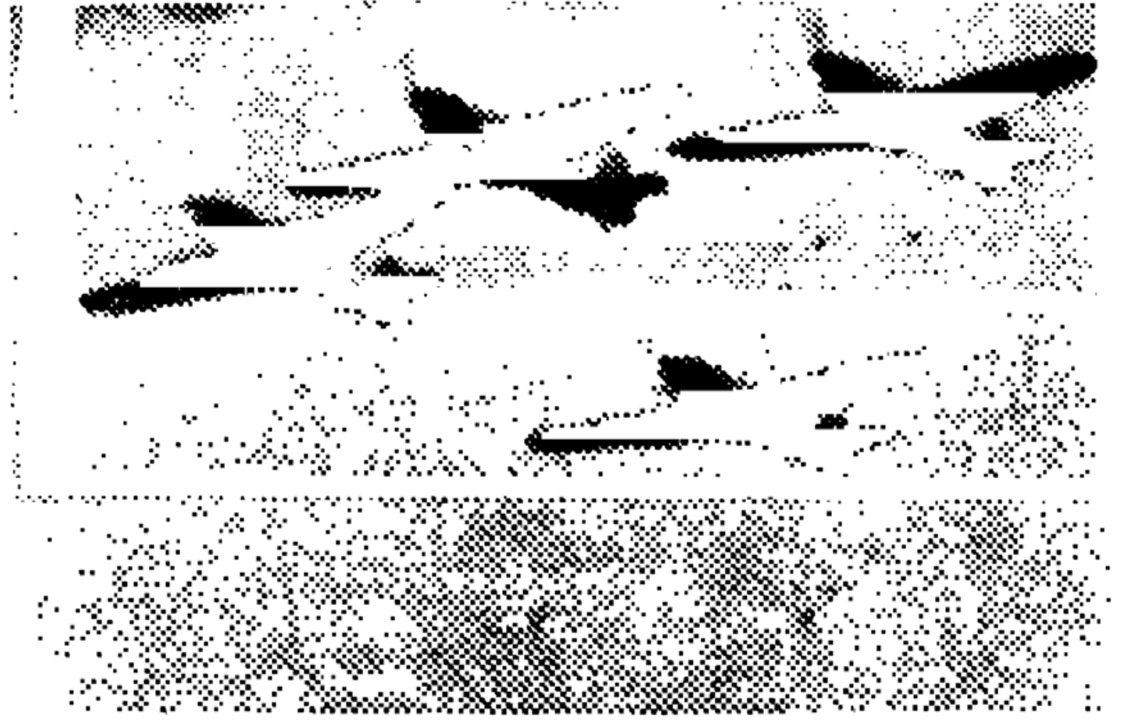
স্থলে ও জলে শত্রুপক্ষকে বাঁধা-নির্দ্দিষ্ট পথে আসিয়া আক্রমণ করিতে হয়; কাজেই শত্রুপক্ষের গতিবিধি জানা অনেকাংশে সম্ভব। বিমান আক্রমণের মত এত অতর্কিত আক্রমণ সেইক্ষেত্রে হয় না এবং শত্রুপক্ষ আসিয়া অনায়াসে ঘুমন্ত নগরীর উপর বোমা ফেলিয়া যাইতে পারে না। স্থল ও জলপথে যুদ্ধ হইলে সংগ্রামক্ষেত্র হইতে সময়মত অসামরিক অধিবাসীদিগকে দূরে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখিবার সুযোগ পাওয়া যায়; কিন্তু বিমানপথে

আসিয়া শত্রুপক্ষ যে কখন বোমা ফেলিয়া যাইবে তাহার কিছু ঠিক নাই। এইজন্যই ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের তুলনায় এই মহাযুদ্ধে অসামরিক সাধারণ অধিবাসীদের ধনপ্রাণ অধিকতর বিপন্ন হইয়াছে।

বিমানযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য হইল শিল্পকেন্দ্র, বন্দর ও নগরগুলি বিধ্বস্ত করা। বিমানযুদ্ধের দ্বারা সত্যকারের জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় না। দেশ জয় করিয়া দখলী নিশান গাড়ীতে হইলে প্রয়োজন স্থলসেনার। শত্রুপক্ষ যাহাতে পরাজয় স্বীকার বা সন্ধি করিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য বিমান আক্রমণে প্রধানতঃ শত্রুপক্ষের রসদ বন্ধ করিবার চেষ্টা চলে। এইজন্যই শত্রুপক্ষের কল কারখানা ধ্বংসের জন্য বিমানবাহিনী সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টিত হয়। শ্রমিকগণ যাহাতে কারখানায়, রেলওয়ে এলাকায়, ডকে এবং বাজারে-বন্দরে থাকিয়া কাজ না করিতে পারে, তজ্জন্য ঐসব অঞ্চলে শত্রুপক্ষের বিমান আসিয়া বোমাবর্ষণ করিয়া যায়।

তারপরই চেষ্টা চলে কি করিয়া সেতুগুলি বিধ্বস্ত করা সম্ভব। সেতু বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিমান হইতে বোমা ফেলা হয়। বোমা যদি লক্ষ্যচ্যুত না হয় তবে সেতুর ধ্বংস অনিবার্য্য। সেতু ভাঙ্গিতে পারিলেই যানবাহন ও লোক চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

বিদ্যুৎশক্তি বর্ত্তমান যুগে নাগরিক জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু। ইহাতে কল কারখানা চলে, আলো জ্বলে এবং আরও কত কি কাজ হয়। কাজেই শত্রুপক্ষ চেষ্টা করে যাহাতে বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য বিদ্যুতের কারখানাগুলি বিমান আক্রমণের আর একটি প্রধান লক্ষ্যস্থল। বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হইলে ভূগর্ভে এবং ভূপৃষ্ঠে বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে-সকল আশ্রয়স্থল নির্ম্মিত হয় সেইগুলিতে বৈদ্যুতিক পাখা আর ঘুরিতে পারে না; ফলে শ্বাসরোধ হইয়া লোক সেখানে মারা যায়। বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হইলে এই দিক দিয়াও বিপদের সম্ভাবনা কম নয়।



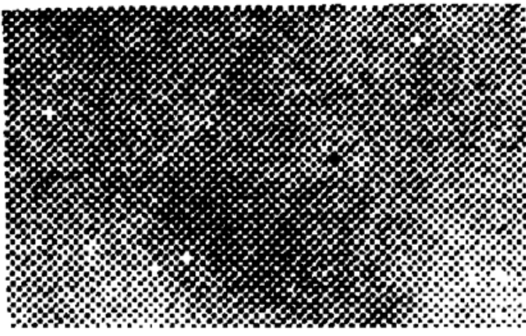
বহু ঊর্দ্ধে উড়ন্ত বিমানসমূহ

তারপর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদের কারণ হয় যদি শত্রুপক্ষ তেলের ট্যাঙ্কগুলির উপর বোমা ফেলিতে পারে। তেলের গুদামে বোমা ফেলিতে পারিলে শত্রুপক্ষের জয়জয়কার; কারণ তেল ছাড়া আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ অচল। এক কথায় বলিতে গেলে তেল না হইলে আধুনিক যুদ্ধ দুই দিনও চলে না।

জল সরবরাহ বন্ধ করিবার জন্যও শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনী কম চেষ্টা করে না। অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় অভাবে নাগরিক জীবন যাহাতে অসম্ভব হইয়া ওঠে তৎপ্রতিই থাকে শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।

এই গেল বিমান আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলগুলির কথা। এতদ্ব্যতীত ব্যাপক ভাবে যখন বিমান আক্রমণ চলে তখন তাহা হইতে কিছুই অব্যাহতি পায় না। গগনচুম্বী অট্টালিকাসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্য্যন্ত সবই শত্রুপক্ষের বোমায় বিধ্বস্ত হইয়া ধূলিসাৎ হয়। বহু শতাব্দীর সাধনার বস্তু এক একটি বিরাট নগরী মাত্র কয়েক দিনের বিমান আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

বিমান আক্রমণে যে কেবল ঘরবাড়ী বিধ্বস্তই হয় এমন নয়; আগ্নেয় বোমার বর্ষণে এক একটা প্রকাণ্ড নগরীতে দাবানল জ্বলিয়া ওঠে। প্রতিপক্ষের এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটাইবার জন্য যুদ্ধের প্রথম দিকে যে আগ্নেয় বোমা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম থারমাইট বোমা। ঐগুলির ওজন দেড় সের



'ব্রেন-গান' লইয়া স্কট সৈন্যগণ লক্ষ্য স্থির করিতেছে

দুই সেরের বেশী নয়। শত্রুপক্ষ আসিয়া ঐগুলি একটা সহরের উপর বিস্তর ফেলিয়া যাইতে পারে। বোমাগুলি এতই মারাত্মক যে, লোহা এবং ইঁট পাথরে পর্য্যন্ত উহা আগুন ধরাইয়া দেয়। সাধারণতঃ যে-সকল বাড়ী আগুনে পোড়ে না বলিয়া বলা হয়, ঐ বোমা পড়িলে সেইগুলিতে পর্য্যন্ত আগুন ধরে। দমকলের সাধ্য নাই উহা নিভাইতে পারে। জলেও সেই আগুন নিভে না। যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে পেট্রোল বোমা, ফসফরাস্ বোমা প্রভৃতি আরও নানা প্রকার আগ্নেয় বোমা ব্যবহারের কথা আমরা শুনিতে পাই। পরে বোমা প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব।



বিষবাষ্প হইতে আত্মরক্ষার জন্য
গ্যাসমুখোস পরিহিত সৈনিক

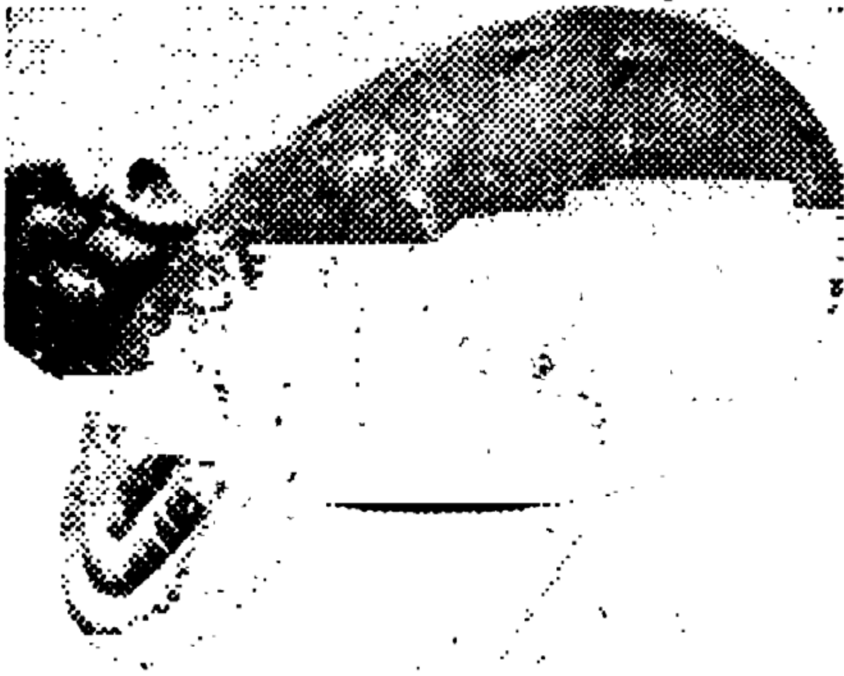
এইবার বিমান আক্রমণ ও তাহা প্রতিরোধের যে-সকল নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলিব।

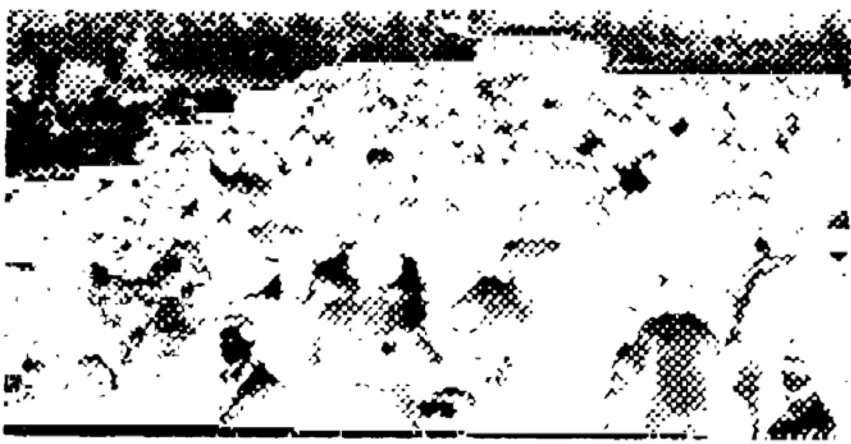
বিমান হইতে শত্রুপক্ষ বিষবাষ্প ছড়াইয়া যখনই লোকের প্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল, তখনই আবিষ্কার হইল গ্যাস-মুখোসের। এই গ্যাসমুখোস আজকাল আমাদের দেশে না হইলেও অনেক দেশে ঘরে ঘরে প্রচলিত। শত্রুপক্ষের বিষবাষ্প হইতে আত্মরক্ষার জন্য সেই সব দেশের নর-নারী প্রায় সকলেই ইহার ব্যবহার শিখিয়াছে।

শত্রুপক্ষের বিমানকে ভূপাতিত করিবার জন্য লম্বা পাল্লার বিমানধ্বংসী কামান অল্পবিস্তর আজকাল সকল দেশেই আছে। ঐ সকল কামানের মুখে পড়িলে কোন বিমানের আর রক্ষা নাই। কিন্তু অনেক সময় ঐগুলিকেও এড়াইয়া শত্রুপক্ষ আসিয়া বিমান হইতে বোমা ফেলিতে সক্ষম হয়। এই জন্য বিমানধ্বংসের উপায় উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিকগণ আরও অনেকখানি মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে, য়ুরোপে একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি শক্তিশালী আলোক-রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা কোন বিমানের উপর ফেলিবামাত্র উহা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার চেষ্টা আজও হয়তঃ ফলবতী হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যে হইবে না এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেজর এইচ জে মুর বিমানধ্বংসের আর একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার নাম 'এরিয়ল মাইন' বা আকাশ-মাইন। যুদ্ধজাহাজ বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যেমন সমুদ্রে স্থানে স্থানে জলমগ্ন মাইন স্থাপন করা হয়, এই মাইনগুলিও তেমনই আকাশে দূরে দূরে এক একটি বিমান-আক্রমণের ঘাঁটির কাজ করিবে। এই অভিনব মাইনগুলি খুব হাল্কা অথচ কোন উড্ডীয়মান বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই ফাটিয়া গিয়া সম্মুখে যাহা পাইবে তাহাই ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে। এই মাইন ব্যবহারের পদ্ধতি এখনও নিখুঁত হয় নাই। আকাশে ভাসমান মাইনে লাগিয়া স্বপক্ষের ফাইটার বিমানও জখম হইতে পারে। এইজন্যই অদ্যাবধি ইহা যুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। এই আকাশ-মাইনের ধ্বংসশক্তি সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহ নাই; কেবল নির্ব্বিঘ্নে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইলেই ইহা যুদ্ধে ব্যবহার করা চলিবে।

অতঃপর আসে বেলুন-ব্যারেজের কথা। এক একটি বাষ্পপূর্ণ বিরাট বেলুন লোহার তারে বাঁধিয়া শূন্যে উড়াইয়া রাখা হয়। শত্রুপক্ষের বিমান যখন লক্ষ্য স্থলে বোমা ফেলিবার জন্য নীচে নামিয়া আসে, তখন এই

বেলুনগুলির সহিত হয় উহার সঙ্ঘর্ষ। ফলে বেলুনে লাগিয়া কিংবা উহার তারে জড়াইয়া শত্রুপক্ষের বিমান বিপন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রে অতর্কিতে আসিয়া যাহাতে বিমান হইতে শত্রুপক্ষ বোমা ফেলিয়া না যাইতে পারে, বিশেষভাবে তদুদ্দেশ্যেই এইগুলি নগরের উপর শূন্যে উড়াইয়া রাখা হয়। এইগুলিকে বিশ হাজার হইতে ত্রিশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উড়াইয়া রাখা চলে। বেলুনগুলি লোহার তারে বাঁধিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে উহাদের শূন্যে অবস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।





শত্রুপক্ষের বিমানকে বাধা দিবার জন্য বেলুন আকাশে উড়াইয়া রাখা হইয়াছে

প্রতিপক্ষের হানাদার বোমারু বিমানকে উর্দ্ধাকাশে রাখাই বেলুন-বাঁধ স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য। বিপক্ষের বোমারু বিমানকে উর্দ্ধাকাশে রাখিতে পারিলে দুই কারণে সুবিধা হয়। প্রথমতঃ, নিম্নাকাশচারী বোমারু বিমান এত দ্রুত আসিয়া দ্রুত চলিয়া যায় যে, বিমানধ্বংসী কামান তো দূরের কথা, অনেক সময় মেশিনগান সাহায্যেও সেইগুলিকে তাক করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, নিম্নাকাশে না আসিতে পারিলে বোমারু বিমানের লক্ষ্য স্থির করিয়া নির্ভুল ভাবে বোমা ফেলাও কঠিন। এই দুই কারণেই আজকাল অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যস্থলের উপর একাধিক বেলুন উড়াইয়া রাখা হয়। তবে ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মার্কিন সমর-বিশেষজ্ঞ মিঃ ভিন্সেণ্ট শীয়ান সন্দেহ প্রকাশ

করিয়াছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের উপর হিটলারের বিমান বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ চালাইবার সময় তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শনে যান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের সময় লণ্ডন রক্ষায় বেলুন-বাঁধ তেমন বিশেষ কোন উপকারে আসে নাই।



বিমান হইতে প্যারাশুট সাহায্যে পদাতিক সৈন্য শত্রুসেনাদলের পশ্চাতে অবতরণ করিতেছে

শত্রুপক্ষের বিমানগুলি বহুদূরে থাকিতেই যাহাতে তাহাদের শব্দ শুনিয়া দিক নির্ণয় করা যায়, তজ্জন্য খুব সূক্ষ্ম শব্দগ্রাহী যন্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে। একবার দিক নির্ণয় হইলেই যেই দিক হইতে শব্দ শুনা যায় সেই দিকে বহুদূর-

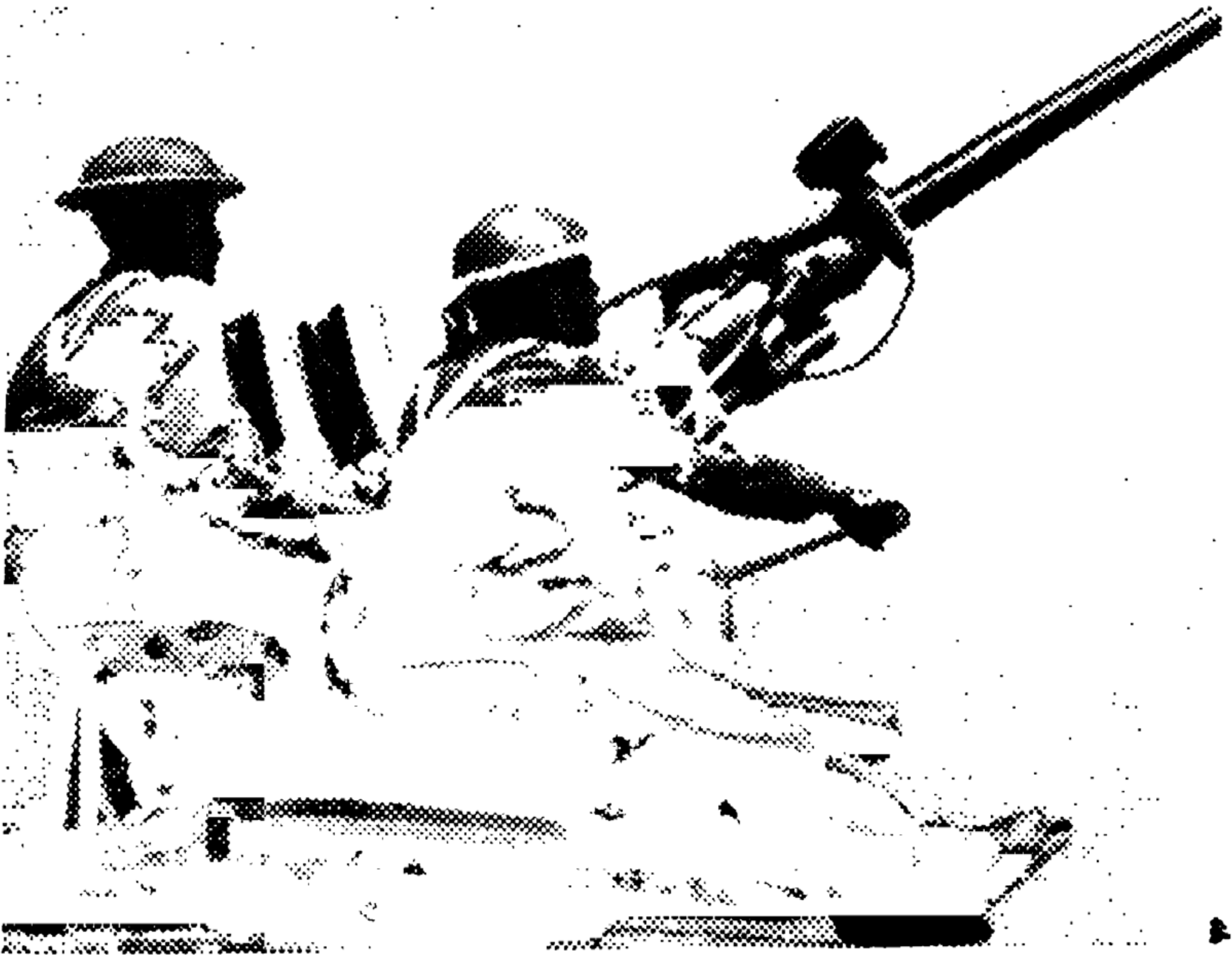
প্রসারী সার্চ্চলাইট ফেলা হয়। যখন দেখা যায়, শত্রুপক্ষের বিমানগুলি কামানের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন বিমানধ্বংসী কামানের সাহায্যে সেইগুলিকে ঘায়েল করা হয়।

বিপদের সময় প্যারাশুট সাহায্যে বিমান হইতে যে নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করা যায়, ইহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্যও আবার এই প্যারাশুটের সাহায্য লওয়া হয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি সৈন্যবাহী বিমান শত্রুপক্ষের এলাকায় উড়িয়া গিয়া প্যারাশুট সাহায্যে শত্রু-সৈন্যদলের পশ্চাতে পদাতিক সৈন্য নামাইয়া দেয়। তাহারা অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এই ফন্দীটি বাহির করে প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়া। কিন্তু জার্ম্মানী ইহার অনেক উন্নতিবিধান করে। ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মান প্যারাসুট বাহিনীর কৃতিত্ব ও সাফল্য দেখিয়া জগদ্বাসী বিস্মিত হইয়া যায়। রসদ, অস্ত্র প্রভৃতিসহ ডিভিসনের পর ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য সেখানে অবতরণ করে। সম্পূর্ণরূপে বিমানবাহিনীর সাহায্যে হিটলার ক্রীট দখল করেন। এমন কি ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত বিমান-সাহায্যে নামান হয়। ক্রীট যুদ্ধের পর প্যারাশুটবাহিনীর অসামান্য শক্তি সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না।

এই গেল বিমান আক্রমণের কথা। বিনা অস্ত্রে বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও কম হয় নাই। শত্রুপক্ষ রাত্রির অন্ধকারে আসিয়া যাহাতে লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করিতে না পারে তজ্জন্য বড় বড় সহরগুলিকে নিষ্প্রদীপ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্যাস-মুখোসের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তারপর পরিখা খনন, ভূগর্ভে কুঠরি নির্ম্মাণ, ইস্পাতের দুর্ভেদ্য আশ্রয়স্থল তৈয়ার প্রভৃতি নানাভাবে বিমান আক্রমণ হইতে নাগরিকদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ হইতে বৃটেনরক্ষার জন্য যে আয়োজন আছে, এবার তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলে মন্দ হইবে না।

বৃটেনে একদল ফাইটার বিমান আকাশে সর্ব্বদাই উড়িয়া বেড়ায়। দিনে রাত্রে ঐগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দেয়। শত্রুপক্ষের কোন বিমান আসিলেই ঐগুলির সঙ্গে বাধে তুমুল লড়াই। তারপর আছে বিমানধ্বংসী কামানের পালা। বৃটেনের সমস্ত রণতরীতেই চার ইঞ্চি মুখের বিমানধ্বংসী কামান আছে। সবচেয়ে মারাত্মক কামান হইল 'পমপম গান'। ঐগুলি হইতে



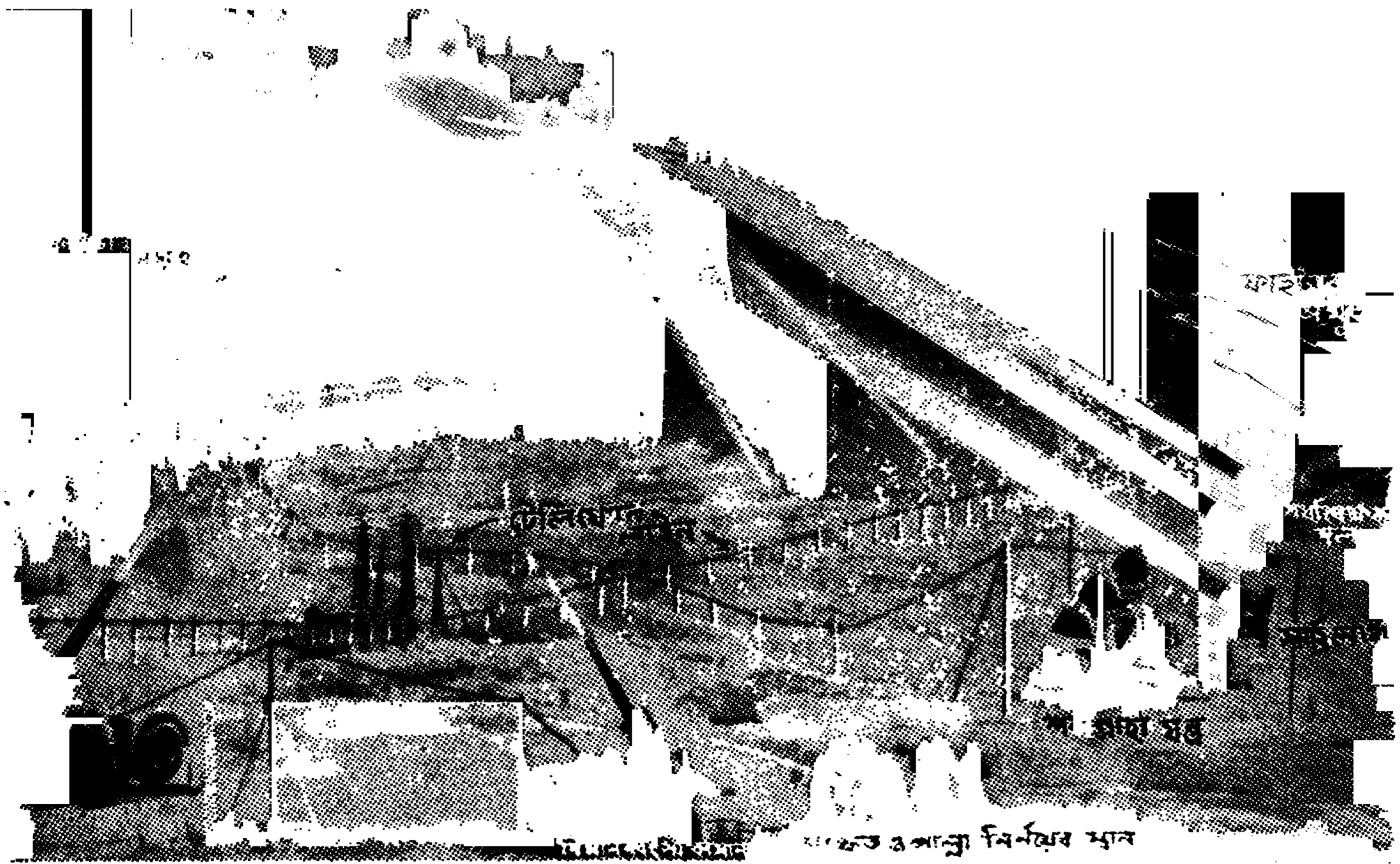
বিমানধ্বংসী কামান

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক গোলা দাগা যায়। বৃটিশ রণতরীর ঐ শ্রেণীর কামানগুলিকে শত্রুপক্ষের বৈমানিকগণ সত্যই ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিমানধ্বংসী কামানে সজ্জিত বৃটিশ রণতরীগুলি বৃটেনের উপকূল ঘেঁষিয়া সর্ব্বদাই সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়।

বৃটেনের পাঁচ প্রকার বিমানধ্বংসী কামান আছে। তিন ইঞ্চি মুখের যে কামানগুলি আছে ঐগুলির গোলা প্রায় ২৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে ওঠে। এক একটি গোলার ওজন ১৬ পাউণ্ড। এতদ্ব্যতীত ৩.৭ ইঞ্চি এবং ৪.৫ ইঞ্চি মুখের যে বিমানধ্বংসী কামানগুলি আছে সেইগুলির গোলা ওঠে প্রায় ৪০ হাজার ফুট উর্দ্ধে এবং ঐগুলি হইতে যথাক্রমে প্রতি মিনিটে ১২টি ও ৮টি করিয়া গোলা ছোটে। ৩.৭ ইঞ্চি মুখের কামানগুলি হইতে যে গোলা ছোঁড়া যায় সেইগুলির এক একটির ওজন ২৮ পাউণ্ড। এই শ্রেণীর কামানগুলি প্রয়োজন মত স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়। আর ৪.৫ ইঞ্চি মুখের কামানগুলিকে একস্থানে বসাইয়া রাখা হয়; বহু উর্দ্ধে বিচরণশীল শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানগুলিকে ঘায়েল করিবার জন্যই এই শ্রেণীর কামানের সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট বিমানধ্বংসী কামানও বিস্তর আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাত্রিতে শত্রুপক্ষের বিমানকে দৃষ্টিপথে আনিবার জন্য বহুদূর প্রসারী সার্চ্চলাইটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে-সকল স্থানে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, সেই সকল স্থানে প্রতি দুই মাইল অন্তর এক একটি সার্চ্চলাইট বসান হইয়াছে। এই সার্চ্চলাইটগুলির এক একটির শক্তি প্রায় ২৫ কোটি ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সমান। আবহাওয়া ভাল থাকিলে ঐগুলি আকাশে ফেলিয়া ছয় মাইল দূরের জিনিসও দেখা যায়। প্রত্যেকটির সহিত টেলিফোনের যোগসূত্র আছে। শত্রুপক্ষের কোনও বিমানের সন্ধান পাইলেই উহার উপর একসঙ্গে তিনটী সার্চ্চলাইট ফেলা হয়। সেই অবস্থায় কোন বিমানের আর আত্মগোপন করা সম্ভব হয় না।

সার্চ্চলাইটকে এড়াইয়া যাওয়া যদিও বা কোনভাবে সম্ভব হয়, বিমানের শব্দকে আর গোপন করা চলে না। শব্দগ্রাহী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে বিমানের শব্দ ধরা পড়িবেই। শব্দগ্রাহী যন্ত্রে যখন বুঝা গেল, কোন্ দিক এবং কতদূর হইতে শত্রুপক্ষের বিমান আসিতেছে, তখন স্বপক্ষের ফাইটার-



অ চিত্রে একসঙ্গে দেখান হই

বিমানগুলিকে সাংকেতিক উপায়ে দেওয়া হইল সেই সংবাদ [illegible] ফাইটার-বিমানগুলি তখনই ছুটিল শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের সন্ধানে।

এখানে বিষয়টাকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতে পারে। প্রতিপক্ষের বিমানধ্বংসের জন্য কামান দাগিবার সময় প্রধানতঃ যে সূক্ষ্ম যন্ত্রের উপর নির্ভর করা হয়, উহাকে বলে 'প্রেডিক্টর' বা বিমান-সন্ধানী যন্ত্র। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় এই যন্ত্রের কার্য্যকারিতা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হয়। যন্ত্রগুলি দেখিতে এক একটি বিরাট ক্যামেরার মত। ক্যামেরার মতই ত্রিপায়ার উপর উহা বসান থাকে। শত্রুবিমান আসিতেছে টের পাইলেই এই যন্ত্রের সাহায্যে চালকগণ উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে। শত্রু বিমানের উচ্চতা, গতিবেগ ও গতিপথ এই যন্ত্রে আপনা হইতেই ধরা পড়ে। তাহা দেখিয়াই স্থির করা যায়, কিভাবে, কোথায়, কোন্ দিকে এবং কখন বিমানধ্বংসী কামান দাগিলে লক্ষ্যভেদ হইবে। এই যন্ত্রের দ্বারা শত্রুবিমান কোথায় আছে তাহা নিরূপণ করা হয় না; কামান দাগিলে গোলা গিয়া যখন বিমানকে আঘাত করিবে তখন বিমানখানি কোথায় থাকিবে, এই যন্ত্র তাহারই নির্দ্দেশ দেয়। এইজন্যই ইহাকে বলা হয় 'প্রেডিক্টর'।

প্রেডিক্টরের সঙ্গে বিমানধ্বংসী কামানের বৈদ্যুতিক তারে যোগ থাকে। তৎসাহায্যে প্রেডিক্টর হইতে গোলন্দাজকে সংকেত দেওয়া হয়। গোলন্দাজ তখন সেই সংকেত অনুসারেই কামান দাগে; লক্ষ্যের দিকে তাকাইবার তাহার কোন প্রয়োজন হয় না।

প্রেডিক্টর যন্ত্রকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য শত্রুবিমানের চালক অনেক সময় তাহার বিমানকে আঁকাবাঁকা পথে সর্পিল গতিতে চালায়। তাহাতে বিমানের গতিপথ এই যন্ত্রে ধরা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিপক্ষের তাহাতে অসুবিধাও আছে। নির্ভুলভাবে লক্ষ্যের উপর বোমা ফেলিতে হইলে তাহার বিমানের গতি ঋজু পথেই হওয়া দরকার; বিপক্ষের প্রেডিক্টর যন্ত্রকে ফাঁকি দিবার জন্য আকাশে আঁকাবাঁকা পথে চলিলে তাহার বোমারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া

খুবই স্বাভাবিক। কাজেই প্রেডিক্টরকে ফাঁকি দিবার জন্য বোমারু বিমানের চালকদের অনেক সময়ই আঁকাবাঁকা পথে চলা সম্ভব হয় না।

'সাউণ্ড লোকেটর' বা শব্দগ্রাহী যন্ত্রের কথা আগেই বলিয়াছি। বিমান-ধ্বংসী কামান দাগিবার পক্ষে ইহাও আর একটি অত্যাবশ্যক যন্ত্র। বিপক্ষের বিমানের এঞ্জিনের শব্দ হইতে উহার অবস্থান নির্ণয় করাই এই যন্ত্রের প্রধান কাজ। এই যন্ত্র চলন্ত ট্রাকের উপর বসান থাকে এবং যন্ত্রচালক একটি ষ্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেন। শব্দ দ্বারা নির্ণয় করা হয় যে, বিমান কত উচ্চে আছে এবং উহার গতি কোন্ দিকে। বিমানের শব্দ আসিয়া যন্ত্রে পৌছিতে কিছু সময় লাগে; কাজেই শব্দ যতক্ষণে আসিয়া যন্ত্রে পৌছিবে ততক্ষণে বিমান তাহার পূর্ব্ব স্থান হইতে আরও খানিকটা অগ্রসর হইবে। ধরুন, শব্দের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১ শত ফুট। কোন বিমান ১৫ হাজার ফুট উচ্চে থাকিলে উহার এঞ্জিনের শব্দ আসিয়া পৃথিবীতে পৌছিতে প্রায় ১৩॥ সেকেণ্ড লাগিবে। ততক্ষণে দ্রুতগামী বিমান নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা দূর আগাইয়া যাইবে। সুতরাং শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে গোলন্দাজকে শত্রুবিমানের অবস্থিতি সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবার কালে এই সময়ের হিসাবটা ভাল ভাবেই করিতে হয়।

শত্রুবিমান যখন মেঘের উপর দিয়া অদৃশ্য ভাবে চলিতে থাকে তখনই এই শব্দগ্রাহী যন্ত্রের প্রয়োজন হয় বেশী। রাত্রির অন্ধকারে তো ইহা বিশেষ ভাবেই দরকার। নৈশ বিমানহানায় শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুবিমানের অবস্থিতি নিরূপণ করিয়া কি ভাবে সার্চ্চলাইট ফেলা হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইবার বিমান-সন্ধানী আর একটি আবিষ্কারের কথা বলিব। শব্দগ্রাহী যন্ত্র ও সার্চ্চলাইটের সাহায্যে বড় জোর আট মাইল দূরবর্ত্তী শত্রুবিমানের আগমন-বার্ত্তা পাওয়া সম্ভব; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নূতন ধরণের এক 'ডিটেক্টর' যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী বিমানের অবস্থানও নিরূপণ করা যায়। এই নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বিমানধ্বংসী ব্যবস্থার

আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শত্রুবিমান মেঘ কিংবা ঘন কুয়াসার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া থাকিলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে বিমানধ্বংসী কামান হইতে শত্রুবিমানের উদ্দেশে গোলা নিক্ষেপ করা যায়। এই নূতন যন্ত্র আকাশের নানা দিকে রেডিও-তরঙ্গ পাঠায়। আকাশে কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই সেই তরঙ্গ আবার পূর্ব্বপথে ফিরিয়া আসে। রেডিও-তরঙ্গ ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহার হিসাব করিয়া এবং যেদিক হইতে ইহা ফিরিয়া আসে তাহা বিবেচনা করিয়া বিমানের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। বিমানধ্বংসী কামানের পাল্লার মধ্যে আসিলে ইহার সাহায্যে কামান দাগিয়া অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ করা চলে; আর তাহা না হইয়া বিমান দূরে থাকিলে স্বপক্ষের ফাইটার বিমানও সেই পথ ধরিয়া সহজেই শত্রুবিমানের সম্মুখীন হইতে পারে।

শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের এইরূপ ব্যবস্থা তো আছেই; ইহা ছাড়া বেসামরিক অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্যও নানা রূপে আয়োজন হইয়াছে। ভূগর্ভে যাহাতে আশ্রয় লওয়া চলে তজ্জন্য মাইলের পর মাইল সুরক্ষিত পরিখা খনন করা হইয়াছে। বোমায় ধ্বংস না হইতে পারে, অনেক বাড়ীঘর তেমনভাবে সুদৃঢ় করা হইয়াছে এবং আয় যাহাদের বেশী নয় তেমন সব পরিবারে লক্ষ লক্ষ লৌহকুঠরি বিতরণ করা হইয়াছে।

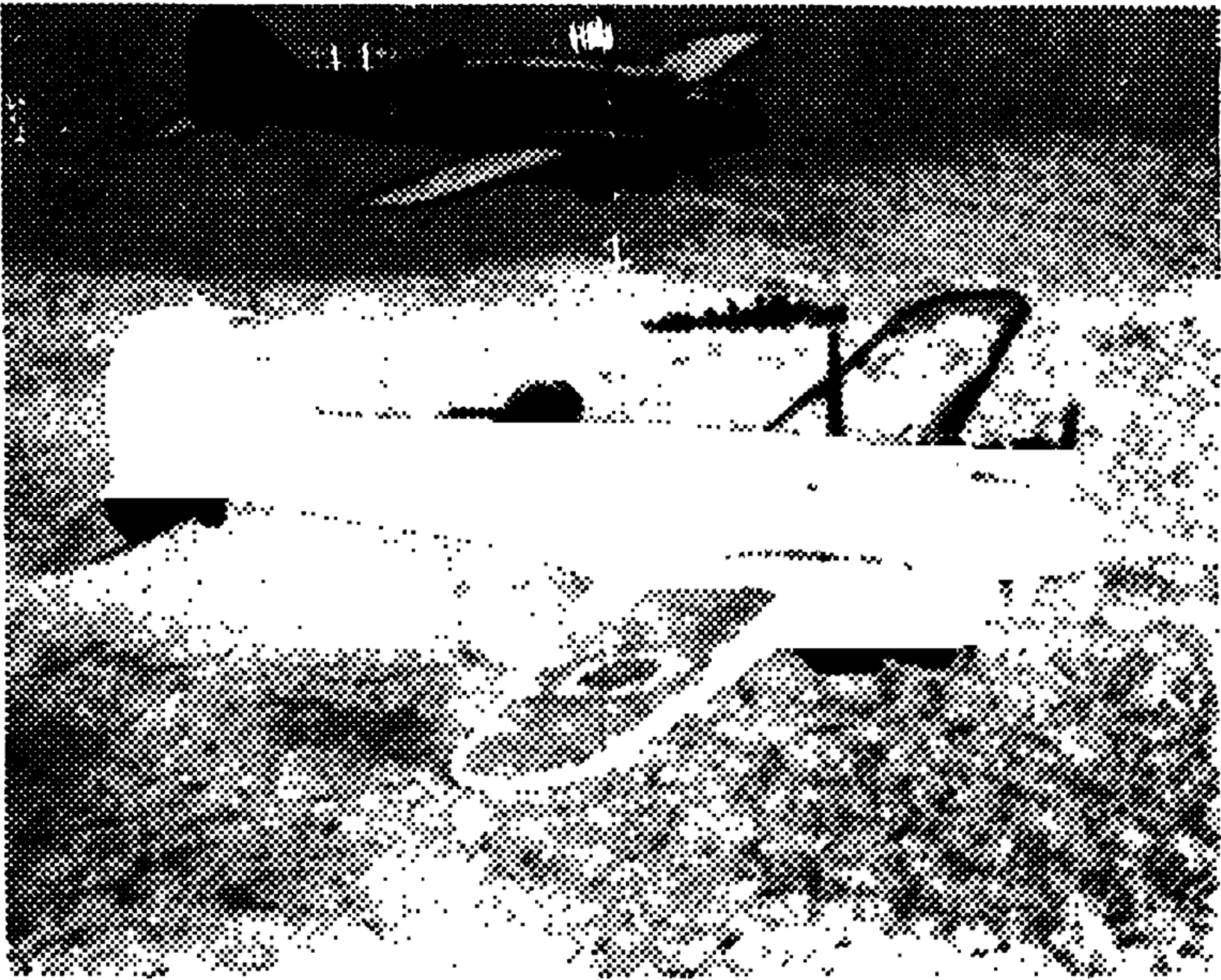
বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের দেশে যে-সকল 'স্লিট ট্রেঞ্চ' বা পরিখা খনন করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অন্যান্য দেশের ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলগুলিও বুঝি এইরূপই। সেই আশ্রয়স্থলের সঙ্গে এইগুলির কোন তুলনাই হয় না। আমাদের দেশের স্লিট ট্রেঞ্চগুলিতে আশ্রয় লইয়া বড় জোর ধারে কাছে বোমা পড়িলে তাহার 'ব্লাষ্ট' বা বিস্ফোরণের ধাক্কা ও বোমার ভাঙ্গা টুকরার আঘাত হইতে বাঁচা যাইতে পারে; কিন্তু 'ডিরেক্ট হিট' বা সরাসরি বোমা পড়িলে মৃত্যু অনিবার্য্য। এছাড়া শত্রুবিমান যদি 'গ্রাউণ্ড ষ্ট্রেফিং' করে, অর্থাৎ অত্যন্ত নীচে নামিয়া মেশিনগান চালায় তবে স্লিট ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইয়াও মরিতেই

হইবে। রেঙ্গুনে এইরূপ মেশিনগানের গুলীতে অনেক লোক মরিয়াছে। কলিকাতায় গ্যারেজ-বারান্দার সামনে 'ব্যাফল্ ওয়াল' বা বিমানহানা-প্রতিরোধক প্রাচীর খাড়া করিয়া যে-সকল আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মেশিনগানের গুলী এবং নিকটবর্ত্তী 'ব্লাষ্ট' বা বিস্ফোরণের ধাক্কা হইতে আত্ম-রক্ষার পক্ষে সেইগুলি স্লিট ট্রেঞ্চের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেও 'ডিরেক্ট হিট' বা সরাসরি বোমা পড়িলে রক্ষা পাওয়া কঠিন। বৃটেন, জার্ম্মানী, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশে নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্য ভূতলে সুড়ঙ্গ কাটিয়া কংক্রীট ও ইস্পাতের সাহায্যে যে-সকল আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের দেশের এই সকল আশ্রয় ব্যবস্থার কোন তুলনাই হয় না। সহরের রাস্তাসমূহ ও কারখানাঞ্চলে মাটির নীচে কংক্রীট ও ইস্পাতের সাহায্যে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলো, বসিবার আসন প্রভৃতি এমন সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাকে বিশ্রামকক্ষ বলিলেও চলে। কেবল সুরক্ষিতই নয়, সুড়ঙ্গগুলিকে গ্যাসনিরোধকও করা হইয়াছে। বিমানহানার সময় লোক সেখানে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে পারে। আশ্রয়স্থলগুলি এতই সুরক্ষিত যে, উপরে বোমা পড়িলেও ভিতরে কিছুই হয় না। বলা বাহুল্য, লণ্ডন নগরীতে এইরূপ ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলের ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকিলে হিটলারের বিমান-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সময় সেখানে লোকের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িত। চীনের চুংকিং নগরীতেও এইরূপ ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলের ব্যাপক ব্যবস্থা আছে বলিয়া শুনা যায়। চীনারা আত্মরক্ষার জন্য সম্প্রতি আর একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহারা বাড়ীর ছাদের উপর টঙ বাঁধিয়া মাঁচার মত আড়াআড়ি ভাবে পাঁজার পর পাঁজা বাঁশ সাজাইয়া যায় এবং এইভাবে কয়েক পাঁজা বাঁশ সাজাইয়া তাহার উপর সিমেণ্ট ঢালিয়া আস্তর করে। বাঁশের উপর সিমেণ্ট জমিয়া এমন শক্ত হয় যে, খুব বড় বোমা না হইলে সাধারণ বোমা তাহা ভেদ করিতে পারে না। চীনারা আজকাল এই

উপায়ে অনেক বাড়ী রক্ষা করিতেছে। কেবল বাড়ীই নয়, স্লিট ট্রেঞ্চের উপর এইভাবে বাঁশ ও কংক্রীটের ছাদ তৈয়ারী করিতে পারিলেও সেখানে আশ্রয় লইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; অন্ততঃ মেশিনগানের গুলী হইতে অনায়াসেই প্রাণ বাঁচিতে পারে। যেখানে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়, সেখানে এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্প খরচেই হওয়া সম্ভব।

বোমারু ও ফাইটার

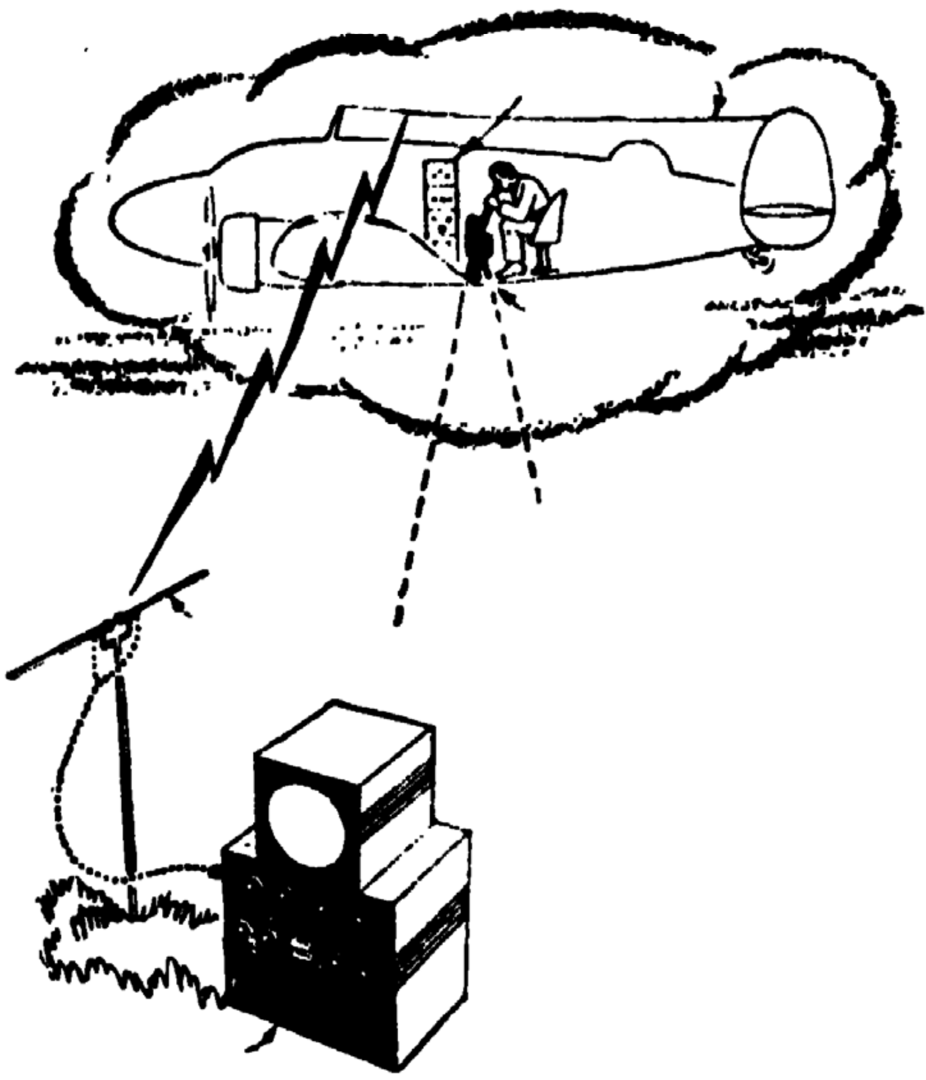
যুদ্ধে আজকাল নানা প্রকার বিমানই ব্যবহৃত হয়, তবে প্রধারণতঃ সেইগুলিকে তিন পর্য্যায়ে ফেলা যায়—পর্য্যবেক্ষক, বোমারু ও ফাইটার।



পর্য্যবেক্ষক বিমান

শত্রুপক্ষের গতিবিধি, সামরিক ঘাঁটি, সৈন্যসমাবেশ প্রভৃতির খোঁজখবর লইবার জন্য পর্য্যবেক্ষক বিমানগুলি উড়িয়া বেড়ায়। এই সকল বিমানে অতি উৎকৃষ্ট ক্যামেরা থাকে। ঐ ক্যামেরা সাহায্যে বিপক্ষের গুপ্ত স্থানগুলির ফটো

কৌশলে গ্রহণ করা হয়। সেইসকল ফটো দেখিয়াই সমরনায়কগণ শত্রুপক্ষের গতিবিধি বুঝিয়া লন এবং তদনুসারে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন আগে বৃটেন এই ফটো গ্রহণের আর একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। সে এক প্রকার বিমান প্রস্তুত করিয়াছে যেগুলি হইতে টেলিভিশনে ছবি পাঠান যায়। শত্রুর কামানের গোলার আয়ত্তের বাহিরে থাকিয়া বহু উর্দ্ধে অক্ষত দেহে উড়িয়া উড়িয়া এই বিমানগুলি টেলিভিশনযন্ত্র সাহায্যে শত্রুর সমস্ত আয়োজনের সবিশদ ও সুস্পষ্ট চিত্র মুহূর্ত্তে সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত স্বপক্ষের শিবিরে অনায়াসে চালান করিয়া দিতে পারে। উড়ন্ত বিমানে দূরবীক্ষণী লেন্স বসান টেলিভিশন-ক্যামেরার মারফৎ অধস্থ ভূভাগের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ধরিবার চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বিমানের শ্যেনদৃষ্টি হইতে শত্রুপক্ষের গুপ্ত শিবির বা অস্ত্রের ঘাঁটিগুলির রক্ষা নাই; টেলিভিশন-ক্যামেরায় সেইগুলির ছবি ধরা দিবে।



পর্য্যবেক্ষক বিমান হইতে টেলিভিশনে চিত্র প্রেরিত হইতেছে

সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে বিমান হইতে শত্রুর ঘাঁটির ছবি লওয়া সময়সাপেক্ষ; কারণ ছবি তুলিয়া ফিরিয়া আসিতে সময় লাগে। আর তাছাড়া সেইভাবে ছবি তুলিতে যাওয়ায় বিপদও যথেষ্টই আছে। ছবি তুলিবার জন্য বিমানকে নীচে নামিয়া শত্রুপক্ষের বিমানধ্বংসী কামানের পাল্লার মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়। কামানের গোলার আঘাতে বিমান ধরাশায়ী হইলে প্রাণ তো হারাইতে হয়ই, গৃহীত চিত্রগুলিও শত্রুর হস্তগত

হয়। কিন্তু নবোদ্ভাবিত টেলিভিশনযন্ত্রের সাহায্যে বিমান হইতে চিত্র প্রেরণে সেই বিপদের আশঙ্কা নাই। বিমান শত্রুর কবলগ্রস্ত হইলেও চিত্রপ্রেরণে কোন ব্যাঘাত হয় না ; ভূতলে পড়িবার পূর্ব্বেই ছবিটি তাহার স্বপক্ষের শিবিরে চলিয়া যায়। এই আধুনিক টেলিভিশনযন্ত্র সমরায়োজনের অনেক গুপ্ত রহস্য ফাঁস করিয়া দিতে পারে।

এইবার বোমারু বিমান এবং ফাইটার সম্বন্ধে কিছু বলিব। গত মহাযুদ্ধে বোমারু বিমানগুলি হইতে বোমা ফেলা হইত এবং সেইগুলিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত ফাইটার বিমানগুলি। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিমানহানার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু বোমারু বিমানের আবির্ভাব হইতেছে ; সেইগুলির সঙ্গে প্রায়ই কোন ফাইটার বিমান থাকে না। ইহার কারণ কি ?

কারণ অবশ্যই একটা আছে। একটু ভাঙ্গিয়া না বলিলে কারণটা ঠিক বুঝা যাইবে না। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রথম দিকে দেখা গিয়াছিল, দূরত্বের পাল্লায় বোম্বারু বা ফাইটার কেহই কাহারও অপেক্ষা কম নয়। ধরুন, ফ্রান্সের বিমানঘাঁটি হইতে একখানি বোমারু বিমান জার্ম্মানীতে যত দূর গিয়া বোমা ফেলিয়া আসিতে পারিত, একখানি ফাইটারেরও ততখানি গিয়া ফিরিয়া আসিতে কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু যুদ্ধের শেষ দিকে দেখা গেল, এমন এক শ্রেণীর বোমারু বিমান প্রস্তুত হইয়াছে যেগুলি ইংলণ্ড হইতে জার্ম্মানীতে গিয়া বহু দূরে বোমা ফেলিয়া আসিতে পারে ; কিন্তু কোনও ফাইটারের ততদূর গিয়া ফিরিয়া আসা কঠিন। জার্ম্মানীর অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রের কারখানাগুলি ধ্বংস করিবার জন্যই ঐরূপ লম্বা পাল্লার বোমারু বিমান প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয় এবং তখন হইতেই চেষ্টা চলে, কি করিয়া বোমারু বিমানগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা যায় ও ফাইটার বিমানের সাহায্য ব্যতীতই ঐগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।

গত মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল হইতে বার্লিনে পৌছিবার

জন্য যে বিশেষ ধরণের বিমান প্রস্তুত হয় সেইগুলির নাম 'হ্যাণ্ডলী পেজ'। ঐগুলি ছিল চার-এঞ্জিনযুক্ত। বিপক্ষের বিমান আক্রমণের সরাসরি পাল্টা জবাব দিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ঐ বিমানগুলিরই পশ্চাৎদিকে কামান লইয়া একটি লোক বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে যে-সকল বোমারু বিমান প্রস্তুত হইত সেইগুলির মধ্যভাগে থাকিত মেশিনগান বা কামান; পশ্চাৎদিক হইতে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিলে ঐ কামান সাহায্যে পাল্টা জবাব দেওয়া চলিত না। সেইক্ষেত্রে সঙ্গে ফাইটার বিমান না থাকিলে বোমারু-বিমানকে ঘায়েল হইতেই হইত। কাজেই বোমারু বিমান যাহাতে আক্রমণ হইতে নিজেকে নিজেই রক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য তাহার পশ্চাৎদিকে বসান হইল কামান।

চার-এঞ্জিনযুক্ত 'হ্যাণ্ডলী পেজ' বিমানগুলি প্রস্তুত হইল সত্য; কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হওয়ায় কার্য্যতঃ সেইগুলির ব্যবহার হইল না। উত্তরকালে ইহা লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামাইয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, আত্মরক্ষার জন্য ঐ ধরণের বোমারু বিমানগুলিতে ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা পর্য্যাপ্ত নয়; ঐগুলির সঙ্গে দুর পাল্লার ফাইটার বিমান থাকা প্রয়োজন। অবশ্য ইহা লইয়া জগতের বিভিন্ন দেশে প্রবল মতদ্বৈধ রহিয়াছে। একদল মনে করেন, বড় বোমারু বিমানে প্রচুর কামান-বন্দুক লইয়া গেলে উহার সঙ্গে আর ফাইটার বিমান না রাখিলেও চলে। আবার যাঁহারা আধুনিক টুইন মোটর ফাইটার প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—ঐ সকল ফাইটারে এত পেট্রল ধরে যে, যে-কোন দুর পাল্লার বোমারু বিমানের সহিত ঐগুলি বহুদূর ঘুরিয়া আসিতে পারে। গতির দিক দিয়া ঐগুলি বোমারু বিমানকে ছাড়াইয়া যায়। অতিকায় বোমারু বিমান প্রস্তুতের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা মনে করেন—দ্রুতগামী আধুনিক টুইন-মোটর ফাইটারের পাল্লায় পড়িলে অতিকায় বোমারু বিমানের রক্ষা পাওয়া কঠিন।

বোমারু বিমান কত বেগে কতখানি গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে

তাহা নির্ভর করে প্রধানতঃ দুই জিনিসের উপর—গোলাগুলী এবং তেল। ঐ দুই জিনিসের ওজন ও পরিমাণ অনুসারেই বিমানের গতিবিধির তারতম্য হয়। তেল ফুরাইয়া গেলে যাহাতে উড়ন্ত অবস্থায়ই বোমারু বিমানগুলি আবার তেল পাইতে পারে, তজ্জন্য আজকাল সঙ্গে তেলবাহী বিমান পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তেল লইবার জন্য আর নীচে নামিতে হয় না। আকাশে চলন্ত অবস্থায়ই এক প্রকার রবারের নল সাহায্যে একটি হইতে আর একটিতে তেল ভরা চলে। ইহাতে বোমারু বিমানগুলির বেশী দূরে গিয়া বোমা ফেলিয়া আসিতে সুবিধা হইয়াছে।

আত্মরক্ষার জন্য বোমারু বিমানগুলির সাধারণতঃই পর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ লইয়া যাওয়া উচিত। সঙ্গে ফাইটার বিমান থাকিলেও আবহাওয়া এমন হইতে পারে, যাহাতে একের অন্যের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া কিছুই অসম্ভব নয়। অথবা শত্রুপক্ষের বিমানের সহিত ফাইটারগুলিকে এমনভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইতে পারে যে, স্বপক্ষের বোমারু বিমানগুলির নিরাপত্তার দিকে নজর দিবার আর সেগুলির সময়ই রহিল না। কাজেই সেই অবস্থায় বোমারু বিমানের পশ্চাৎদিক রক্ষার জন্য যদি ব্যবস্থা না রাখা হয়, তবে বোমারু বিমানের ধ্বংস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতএব ফাইটার বিমান সঙ্গে থাকিলেও বোমারু বিমানগুলির নিরাপত্তার জন্য পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বোমারু বিমানে সাধারণতঃ একজন পাইলট, একজন নেভিগেটর ও একজন বোমানিক্ষেপক থাকে। আর পশ্চাৎদিকে থাকে একজন গোলন্দাজ বৈমানিক। এই ব্যবস্থা আধুনিক। কেহ কেহ বলেন, বোমারু বিমান অত বড় না করিয়া ছোট করাই ভাল। ছোট বিমানে থাকিবে মাত্র দুইটি লোক; তাহারা উভয়েই হইবে একাধারে পটু বিমানচালক এবং নিপুণ গোলন্দাজ। বোমা ফেলা, মেশিনগান দাগা, বিমানচালনা—সবই তাহারা করিবে। এই মতের পরিপোষকগণ বলেন—অল্প দূরে বোমা ফেলিয়া

আসিবার পক্ষে এই ধরণের ক্ষুদ্র বোমারু বিমানগুলিই হইল সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কেহ কেহ আবার ইঁহাদিগকেও ছাড়াইয়া যান। তাঁহারা বলেন: একজন লোক, একটি বিমান এবং একটি বোমা—এই যথেষ্ট; ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। যতগুলি বোমারু বিমান যাইবে, সঙ্গে থাকিবে ঠিক তত সংখ্যক ফাইটার। যেখানে যাতায়াতে পনর শত মাইলের বেশী হয়না সেখানে বিমান আক্রমণ চালাইবার পক্ষে এই ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। ইঁহাদের যুক্তি হইল এই—শত্রুপক্ষের গুলীর ঘায়ে যদি কোন বড় বোমারু বিমান বিধ্বস্ত হয়, তবে সেইক্ষেত্রে প্রচুর গোলা বারুদ তো নষ্ট হয়ই, তাছাড়া চার পাঁচজন লোকের জীবনও সেখানে বিপন্ন হয়। তাহা না করিয়া একসঙ্গে কতকগুলি ছোট ছোট বোমারু বিমান পাঠাইলে শত্রুপক্ষের গুলীতে একখানি বিধ্বস্ত হইলেও আর একখানি বাঁচিতে পারে। ইহাতে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনাও থাকে কম এবং একবারে অনেকগুলি বোমাও হারাইতে হয় না। অতএব ছোট ছোট বোমারু বিমান সাহায্যেই আক্রমণ চালান বুদ্ধিমানের কাজ—ইহাই হইল ইঁহাদের বিশ্বাস।

বিমানধ্বংসী কামান দাগিতে যাঁহারা ওস্তাদ তাঁহারা কিন্তু আবার বলেন—মন্দ কি! ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান যদি আসেই, আমরাও সেইগুলিকে পাখীর ঝাঁকের মতই শিকার করিব; বেশী কষ্ট করিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে না। ঝাঁকের মধ্যে গুলী মারিলে একটা না একটা পড়িবেই। আর এক দল বলেন—বড় বোমারু বিমান যদি আসে, তবে কয়েকটা কামান হইতে একযোগে একটার দিকে গুলী ছোঁড়া যাইবে, পাঁচটার দিকে আর নজর দিতে হইবে না। এক গুলীতে না পড়ে, আর এক গুলীতে পড়িবেই। তাহাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা কি?

বিমানযুদ্ধ লইয়া এতদিন যে মতদ্বৈধ চলিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ সংক্ষেপে তাহাই বলিলাম। এইবার বলিব, বোমারু ও ফাইটারের মধ্যে যে-কৌশলে যুদ্ধ হয় তাহার কথা।

প্রথমেই ধরা যাক, কোনও বোমারুকে যদি কোনও ফাইটারের আক্রমণ করিতে হয়, তবে ফাইটার কিরূপ অবস্থান হইতে আক্রমণ চালাইবে? সামনাসামনি? পাশাপাশি? না পিছন দিক হইতে? মনে করুন, শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান বোমা ফেলিবার জন্য আসিতেছে। টের পাইয়া তখন সেই বোমারু বিমানখানিকে বাধা দিবার জন্য উঠিল ফাইটার। প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হইতেছে বিপক্ষের বোমারু এবং তাহাকে ঘায়েল করিবার জন্য ছুটিয়াছে ক্ষিপ্র গতিতে ফাইটার। সেইক্ষেত্রে একটি অপরটির দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইতেছে। সেই প্রচণ্ড গতির মধ্যে টাল সামলাইয়া আক্রমণ করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটু বেহুঁস হইলে দুইটিতে টক্কর লাগিয়া দুইটিই চুরমার হইয়া যাইবে; আর একটু বেহিসাবী হইলে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। কাজেই মুখামুখি দুই বিমানে যুদ্ধ বড় একটা হয় না। কেন হয় না, আর একটু হিসাব দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইবে। একটি বোমারু এবং একটি ফাইটার যদি পরস্পরের দিকে ঘণ্টায় যথাক্রমে আড়াই শত এবং তিন শত মাইল বেগে অগ্রসর হইতে থাকে তবে হিসাব করিয়া দেখা যায়, তাহারা একে অন্যের দিকে ঘণ্টায় পাঁচ শত পঞ্চাশ মাইল এবং প্রতি সেকেণ্ডে ২৬৮ গজের অধিক অগ্রসর হইতে থাকে। বিমানে সাধারণতঃ যে-সকল ছোট মেশিনগান ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির পাল্লা একশত গজের বেশী নয়। তবেই বুঝুন, অত দ্রুতগতিতে পরস্পরের প্রতি ধাবমান দুইটি বিমানের মাত্র এক শত গজের মধ্যে যাওয়া কত বড় মারাত্মক ব্যাপার। দুইটিতে সঙ্ঘর্ষ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়; আর তাহা না হইলেও ঐ অবস্থায় অত চুলচেরা হিসাব করিয়া গুলী ছোঁড়া কঠিন। কাজেই যেখানে আক্রমণ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই বেশী, সেখানে অতবড় বিপদের মধ্যে আর যায় কে? এইজন্যই বোমারু বিমানকে বাধা দিবার জন্য কোন ফাইটার মুখামুখি অগ্রসর হয় না।

পাশাপাশি আক্রমণ করিতে গেলে সঙ্ঘর্ষ হইবার আশঙ্কা অবশ্য থাকে না; কিন্তু দুই বিমান পাল্লা দিয়া চলিতে থাকিলে মাঝে মাঝে একটিকে অপরটির ছাড়াইয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব নয়। সেইক্ষেত্রে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কাজেই পাশাপাশি আক্রমণ চালাইবার নীতিও অবলম্বিত হয় না।

বিপক্ষের বোমারুকে ঘায়েল করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইল পশ্চাৎদিক হইতে গিয়া আক্রমণ করা। এইজন্যই শত্রুপক্ষের বোমারুর সন্ধান পাইলেই ফাইটারগুলি আকাশে উর্দ্ধে উড়িয়া গিয়া বিপক্ষের বোমারুর পশ্চাদ্ধাবন করে। ফাইটারগুলি আকাশে ঘোরাফেরা করিতে পারে সহজে এবং ওঠানামা করিতেও সেইগুলির সুবিধা; কিন্তু বোমা বোঝাই বোমারু বিমানগুলির নানা কারণে সেই সুবিধা নাই এবং আত্মরক্ষার জন্য সেইগুলিকে এমন ভাবে নিজেদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, যাহাতে ফাইটারগুলি সহজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া সুবিধাজনক স্থান লইবার সুযোগ পায়। ফাইটারগুলি আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতে ঠিক আড়াআড়ি ভাবে বোমারু বিমানের উপর আক্রমণ চালায়।

পশ্চাৎদিক হইতে বোমারুর উপর আক্রমণ চালাইতে বিপদ না আছে এমন নয়। বোমারুর পশ্চাৎদিকে এক বা একাধিক কামান থাকে। সেই কামানের গুলী হইতে ফাইটারের নিষ্কৃতি পাওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কোন বোমারুর পশ্চাতে থাকে উপরের দিকে একটি কামান—আবার কোনটির থাকে উপরে নীচে দুইটি কামান। অধুনা বিমানে ঘুর্ণায়মান চাকার উপর এমন ভাবে কামান বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, যাহাতে কামানটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গুলী ছোঁড়া যায়; লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য সমস্ত বিমানখানিকে না ঘুরাইলেও চলে।

বলাই বাহুল্য, দ্রুতগতিতে চলন্ত অবস্থায় যেখানে গুলী ছুঁড়িতে হয়, সেখানে প্রতি পদে পদেই গুলী লক্ষ্যচুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যই

যাহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি গুলী ছোঁড়া যায় তজ্জন্য ফাইটারগুলিতে একাধিক মেশিনগান বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ফাইটারে আটটি পর্য্যন্ত মেশিনগান থাকে। চালকের কাছেই থাকে একটি বোতাম। সেইটি টিপিলেই এক সঙ্গে মেশিনগানগুলি হইতে ছোটে গুলী। সেই ছররা গুলীর মুখে পড়িলে কোন বিমানের অব্যাহতি পাওয়া সত্যই একটু কঠিন।

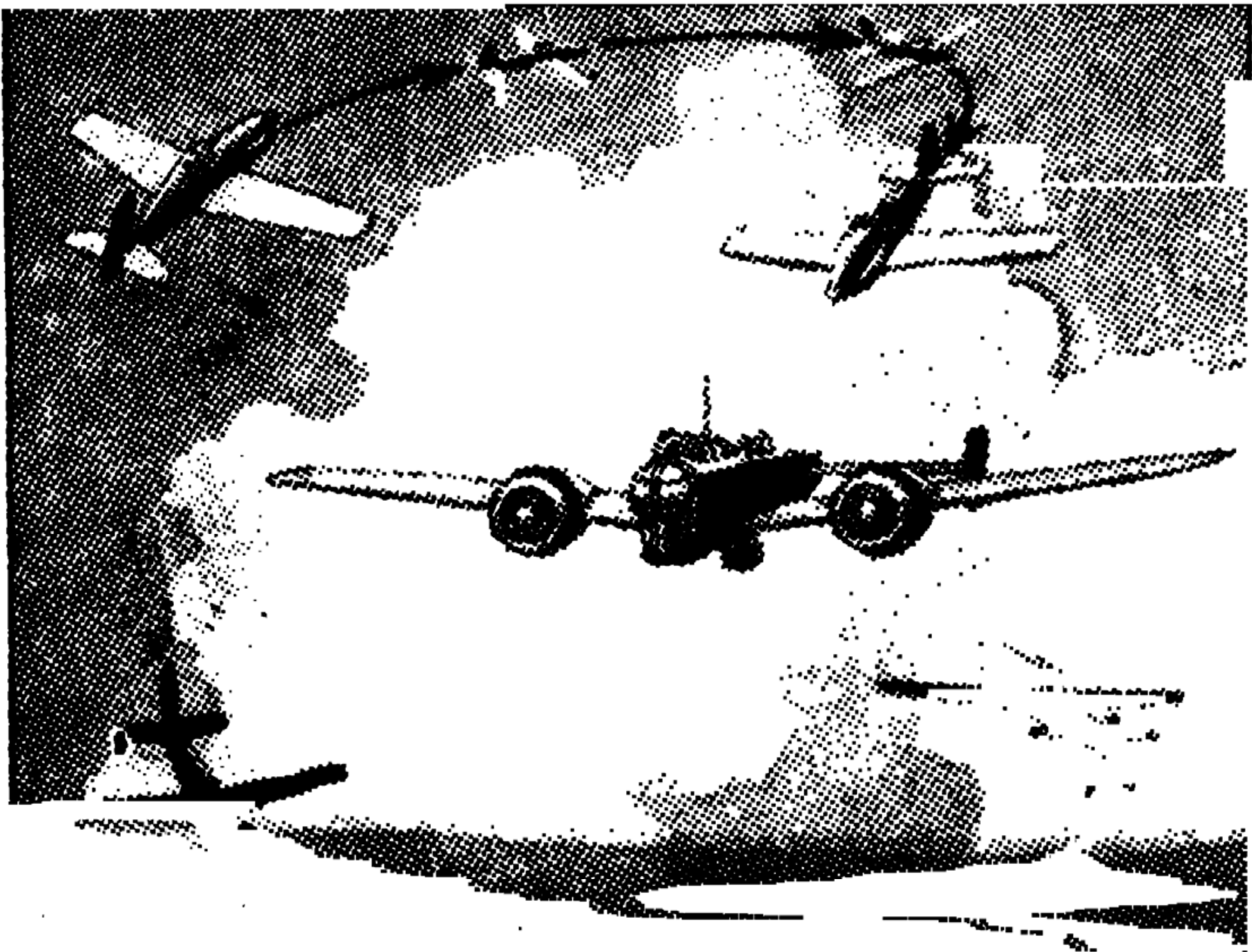


বৃটিশ সমর বিভাগের নারী বৈমানিক

এক সঙ্গে গুলী ছুঁড়িবার তো ব্যবস্থা হইল; কিন্তু কথা হইল, ছোট মেশিন-গানের গুলী কঠিন ধাতু-নির্ম্মিত আধুনিক বোমারু বিমানগুলির দেহ যদি না ভেদ করিতে পারে? সমস্যা তো বটেই! আধুনিক বিমানগুলিকে দুর্ভেদ্য করিবার জন্য চেষ্টার কিছু ত্রুটি হয় নাই। কাজেই সেই-গুলিকে ভেদ করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে এমন কামানের যেগুলি হইতে শক্তিশালী গোলা ছোঁড়া যায়। আজকাল

সাধারণ মেশিনগানের সঙ্গে বিমানে ঐ শ্রেণীর গোলাবর্ষী কামানও রাখা হয়।

বিমানে কামানবন্দুক রাখা লইয়াও দ্বিমত আছে। একদল বলেন—ফাইটারে কতকগুলি মেশিনগান রাখাই ভাল; কারণ একসঙ্গে বিস্তর গুলী ছুঁড়িয়া শত্রুপক্ষকে কাবু করা যায়। আবার আর একদল বলেন—একাধিক মেশিনগান না রাখিয়া একটি বড় কামান রাখাই ভাল। মেশিনগান রাখার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন—একসঙ্গে বহু গুলী ছুঁড়িয়া বিপক্ষের বোমারু বা ফাইটারকে জখম করিতে যে সুবিধা, একটা কামান দাগিয়া কি



চক্রাকারে ঘুরিয়া ফাইটার এইভাবে বোমারুকে আক্রমণ করে

সেই সুবিধা পাওয়া যায়? কামান রাখার পক্ষপাতীরা বলেন—কতটুকু দূর হইতেই বা মেশিনগান দাগা যায়? কামান দাগা যায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দূর হইতে। কাজেই কামানের কাছে মেশিনগান দাঁড়াইতেই পারে না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যে-সকল ফাইটারে মাত্র একজনের বসিবার ব্যবস্থা

আছে তেমন দুইখানি ফাইটারের একখানিতে যদি থাকে আটটি মেশিনগান এবং অপরখানিতে যদি থাকে একটি বড় কামান এবং ঐ দুইখানি ফাইটারে যদি বাধে সংগ্রাম, তবে সেইক্ষেত্রে মেশিনগানওয়ালা ফাইটারখানিরই জিতিবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু চার-এঞ্জিনযুক্ত বড় বোমারু বা কোনও বড় 'সী-প্লেন' অর্থাৎ সামুদ্রিক বিমানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে কামানওয়ালা ফাইটার লইয়া যুদ্ধ করিতেই সুবিধা; কারণ সেইক্ষেত্রে লক্ষ্য বড় বলিয়া সন্ধান ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে কম। আধুনিক বিমানসজ্জায় এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা হইয়াছে। মাত্র একজন বসিবার মত এক-এঞ্জিনযুক্ত ফাইটার প্রস্তুত কমাইয়া দিয়া দুই-এঞ্জিনযুক্ত ফাইটার প্রস্তুতের দিকে অধিক ঝোঁক পড়িয়াছে। শেষোক্ত ফাইটারগুলিতে একাধিক লোক বসিতে পারে এবং কামান, বন্দুক দুই-ই রাখা চলে।

আকাশযুদ্ধের কৌশল

বিমানযুদ্ধে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। যে-সকল ফাইটার বিমানে একাধিক ব্যক্তি থাকে সেইগুলি হইতে যে-কৌশলে যুদ্ধ করা হয়, একারোহী ফাইটার বিমান হইতে নিশ্চয়ই সেই কৌশলে যুদ্ধ করা হয় না। তারপর অস্ত্রশস্ত্রের তারতম্য অনুসারেও রণকৌশলে পার্থক্য হইতে বাধ্য।

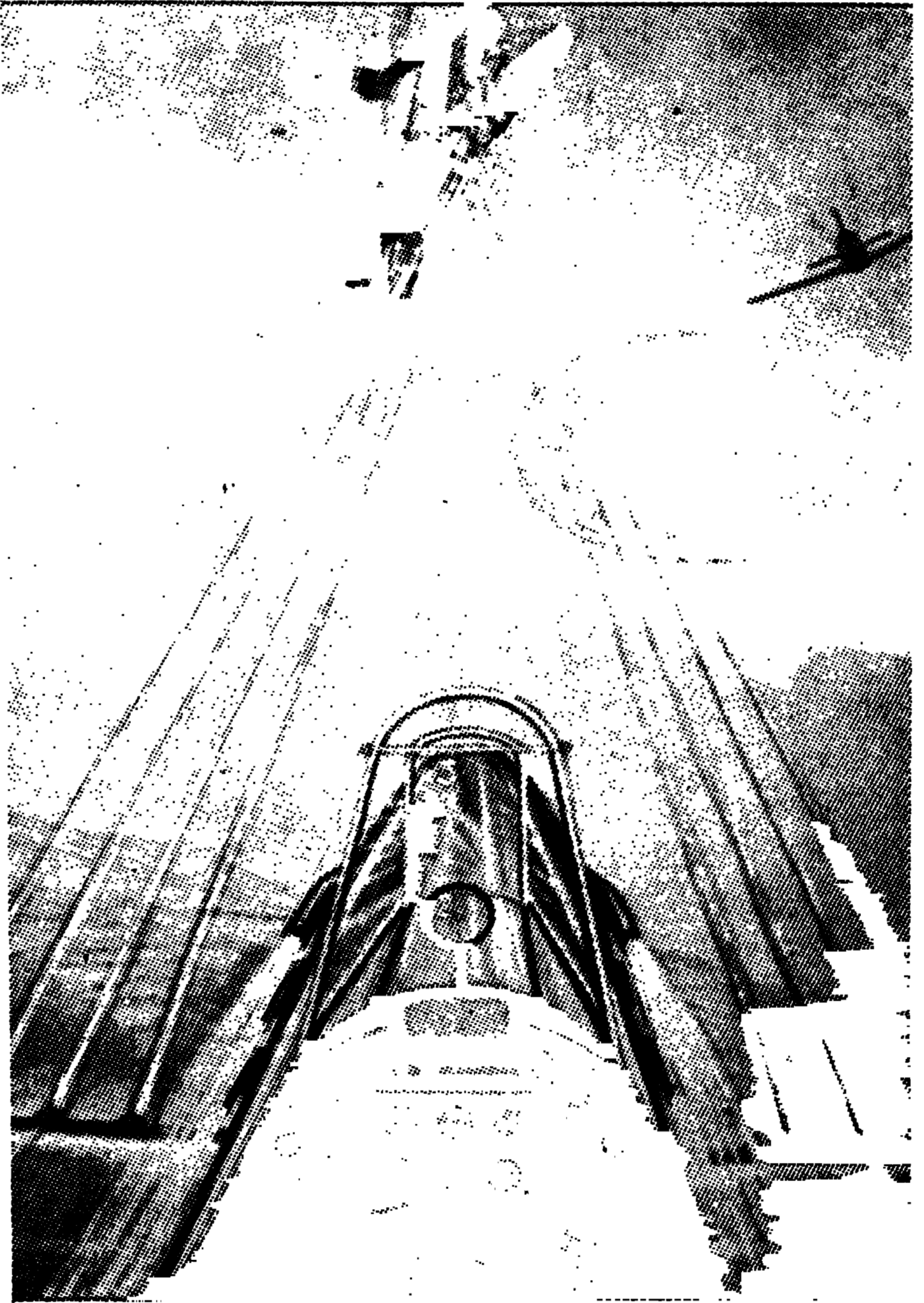
একারোহী ফাইটার বিমানে বৈমানিকের হস্তপদ বিমানচালনার কাজে নিয়োজিত থাকে, কাজেই ঘরান-ফেরান যায় এমন মেশিনগান তাহার পক্ষে চালান কঠিন। সুতরাং তাহার মেশিনগানগুলি বিমানে স্থিরভাবে বসান থাকে। কামানের পরিবর্তে সে তাহার বিমান ঘুরাইয়া বিপক্ষের বিমানকে লক্ষ্য করে এবং তদনুসারে সে কল টিপিয়া মেশিনগান দাগে। সমস্ত মেশিনগান হইতে একসঙ্গে গুলী বর্ষিত হয়। গুলীগুলি ঠিক সমান্তরাল ভাবে সম্মুখের দিকে ছোটে না; কিছু দূরে গিয়া—ধরুন প্রায় দুইশত গজ দূরে—ঐগুলি প্রায় একত্র হয় এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে

প্রতিপক্ষের বিমানের কোন এক স্থানে গিয়া অতি কাছাকাছি একসঙ্গে ঘা দেয়। ইহার ফল এমন হইতে পারে যে, একখানি বিমানের দুই খণ্ড হইয়া যাওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। অথচ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে পঞ্চাশটি গুলী খাইয়াও কোন বিমান বাঁচিয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রথমোক্ত ভাবে ঘা খাইলে কোন বিমানের ধ্বংস হইতে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন।

ফাইটার হইতে মেশিনগান দাগিবার সময় প্রতি তিন বা পাঁচ গুলীর পর নিয়মিত ভাবে একটি করিয়া 'ট্রেসার বুলেট' ছুটিতে থাকে। বায়ুর মধ্য দিয়া ছুটিবার সময় ট্রেসার বুলেটগুলি জ্বলিয়া ওঠে এবং ধুঁয়া ছাড়ে; রাত্রেই হোক, কি দিনেই হোক, বৈমানিক সেইগুলি স্পষ্টতঃ দেখিতে পান। এই ট্রেসার বুলেট ছুঁড়িবার উদ্দেশ্য এই যে, এইগুলির গতিপথ দেখিয়া বৈমানিক বুঝিতে পারে তাহার মেশিনগানের গুলীসমূহ কোন দিকে ছুটিতেছে। তাহার লক্ষ্য স্থির আছে কিনা ট্রেসিং বুলেটের সাহায্যে সে তাহা ঠিক করিতে পারে।

বিমানের এঞ্জিন ও মেশিনগানের কলের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম হিসাবে সময় ঠিক করা আছে যে, উড়ন্ত বিমানের ঘূর্ণায়মান প্রপেলারের পাতার ফাঁক দিয়া মেশিনগানের গুলী অনায়াসে সম্মুখের দিকে ছুটিয়া যায়, পাতায় ঘা লাগে না। গত মহাযুদ্ধের সময়ই বিমানজগতে এই উন্নতি সাধিত হয় এবং জার্ম্মানরা প্রথম ইহা উদ্ভাবন করে। কেবল মেশিনগান নয়, আধুনিক ফাইটার বিমানগুলিতে প্রপেলারের ফাঁক দিয়া কামান দাগিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন জার্ম্মান বিমানে 'এয়ার স্ক্রু' বা বিমানের নাসিকা অর্থাৎ যে চাকার উপর প্রপেলারের পাতা বসান থাকে তার মধ্য দিয়া কামান দাগিবার ব্যবস্থা আছে।

একারোহী ফাইটার বিমান হইতে কেবল সম্মুখের দিকেই গুলী বর্ষণ করা চলে; কাজেই ফাইটার কিংবা বোমারু যাহাই আক্রমণ করিতে হোক বিপক্ষের বিমানকে সম্মুখে রাখিতে হইবে। তাছাড়া ইহাও লক্ষ্য রাখা



ফাইটার বিমানের আটটি মেশিনগান হইতে আটটি গুলী গিয়া কিভাবে প্রতিপক্ষের বিমানের একস্থানে ঘা দেয় চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে

দরকার যে, বিপক্ষের কোন বিমান যেন উহার পশ্চাতে না পড়ে। বিপক্ষের কোন বিমান পশ্চাতে পড়িলেই বিপদ; কারণ একারোহী ফাইটার বিমানে পশ্চাৎদিক রক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। এজন্য আজকাল দ্বি-আরোহী ফাইটার বিমানের প্রচলন বেশী হইয়াছে। এই শ্রেণীর বিমানের পৃষ্ঠদেশে কামান বা মেশিনগান থাকে। আরও সুবিধা হইয়াছে বিমানে গান-টারেটের সৃষ্টি হওয়ায়। আগেও বলিয়াছি, বিমানের পৃষ্ঠদেশে গান-টারেটে বসিয়া এখন গোলন্দাজ ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিকেই গুলীবর্ষণ করিতে পারে। গান-টারেট আর কিছুই নয়। রিভল্‌ভিং চেয়ারের মত। উহাতে কামান বসান থাকে। গোলন্দাজ ভিতরে বসিয়া কামান দাগে। কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গেই গোলন্দাজের প্রয়োজন অনুসারে কলে চাকাটি আপনা হইতে ঘোরে। প্রতিপক্ষের গোলাগুলী হইতে আত্মরক্ষার জন্য টারেটের উপরে কঠিন আচ্ছাদন থাকে, তবে তদ্দরুণ বিপক্ষের বিমান লক্ষ্য করিতে গোলন্দাজের কোন অসুবিধা হয় না। বিমানে এই স্বয়ংক্রিয় গান-টারেট বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আবিষ্কার। প্রথম বৃটেনে ইহার উদ্ভাবন হয়, পরে জার্ম্মানরাও ইহা নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই গান-টারেট বিমানযুদ্ধের কৌশলে অনেকখানি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

বিমানে বিমানে যে 'ডগ-ফাইট' হয়, এইবার তৎসম্পর্কে কিছু বলা যাইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় ডগ-ফাইটে অর্থাৎ দুই বিমানের সম্মুখসমরে সাধারণতঃ দুইখানি বিমান পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিত; উভয়েরই লক্ষ্য থাকিত অপরের পশ্চাৎদিকে গিয়া আক্রমণ করা। ফলে উভয় বিমানই চেষ্টা করিত হঠাৎ ছোঁ মারিয়া একে অন্যের পশ্চাতে গিয়া পৌঁছিতে। তাহাতে বৃত্তপথ ক্রমশঃই ছোট হইয়া আসিত। এইভাবে দুই বিমান কাছাকাছি আসিলে যে আগে সুযোগ পাইত সেই অপরের উপর আক্রমণ করিয়া বসিত। একারোহী বিমানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় যেখানে দুই পক্ষের ফাইটার বিমান এইভাবে মুখামুখি পড়ে সেখানে

ডগ-ফাইট করা ছাড়া উপায় নাই। পালাইবার চেষ্টা করিলেই যেখানে পৃষ্ঠদেশ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা সেখানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া বৈমানিকরা সম্মুখসমরই বরণ করিয়া লয়।

ডগ-ফাইটে যে বিমান উপরে থাকে তারই সুবিধা হয় বেশী। অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে নীচের দিকে ছোঁ মারিয়া চলিয়া আসিয়া সে বিপক্ষের বিমানের পশ্চাদ্দেশে পৌছিতে পারে। তবে এই নীচের দিকে ছুটিয়া আসার কালে বৈমানিককে খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিতে হয়। একটু অসতর্ক বা বেহিসাবী হইলেই শত্রু-বিমানের সহিত তাহার বিমান টক্কর খাইবে অথবা শত্রুবিমান তাহার মেশিন-গানের পাল্লার বাহিরে চলিয়া যাইবে।



বৃত্তাকারে ঘুরিয়া এইভাবে দুইখানি ফাইটার বিমানে ডগ-ফাইট হয়

গত মহাযুদ্ধে দুই বিমান কাছাকাছি বৃত্তাকারে ঘুরিয়া যেভাবে ডগ-ফাইট করিত, আজকাল বিমানের গতি বাড়িবার ফলে তাহা আর সম্ভব হয় না। আধুনিক ফাইটার বিমানগুলি এতই দ্রুতগতিতে ছোটে যে, বৃত্ত ছোট করিবার জন্য অকস্মাৎ বিমানের মোড় ঘুরাইতে গেলে বৈমানিক টাল সামলাইতে পারে না; সেই চোট সহ্য করা এতই কঠিন হইয়া পড়ে যে, অনেক সময়ে বৈমানিক অজ্ঞান হইয়া যায়। গত মহাযুদ্ধে বিমানের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল বলিয়াই ঐভাবে ফাইটার বিমানগুলির বৃত্তাকারে

ঘুরিয়া ডগ-ফাইট করা সম্ভব হইত। আজকাল ফাইটার বিমানের চালকগণ সেই কৌশল অবলম্বন না করিয়া আকাশযুদ্ধের সময় নানাভাবে প্যাঁচ খেলিয়া থাকে। আধুনিক বিমানগুলির গতি এতই বেশী হইয়াছে যে, এক সেকেণ্ডের কয়েক ভগ্নাংশ সময় হাতে পাইলেও কোন দক্ষ বৈমানিক একটা প্যাঁচ খেলিয়া আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে। এই জন্যই প্রত্যেক বৈমানিক চেষ্টা করে যাহাতে বিপক্ষের বৈমানিক এরূপ কোন প্যাঁচ খাটাইবার সুযোগ ও সময় না পায়। উভয় পক্ষে একখানি করিয়া বিমান থাকিলেই আকাশযুদ্ধে এইভাবে প্যাঁচ খেলিতে বেশী সুবিধা। সেইজন্য আজকাল সাধারণতঃ দুইখানি বিমানে ডগ-ফাইট খুব কমই হয়; বিমানগুলি দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করে।

বোমারু বিমানের সহিত ফাইটার বিমানের লড়িবার কৌশল অন্যরূপ। বোমারুগুলির গতি সাধারণতঃই ফাইটারগুলি অপেক্ষা কম। তারপর বোমা বোঝাই হইলে গতি তো আরও কম হইবে। তাছাড়া ফাইটারের মত তখন ঐগুলি আকাশে তত অনায়াসে ঘোরাফেরাও করিতে পারে না। তবে বোমারুগুলির একটা সুবিধা এই যে, ফাইটারের তুলনায় ঐগুলির অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি বেশী।

ফাইটারগুলির প্রধান কাজ হইল বিপক্ষের বোমারুগুলিকে ধ্বংস করা বা লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার আগেই সেইগুলিকে তাড়াইয়া দেওয়া। প্রতিপক্ষের বোমারু আসিতেছে যখন টের পাওয়া গেল তখন ফাইটারগুলি স্থলে বা অন্তরীক্ষে দুইখানেই থাকিতে পারে। আকাশে থাকিলে ফাইটারগুলি দ্রুত ছুটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভূতলে থাকিলে বিমানগুলিকে প্রথমে দ্রুত উর্দ্ধে উঠিয়া তবে সম্মুখে ছুটিতে হয়। কাজেই ফাইটার বিমানগুলির কেবল দ্রুতগতিসম্পন্ন হইলেই চলে না, দ্রুত আকাশে উঠিবার শক্তিও সেইগুলির থাকা চাই। দূরপাল্লার বোমারু বিমানগুলি সাধারণতঃ দশ হাজার ফুট উঁচু দিয়া আসে। কোন ফাইটারের গিয়া বাধা দিতে হইলে মিনিট

চারেকের মধ্যেই অতটা উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আকাশে উঠিতে এক মিনিট দেরী হইলেই বিপক্ষের বোমারু বিমান ততক্ষণে চার পাঁচ মাইল আগাইয়া আসিবে। হানাদার বোমারুকে এত সময় দেওয়া চলে না। কাজেই আধুনিক ফাইটারগুলিকে দ্রুত উর্দ্ধে উঠিবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়। বিপক্ষের বোমারুকে আক্রমণের সময় ফাইটারের চালক বেতারের সাহায্য পায়। স্কোয়াড্রন বা ফ্লাইটের (তিনখানি বিমান লইয়া একটি ফ্লাইট এবং সাধারণতঃ নয়খানি বিমান লইয়া একটি স্কোয়াড্রন গঠিত হয়) নায়কগণ দুই দিকে রেডিও-টেলিফোন যোগে কাজ চালান। একদিকে বিমান-ঘাঁটি এবং অপর দিকে নিজ ফরমেশনের সঙ্গে রেডিও-টেলিফোনে যোগসূত্র থাকে। নায়ক বিমানঘাঁটি হইতে রেডিও-টেলিফোনে নির্দ্দেশ পান এবং তদনুসারে তিনি ফরমেশনের বৈমানিকদিগকে নির্দ্দেশ দেন।



ডগ-ফাইটের সময় যুদ্ধরত দুই বিমানের মধ্যে এইভাবে বৃত্ত ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে

বোমারু বিমানের পশ্চাদ্দিকস্থ কামান হইতেই ফাইটার বিমানের ভয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঐ কামানকে কোন ভাবে স্তব্ধ করিতে পারিলে ফাইটার-গুলি অনায়াসেই বোমারুগুলির পশ্চাদ্দেশে গিয়া আক্রমণ করিতে পারে। সেই অবস্থায় পড়িলে বোমারুর অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। ফাইটারগুলি

অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় এবং গতি বেশী থাকায় আকাশে এত সহজে ঘোরাফেরা করে যে, বোমারুগুলি কিছুতেই সেইগুলির সঙ্গে পারিয়া ওঠে না। কোন পলায়নপর বোমারুর পশ্চাদ্দিকস্থ কামান অচল করিবার জন্য ফাইটারগুলি সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। কাজেই পশ্চাদ্দিকে যে গোলন্দাজ থাকে তাহার ঝুঁকি ও বিপদ অনেকখানি। সামান্য ভুল করিলেই তাহার জীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমানখানি বিপন্ন হইতে পারে। বিমানযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, বিমানের পশ্চাদ্দিকস্থ গোলন্দাজরা হতাহত হয় সব চেয়ে বেশী।

সত্য বটে, ফাইটারের তুলনায় বোমারুর গতি কম; কিন্তু তাই বলিয়া বোমারুর চালকদিগকে সময়ের হিসাব কম করিতে হয় এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাছাড়া দীর্ঘপথ অতিক্রমের মত কষ্টসহিষ্ণুতাও তাহাদের থাকা দরকার। একারোহী ফাইটার বিমানের চালককে দুই ঘণ্টার বেশী আকাশে বড় থাকিতে হয় না; কিন্তু বোমারু বিমানের চালক ও অন্যান্য ক্রুদেরের অনেক সময় একাদিক্রমে দশ ঘণ্টারও বেশী সময় আকাশে বিচরণ করিতে হয়।

ফাইটারের মত বোমারুর কাজও প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া এবং গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া বোমা ফেলা। রাত্রির অন্ধকারে দূরপাল্লার বোমারুগুলি হানা দিবার জন্য শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে—অবস্থান জানিবার জন্য কোন বেতারের সাহায্য পাইবার উপায় নাই—ধরণী নিষ্প্রদীপ—আকাশের বুকে অক্লান্ত আবেগে ছুটিয়া চলে কালদৈত্যের মত ধ্বংসের বীজ ছড়াইতে। হুঁসিয়ার নেভিগেটর সতর্ক দৃষ্টিতে যন্ত্র ও মানচিত্রের দিকে চাহিয়া বিমানের গতিপথ নির্ণয় করে; দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে কি নিম্নে বিমান চলিবে, নেভিগেটর সহকর্ম্মীদের সেই নির্দ্দেশ দেয়। হাতের কাছে থাকে আবহাওয়ার বিবরণ; বিমানের গতিপথ নির্ণয়ে সেইটা নেভিগেটরের একটা প্রধান অবলম্বন। এই জন্যই যুদ্ধ বাধা মাত্র

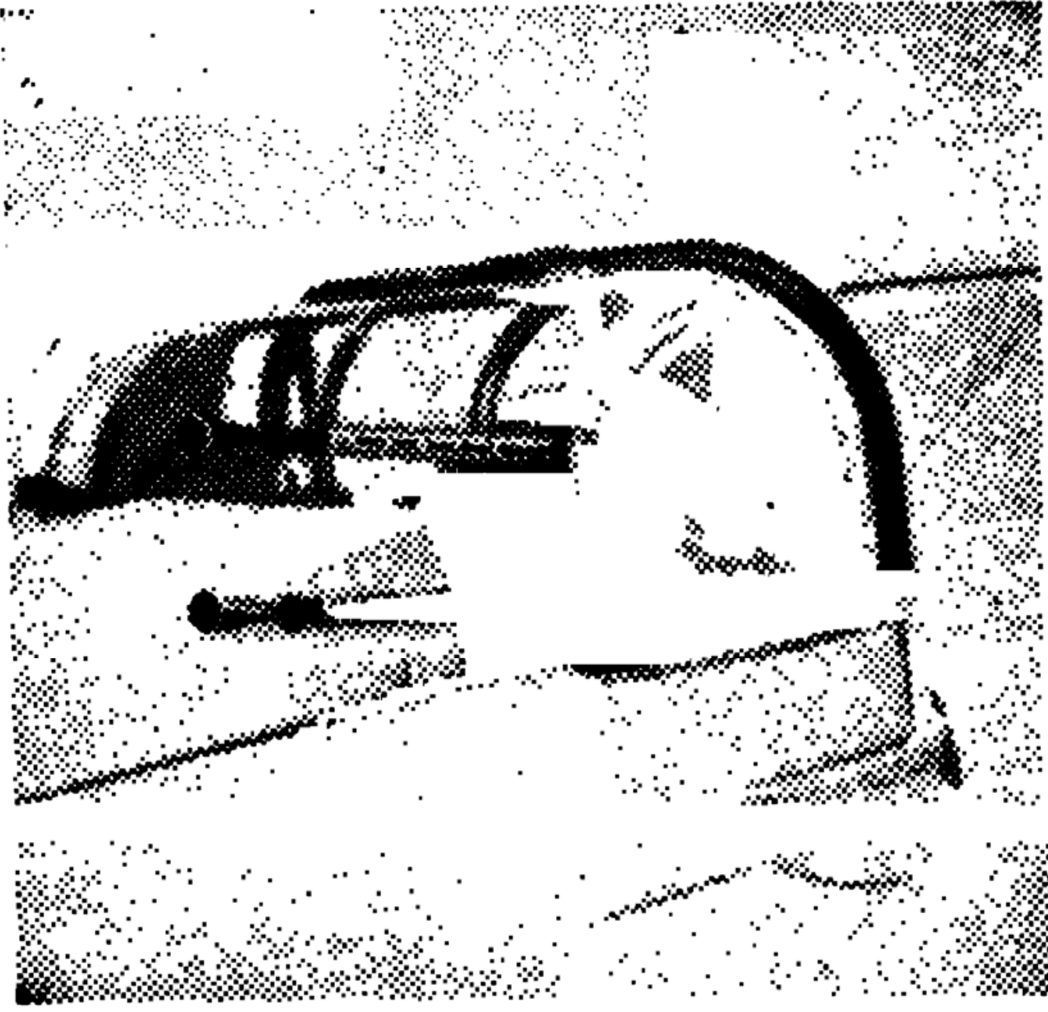
প্রত্যেক দেশ আবহতত্ত্ব যাহাতে শত্রু না জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে।

স্বপক্ষের এলাকা ছাড়াইয়া বিপক্ষের এলাকায় গিয়া পড়িলে বোমারুর দুই ভাবে বিপদ আসিতে পারে। হয়ত বিপক্ষের ফাইটার বিমান আসিয়া হাজির হইল, অথবা বোমারু গিয়া বিমানধ্বংসী কামানের মুখে পড়িল। বিমানধ্বংসী কামান এড়াইবার জন্য বোমারুগুলি সাধারণতঃ সর্পিল গতিতে আঁকাবাঁকা পথে চলে; কিন্তু তার মধ্যেও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পথ ঠিক রাখিতে হয়। কিন্তু ফাইটারের পাল্লায় পড়িলে বোমারুর অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। আজকাল অবশ্য বোমারুগুলিকে রক্ষার জন্য দূর পাল্লার ফাইটার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও বোমারুর তুলনায় ফাইটারের পাল্লা কম। এই মহাযুদ্ধে আর এক শ্রেণীর বিমান আমদানী হইয়াছে যেগুলিকে বলা যায় বোমারু-ফাইটার। এই শ্রেণীর বিমানগুলি বোমারু এবং ফাইটার দুইয়ের কাজই করে; তবে বেশী দূর পাল্লার বিমানহানায় এই-গুলিকে নিয়োজিত করা চলে না। গান-টারেটের প্রবর্ত্তন হওয়ায় আজকাল ফাইটারের হাত হইতে বোমারুর অব্যাহতির পথ বহুলাংশে প্রশস্ত হইয়াছে।

লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়াই বোমারুগুলি বোমা ফেলিতে আরম্ভ করে। দিনের বেলা বোমারুগুলি সর্ব্বদাই 'ফরমেশন' অর্থাৎ বিমানব্যূহ রচনা করিয়া চলে। আট হাজার ফুট কি তারও বেশী ঊর্দ্ধ হইতে বোমা ফেলার সময় বোমা-নিক্ষেপককে অনেক বিষয়ে সূক্ষ্ম হিসাব করিতে হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে বিমানের উচ্চতা, গতিবেগ এবং বায়ুপ্রবাহের গতি নির্ণয় করা দরকার। তারপর বোমা নিক্ষেপ করার সময় আকাশে বিমানকে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল রেখায় উড়িতে হয়। বোমারু বিমানের পক্ষে এই সময়টা খুব বিপজ্জনক; কারণ বিপক্ষের বিমানধ্বংসী কামান হইতে এই সময় বোমারুর অবস্থান নির্ণয় করিয়া গোলা দাগিতে খুবই সুবিধা। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকিলে বোমারু

আঁকিয়া বাঁকিয়া এবং ওঠানামা করিয়া চলিতে পারে ; তাহাতে বিমানধ্বংসী কামানের সাহায্যে বোমারুকে লক্ষ্য করা কঠিন।

বোমা ফেলার অনেক রকম কৌশল আছে ; এক রকম কৌশলকে বলা হয় 'প্যাটার্ণ বম্বিং'। মনে করুন, লক্ষ্যটি বড় এবং একাধিক বোমারু সেখানে বোমা ফেলিতে এক সঙ্গে গেল। বোমারুগুলি সেখানে দুই ভাবে বোমা ফেলিতে পারে। অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ফরমেশন গড়িয়া বোমারু-গুলি লক্ষ্যের উপর হাজির হইল এবং নায়কের সংকেত অনুযায়ী একসঙ্গে বোমাবৃষ্টি করিল। নতুবা লাইন-ফর-মেশন রচনা করিয়া একটির পর একটি বোমারু লক্ষ্যের উপর দিয়া যাইবার সময় বোমা ফেলিয়া গেল।



আধুনিক বিমানের গান-টারেট

এই গেল 'হাই অল্‌টিট্যুড-বম্বিং' বা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে বোমা ফেলার কথা। এইবার 'লো অল্‌টিট্যুড-বম্বিং' বা অপেক্ষাকৃত নিম্নাকাশ হইতে বোমা ফেলার কথা বলা যাইতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রায়ই মাঝারি আকারের বোমারু বিমান নিয়োজিত হইয়া থাকে। বড় বোমা বিদীর্ণ হইলে বায়ুমণ্ডলে যে ভীষণ আলোড়ন হয়, তাহার ফলে বোমারু বিমান খুব নীচে থাকিলে উহার ক্ষতি হইতে পারে। সেইজন্য বোমার ওজন ও আকৃতি বুঝিয়া ঠিক করা হয়, নিম্নাকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপের সময় কোন্ বিমানের কতখানি নীচে নামা চলে।

এছাড়া বোমা ফেলার তৃতীয় উপায় হইল 'ডাইভ' করা। উপর হইতে বোমারু বিমান লক্ষ্যস্থলের দিকে শোঁ করিয়া ছুটিয়া আসে এবং বোমা ফেলিয়াই আবার উঠিয়া যায়। কোন জাহাজ কিংবা স্থলযুদ্ধে বিপক্ষের বাহিনীর উপর আক্রমণের সময়ই সাধারণতঃ ডাইভ-বম্বিং হইয়া থাকে। কলকারখানা কিংবা অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যের উপর অল্‌টিট্যুড-বম্বিং অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে উর্দ্ধাকাশে বিমান রাখিয়া বোমা ফেলিতেই সুবিধা এবং তাহাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ; বিশেষতঃ উগ্রবিস্ফোরকপূর্ণ বেশী ওজনের বড় বোমা লইয়া ডাইভ-বম্বিং মোটেই সম্ভব হয় না।

বোমারুগুলি যে সর্ব্বদাই বোমাবর্ষণের কাজে নিয়োজিত হয় এমন নয়, অনেক সময় ফটোগ্রাফ তোলা, পর্য্যবেক্ষণ করা এবং প্রচারকার্য্যের জন্য ইস্তাহার ফেলার কাজেও সেইগুলিকে প্রতিপক্ষের এলাকায় পাঠান হয়।

আধুনিক বিমানের কাজ অশেষ। বোমা ফেলা, শত্রু বিমানের সহিত আকাশযুদ্ধ করা; বিপক্ষের এলাকায় গিয়া ফটো তোলা; তেল, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য বহন করা; মাইন পাতা; টর্পেডো ছোঁড়া; টহল দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ কাজই বিমানের করিতে হয়। এই সমস্ত কাজে বিপদ সব সময়ই আছে; কিন্তু স্থলযুদ্ধে বিমান একটা বিশেষ আক্রমণ-কৌশল খাটাইতে গিয়া অনেক সময় যে বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহার সহিত বোধ হয় আর কিছুরই তুলনা চলে না। এখানে সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

স্থলযুদ্ধে বিমান আক্রমণের এই কৌশলটাকে বলা হয় 'গ্রাউণ্ড ষ্ট্রেফিং' বা মাটি ছুঁয়ে গুলীবর্ষণ। বিপক্ষের সৈন্যেরা যখন অগ্রসর হইতে থাকে বা পরিখার মধ্যে আশ্রয় লয় তখন বিমানগুলি অকস্মাৎ অত্যন্ত নীচু দিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের উপর মুহুর্মুহু মেশিনগান দাগে। এইরূপ আক্রমণের ফলে বিপক্ষের সৈন্যেরা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। হতাহত তো হয়ই; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার এই যে, এইরূপ মারাত্মক আক্রমণের ফলে সৈন্যদের মধ্যে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হয়। আক্রমণকারী বিমানের চালকের

পক্ষেও এইভাবে আক্রমণ করিতে যাওয়া কম বিপদের কথা নয়। তাহাকে এতটা নীচে নামিতে হয় যে, বিপক্ষের সৈন্যেরা রাইফেল দাগিয়াই তাহার বিমানকে গুলীবিদ্ধ করিতে পারে। এক গুলীতেই তাহার ভূপাতিত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের এত কাছাকাছি সে আসে যে, কোন কারণে বিমানখানিকে হিসাবের বাইরে সামান্য এদিক-সেদিক করা দরকার হইলে তাহা করার উপায় থাকে না। সামান্য ব্যতিক্রমেই বিমান ধরাশায়ী হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে পারে।

কেবল যে সৈন্যদের অগ্রসর হইবার কালেই এই আক্রমণ-কৌশল অবলম্বিত হয় এমন নয়, বিপক্ষের সৈন্যেরা যখন পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে তখনও তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে বিমান হইতে এই কৌশলে আক্রমণ চালান হয়। আগে অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে এইভাবে পলায়নপর শত্রু বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইত। এই মাটি-ছোঁয়া বিমান আক্রমণে বিমান ও বৈমানিকের জীবননাশের সম্ভাবনা খুবই বেশী। তথাপি এই ধরণের আক্রমণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায় বলিয়া আজকাল সেনানীরা এত বড় বিপদের মুখেও বিমান পাঠাইতে ইতস্তত করেন না। বিমানগুলি হইতে কেবল মেশিনগানের গুলীই ছোটে না, ক্ষেত্র বিশেষে বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়। তবে বোমাগুলি পড়িয়াই ফাটে না; আক্রমণান্তে বিমান সরিয়া গেলে পর বোমা বিদীর্ণ হয়। নতুবা বিমান যেরূপ নীচে নামিয়া আসে তাহাতে বোমা বিস্ফোরণের ফলে উহা নিজেই জখম হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা চলে। আধুনিক গতিয় যুদ্ধে কোন একটি সেনাংশের একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া কিছু অসম্ভব নয়। স্বপক্ষের বাহিনীর সঙ্গে হয়ত কোন যোগাযোগই রহিল না। শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় কিছুতেই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পরিতেছে না, কোন্ দিকে গেলে স্বপক্ষের সাক্ষাৎ মিলিবে। সেই অবস্থায় কোন দিকে অগ্রসর হইতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেন না এমনও হইতে পারে যে তাহারা

গিয়া বিপক্ষের মুখেই পড়িল। বেতার-প্রেরক ও বেতার-গ্রাহক যন্ত্র সঙ্গে থাকিলে অবশ্য সাংকেতিক ভাষায় স্বপক্ষের সহিত বেতারবার্ত্তা বিনিময়ের দ্বারা নিজেদের এবং স্বপক্ষের অবস্থান নির্ণয় করা চলে এবং তদনুসারে কোন দিকে অগ্রসর হওয়া কি স্বপক্ষের সাহায্য আসিয়া না পৌছা পর্য্যন্ত পরিখা খনন করিয়া তাহাতে আশ্রয় লওয়া—যাহোক একটা কর্ত্তব্য তাহারা স্থির করিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে বেতারযন্ত্র না থাকিলে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। একমাত্র স্থলসেনার সাহায্যকারী বিমানই তখন তাহাদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। অবরুদ্ধ বাহিনীর ধারে কাছে প্রশস্ত জায়গা থাকিলে স্বপক্ষের বিমান সেখানে অবতরণ করিয়া সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু অবতরণের উপযোগী স্থান না থাকিলেও এক অভিনব উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদান করিয়া বিমান যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে। বিমান হইতে স্বপক্ষের অবরুদ্ধ বাহিনীকে সংবাদ পাঠাইতে কোন অসুবিধা নাই, উপর হইতে চিঠি লিখিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেই হইল; কিন্তু নীচ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করাই কঠিন। কি ভাবে এই সংবাদ সংগৃহীত হয়, এইবার তাহাই বলিব।

অবরুদ্ধ সৈন্যেরা স্বপক্ষের বিমান দেখিতে পাইলেই সংকেতে নিজেদের অবস্থানের কথা জানায়। তারপর সাত আট হাত লম্বা একটা সূতার এক মাথায় তাহারা চিঠি ও তার সঙ্গে সামান্য ভারী কোন জিনিস বাঁধিয়া দেয়। সূতার আর এক মাথায়ও ঐরূপ ভারী একটা কিছু বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর চার পাঁচ হাত উঁচু দুইটি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে আল্‌গা ভাবে সূতাটি ঝুলাইয়া রাখা হয়। এইবার বিমান একটি ডাণ্ডা ঝুলাইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে এবং ছোঁ মারিয়া সূতাটি লইয়া আবার উপরে ওঠে। ডাণ্ডার মাথায় একটি হুক লাগান থাকে। সূতাটি গিয়া সেই হুকে আটকায়। দুই দিকে সামান্য ভার দেওয়ায় সূতাটি আর কোন দিকে ঝুলিয়া পড়িতে পারে না বা উহা উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। বৈমানিক ডাণ্ডাটি

তুলিয়া হুক হইতে চিঠি সংগ্রহ করে এবং অবরুদ্ধ বাহিনীর বার্ত্তা লইয়া স্বপক্ষের শিবির অভিমুখে রওনা হয়। বলা বাহুল্য, 'গ্রাউণ্ড ষ্ট্রেফিং' অপেক্ষা একাজ বড় কম বিপজ্জনক নয়। একটু বেহুঁস হইলেই মাটিতে টক্কর খাইয়া বিমানদুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিমান

এইবার বিভিন্ন শ্রেণীর বিমান সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। সকল দেশের সমস্ত রকম বিমানের খবর পাওয়া কঠিন এবং এই স্বল্প পরিসরে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। অতএব বর্ত্তমান যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল বিমান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কেবল সেইগুলি সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলিব।

বৃটেনের ফাইটার বিমান সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই প্রথমে 'হকার হারিকেন' ও 'স্পীট ফায়ার' বিমানের কথা আসে। এই বিমানগুলি মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিতে পারে। দুই পাশের দুই ডানার এক একটিতে চারিটি করিয়া মোট আটটি মেশিনগান বসান থাকে। এইগুলি হইতে প্রতি মিনিটে মোট ৯৮০০টি গুলী ছোঁড়া যায়। সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, স্পীট ফায়ার ঘণ্টায় ৩৬৭ মাইল এবং হকার হারিকেন ঘণ্টায় ৩৩৫ মাইল বেগে ছুটিতে পারে। অবশ্য আকাশযুদ্ধে উপর হইতে নীচের দিকে 'ডাইভ' করার সময় এইগুলির গতিবেগ আরও অনেক বাড়িয়া যায়। স্পীট ফায়ারগুলি নাকি তখন ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ মাইল বেগে ছোটে। হকার হারিকেন উর্দ্ধে প্রায় সাত মাইল পর্য্যন্ত উঠিতে পারে; উহার আটটি মেশিনগান হইতে দশ সেকেণ্ডে আড়াই শত গুলী ছোঁড়া যায়।

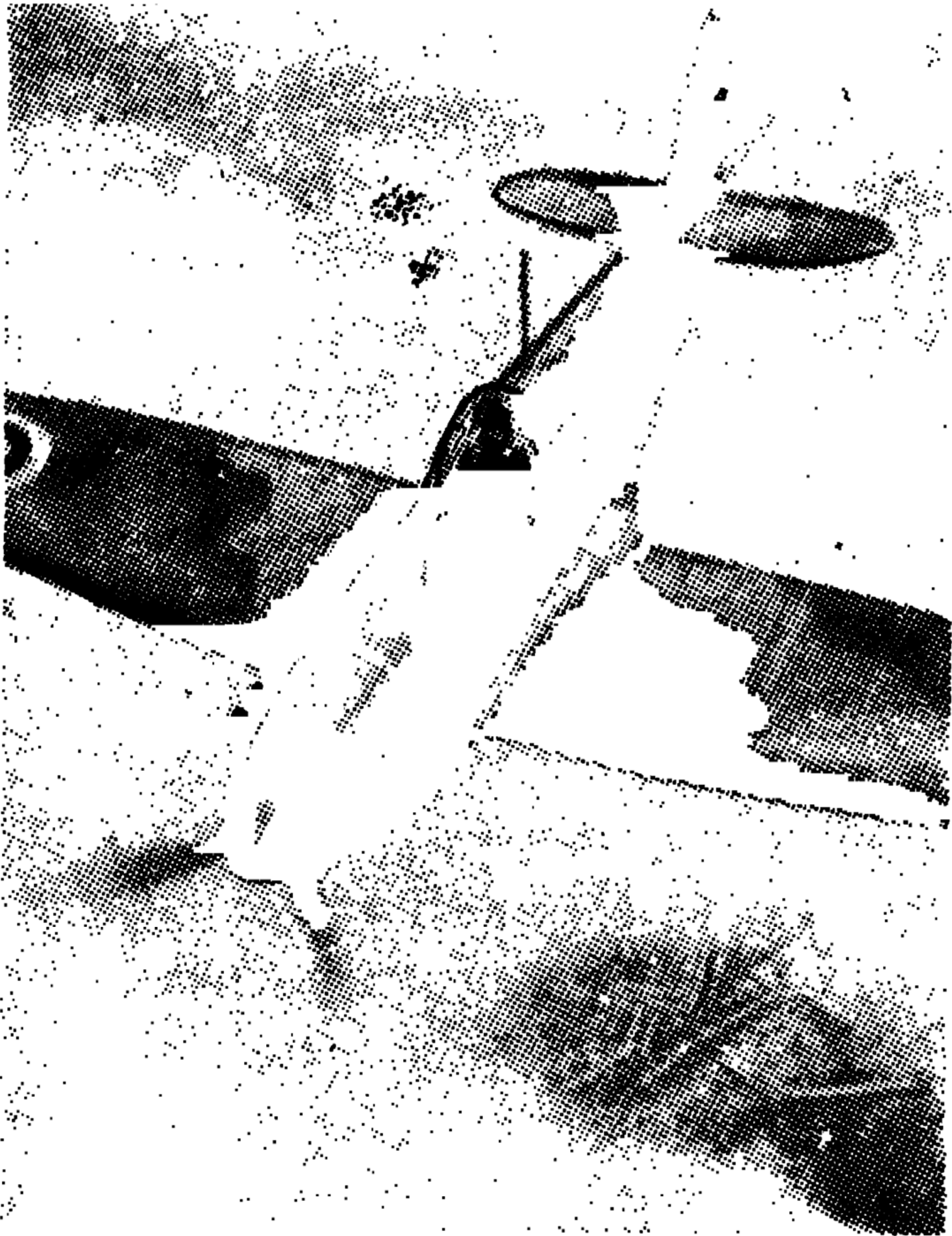
স্পীট ফায়ার এবং হারিকেন উভয়ই একারোহী বিমান। এইগুলিতে তেল খুব কম রাখা চলে, কাজেই বেশী সময় আকাশে থাকিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বৃটেনে 'ডিফায়াণ্ট' নামে নূতন এক শ্রেণীর

দ্বি-আরোহী বিমান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সেইগুলির পাল্লা বেশী এবং রক্ষী বিমান হিসাবে বোমারু বিমানের সঙ্গে কিছু দূর যাইতে পারে। ডিফায়াণ্ট বিমানের পৃষ্ঠদেশের গান-টারেটে দুই জোড়া মেশিনগান বসান থাকে। তাছাড়া সামনের দিকে গুলী বর্ষণের জন্য ডানায়ও মেশিনগানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য ডিফায়াণ্টই শেষ কথা নয়; ফাইটার বিমান নির্ম্মাণে আরও উন্নতি বিধানের জন্য বৃটেন নানাভাবে চেষ্টা করিতেছে।

বৃটেনের বোমারু বিমানগুলির মধ্যে ব্রিষ্টল 'ব্লেনহিমই' সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। সেইগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 'ব্লেনহিম—১' বিমানগুলি প্রধানতঃ পর্য্যবেক্ষক বোমারুর কাজ করে। ১৫ হাজার ফুট উচ্চে সেইগুলির গতি বেগ ঘণ্টায় ২৮৫ মাইল পর্য্যন্ত হয় এবং ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে সেইগুলি আকাশে একটানা ৫॥ ঘণ্টাকাল উড়িতে পারে। ব্লেনহিমগুলি কেবল বোমারুর কাজই করে না, দ্বি-আরোহী ফাইটারের কাজও করিয়া থাকে। এক কথায় বলা যায়, একারোহী ফাইটার ও বড় বোমারু বিমানের মাঝামাঝি বিমান ব্লেনহিম। এইগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বোমা লইয়া অনেক দূর যাইতে পারে, কিন্তু সহজে ঘোরাফেরা করিতে কোন অসুবিধা হয় না এবং প্রতি-পক্ষের ফাইটারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পটু। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে ব্লেনহিমের স্থান আসিয়া দখল করিয়াছে ব্রিষ্টল 'ব্যুফোর্ট'। টর্পেডো নিক্ষেপে সেইগুলি ওস্তাদ এবং অনেক বিষয়ে আগের ধরণের 'ব্লেনহিম' অপেক্ষা বেশী কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছে। বৃটিশ বিমানবাহিনী সাধারণতঃ 'ব্লেনহিম' ও 'ব্যুফোর্ট' সাহায্যেই ডাইভ-বোমারুর কাজ চালায়।

দূরপাল্লার বৃটিশ বোমারু বিমানগুলির মধ্যে 'ওয়েলিংটন', 'হুইটলি' এবং 'ওয়েলেসলির' নাম উল্লেখযোগ্য। বহু দূরে গিয়া বোমা ফেলিতে পারিলেও আধুনিক বোমারু বিমানের তুলনায় এইগুলির গতিবেগ অনেক কম। শুনা যায়, ব্লেনহিম হাজার মাইল এবং ওয়েলিংটন ষোল শত মাইল পর্য্যন্ত গিয়া বোমা ফেলিয়া আসিতে পারে। বৃটেনে সম্প্রতি 'হ্যালিফাক্স' নামে আর এক

শ্রেণীর বোমারু প্রস্তুত হইয়াছে। সেইগুলি ফাইটার-বোমারু বিমানের পর্য্যায়ভুক্ত। লিবিয়ার যুদ্ধে সেই বিমান ব্যবহারের খবর পাওয়া গেলেও উহার কার্য্যকারিতার কথা এখনও বিশদভাবে প্রকাশিত হয় নাই।



বৃটেনের ফাইটার বিমান 'স্পীট-ফায়ার'

এইবার জার্ম্মানীর বিমান সম্বন্ধে কিছু বলিব। অবশ্য এখানে মনে

রাখিতে হইবে যে, জার্ম্মান বিমান সম্বন্ধে জার্ম্মানীর সরকারী বিবরণ আমাদের পক্ষে পাওয়া দুষ্কর। বৃটিশ ও অন্যান্য সূত্রে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রথমে জার্ম্মান ফাইটার '১১২নং হাইঙ্কেল' বিমানের কথা বলা যাইতে পারে। সেইগুলি একারোহী ফাইটার এবং ঘণ্টায় গতিবেগ ৩১০ মাইলের কিছু বেশী। এই শ্রেণীর বিমানে সামনের দিকে দুইটি মেশিনগান ও দুইটি কামান থাকে। জার্ম্মান বিমান বাহিনীতে অবশ্য এই শ্রেণীর ফাইটার খুব বেশী নয়; 'মেসার্স মিষ্ট—১০৯' শ্রেণীর বিমানই বেশী। এইগুলিকে অনেক সময় 'ফ্লাইং ব্রিক' বলা হয়। ঘণ্টায় এইগুলি ৩৫৪ মাইল চলে। এই শ্রেণীর বিমানেরই আর একটু উন্নত সংস্করণ 'মেসার্স মিট—১০৯ আর' ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঘণ্টায় ৪৬৯ মাইল বেগে 'ডাইভ' করিয়া জগতে শীর্ষস্থান লাভ করে। খুব সুদক্ষ বৈমানিক না হইলে এইগুলি চালনা করিতে পারে না। এই বিমানে চারটি করিয়া মেশিনগান ও একটি করিয়া কামান থাকে। কামান হইতে প্রতি মিনিটে ৫০০ গোলা বর্ষণ করা চলে। এছাড়া জার্ম্মানী বৃটিশ 'ডিফায়াণ্ট' বিমানের মত দূর পাল্লার ফাইটারও নির্ম্মাণ করাইয়াছে। সেইগুলির নাম 'মেসার্স মিট—১১০'। এই বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৬৫ মাইল এবং ইহাতে দুইটি কামান ও চারটি মেশিনগান থাকে। বিমানের ডানায় তৈলাধারে ৪০০ গ্যালন পেট্রল ধরে এবং তাহার সাহায্যে ঘণ্টায় ১৬০ মাইল বেগে ইহা একটানা ১৭ শত মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। এই তৈলাধার এমন ভাবে সুরক্ষিত যে উহাতে কোন রূপেই আগুন লাগিবার বা ছিদ্র হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি জার্ম্মানীতে 'এফ ডব্লিউ—১৯০' নামে নূতন এক শ্রেণীর একারোহী ফাইটার বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৮ হাজার ফুট উর্দ্ধে এইগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৭০ মাইল। ইহাই জার্ম্মানীর অতি আধুনিক ফাইটার বিমান বলিয়া শুনা যায়।

জার্ম্মানীর গর্ব্বের বস্তু হইল তাহার বোমারু বিমান। তাহার '৮৭ বি—২' য়ুঙ্কার বিমানগুলি শত্রুর বক্ষে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এইগুলিই 'ষ্টুকা' বিমান

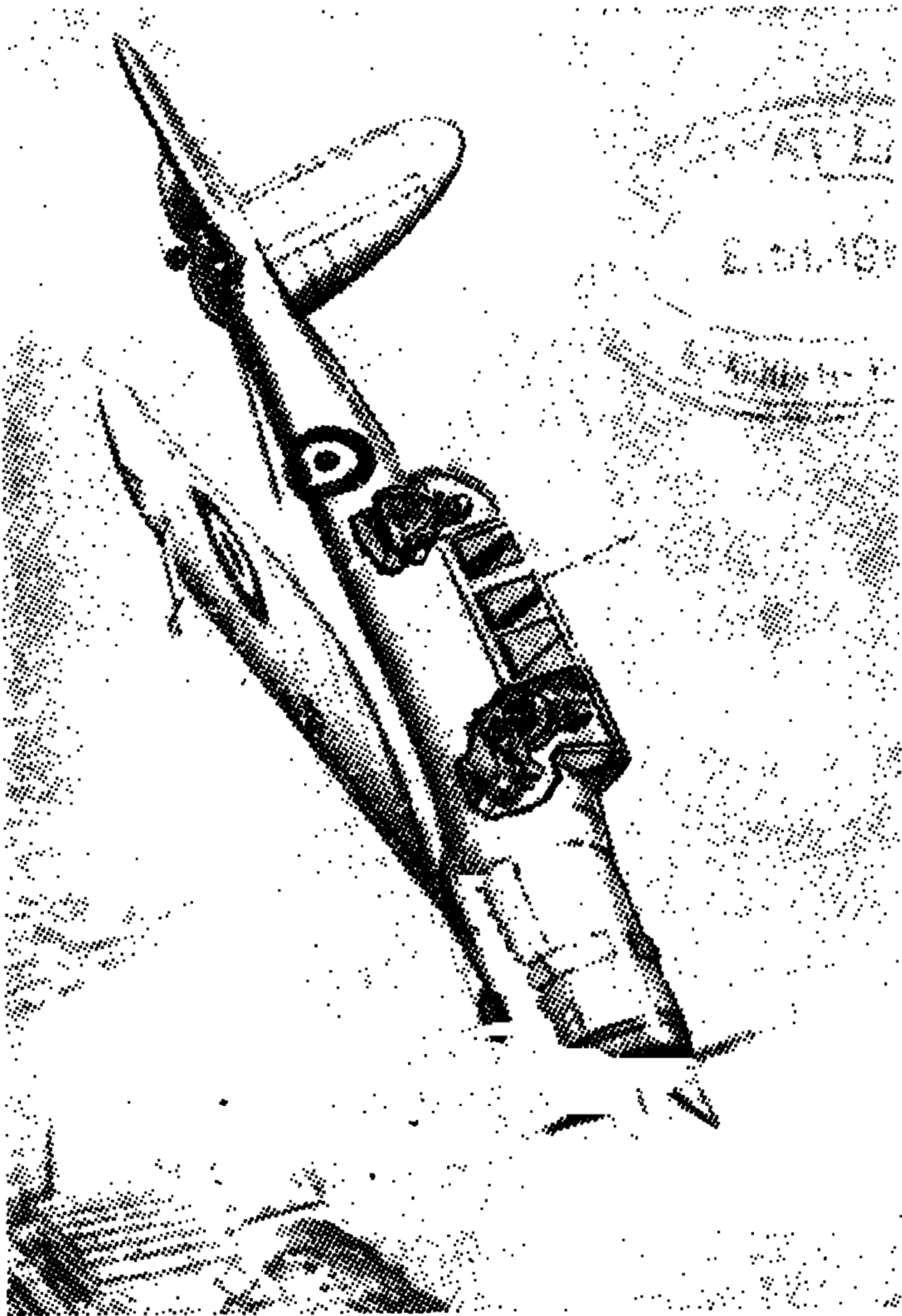
নামে খ্যাত। ডাইভ করিয়া বোমা ফেলিতে এইগুলি অদ্বিতীয়। ছোট বড় নানা প্রকার বোমা লইয়াই এইগুলি হানা দিতে পারে। বিমানগুলির ডানার শেষ প্রান্তে মেশিনগান বসান থাকে। উপর হইতে নীচে ছুটিয়া আসিয়া যখন এই বিমান বোমা বর্ষন করে তখন ইহার মেশিনগান হইতে অবিরল গুলী ছুটিতে থাকে। ষ্টুকার সাহায্যে 'গ্রাউণ্ড ষ্ট্রেফিং' কৌশলে আক্রমণ চালাইতে খুবই সুবিধা।

ষ্টুকা ছাড়া 'য়ুঙ্কার—৮৬', 'য়ুঙ্কার—৮৮', 'য়ুঙ্কার—৮৯', 'ডর্নিয়ার—১৭' প্রভৃতি জার্ম্মান বোমারু বিমানগুলিরও যথেষ্ট নাম আছে। 'য়ুঙ্কার—৮৮' বোমারুগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইল। দ্রুত গতিই এইগুলির বৈশিষ্ট্য। এই যুদ্ধে 'ডর্নিয়ার—১৭'ও খুব নাম করিয়াছে। এইগুলির আর এক নাম 'ফ্লাইং পেন্সিল'।

ডানায় ব্রেকযুক্ত ডাইভ-বোমারু বিমান জার্ম্মানীই প্রথম প্রস্তুত করে। সম্প্রতি 'ডর্নিয়ার ২১৭ই' নামে সে নূতন এক শ্রেণীর ডাইভ-বোমারু বিমান প্রস্তুত করিয়াছে। এই বিমানগুলিতে ডানার পরিবর্ত্তে লেজের দিকে 'অটোমেটিক' বা স্বয়ংক্রিয় ব্রেক বসান হইয়াছে। বোমারুগুলি ডাইভ করার সময় নীচের দিকে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশত মাইল বেগে ছুটিয়া আসে। স্বাভাবিক গতি ঘণ্টায় প্রায় তিনশত মাইল।

এইবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বোমারু বিমান 'ফ্লাইং ফোরট্রেস' বা উড়ন্ত দুর্গ সম্বন্ধে কিছু বলিব। এইগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০ হাজার ফুট উর্দ্ধে 'ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে' অর্থাৎ সমতাপ মণ্ডলে এই বিমান বিচরণ করিতে পারে। বহুদিন হইতে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পর্য্যটনের উপযোগী বিমান নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিয়াছিল; মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডক্টর স্যানফোর্ড এ মস 'টার্বো-সুপারচার্জ্জার' আবিষ্কার করিয়া সেই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। 'টার্বো-সুপারচার্জ্জার' আবিষ্কারের ফলে সমতাপ মণ্ডলের অতিশয় হাল্কা বায়ুতেও বিমানের এঞ্জিন চালনায় আর

কোন অসুবিধা হয় না। একমাত্র 'ফ্লাইং ফোরট্রেস্' ছাড়া আর সমস্ত বোমারু বিমানকেই 'অল্‌টিট্যুড বম্বিং'-এ সাধারণতঃ ১২ হাজার হইতে ২০ হাজার



বোমারু 'ডাইভ' করিয়া নীচে নামিতেছে

ফুট উর্দ্ধে থাকিয়া বোমা ফেলিতে হয়; আধুনিক বিমানধ্বংসী কামানের মুখে এই উচ্চতা নিরাপদ নয়; বিমানধ্বংসী গোলন্দাজগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হন ; কিন্তু ফ্লাইং ফোরট্রেস যে উর্দ্ধাকাশ দিয়া বিচরণ করে সেখানে বিমানধ্বংসী কামানের গোলা পৌছে না এবং অনেক সময়ই বিমান-গুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই দিবাভাগেও আত্মগোপন করিয়া এই বিমান অলক্ষ্যে প্রতিপক্ষের এলাকায় বোমা ফেলিয়া আসিতে পারে। অতি উর্দ্ধাকাশে বিচরণশীল ফ্লাইং ফোরট্রেস হইতে বোমা ফেলিয়া পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, প্রতি পাঁচটি বোমার মধ্যে তিনটি বোমাই নির্ভুলভাবে লক্ষ্যের উপর পড়ে। হাল্কা বায়ুমণ্ডলে চলে বলিয়া এইগুলির গতিও বেশী হয়, কেননা বায়ু এইগুলিকে প্রতিরোধ করে কম।

ফ্লাইং ফোরট্রেসই বর্ত্তমান জগতে বৃহত্তর বোমারু বিমান। এইগুলিতে ১২জন পর্য্যন্ত লস্কর থাকে। কিছুদিন আগে শুনা গিয়াছিল, জার্ম্মানরাও মার্কিনদের মত 'ষ্ট্র্যাটোস্ফেরিক' বিমান নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছে। তবে সে চেষ্টায় তাহারা কতখানি সফল হইয়াছে অদ্যাবধি তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান তাহাদের সামরিক ব্যাপারে অত্যন্ত চাপা ; কাজেই এই দুই দেশের বিমান সম্বন্ধে খবর খুবই কম। রুশ-ফিন যুদ্ধের সময় সোভিয়েট বিমান সম্বন্ধে অনেকেই অনেক দুর্নাম রটাইয়াছিল ; কিন্তু তাহার আগে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেকেই বলিয়াছিলেন যে, সেখানে সোভিয়েট বিমানের কৃতিত্বের পরিচয় বহুক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ বাধার পর সোভিয়েট বিমানের শক্তি সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ নাই। সোভিয়েট যোদ্ধারা জার্ম্মানদের সহিত এক নূতন শ্রেণীর ফাইটার লইয়া যুদ্ধ করিতেছে যাহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫০ মাইল। এ ছাড়া 'টি-বি—৭' নামে নূতন এক প্রকার বোমারু বিমান সম্প্রতি সোভিয়েট যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে আমদানী করিয়াছে। এইগুলি ৪ টন বোমা লইয়া বহু দূরে গিয়া তাহা ফেলিয়া আসিতে পারে। অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে এই বোমারুগুলি সজ্জিত।

জাপানী বিমান সম্বন্ধে খবরের অভাব আরও বেশী। তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে, জাপানী সামুদ্রিক বিমানের শক্তি যথেষ্ট এবং তজ্জন্য সে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে।

বোমা ও গ্যাস

বিমান হইতে যে বোমা ফেলিয়া ধ্বংসলীলা সাধিত হয় এইবার তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বোমা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই আসে বিস্ফোরকের কথা; কারণ বোমার যা কিছু মালমসলা ঐ বিস্ফোরক। শুধু বোমা কেন—এযুগের মত মারণাস্ত্র সবটাতেই বিস্ফোরকের কারবার। কামানের গোলা, টর্পেডো, মাইন, বোমা—সবই হইল এক একটি বিস্ফোরকের আধার। ঐগুলির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই ঘটে যত প্রলয়কাণ্ড।

বিস্ফোরক আর কিছুই নয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত একটি যৌগিক পদার্থ। ইহার উপাদান ও গঠন সম্বন্ধে বলিতে হইলে বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইতে হয়; কাজেই সেদিকে না গিয়া ইহার শক্তি সম্বন্ধেই মোটামুটি দুই-চারিটি কথা বলিব। বিস্ফোরক অতি দ্রুত জ্বলিয়া গিয়া যে অপর্য্যাপ্ত গ্যাস সৃষ্টি করে তাহার চাপই হইল উহার শক্তি। কাজেই যে রাসায়নিক পদার্থ যত দ্রুত জ্বলিয়া গিয়া যত বেশী পরিমাণে গ্যাস সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই তত বেশী মারাত্মক বিস্ফোরক। কোনও জিনিসকে দ্রুত জ্বালাইতে প্রয়োজন অক্সিজেনের। এই জন্যই বিস্ফোরক প্রস্তুতে এমন সব উপাদান ব্যবহৃত হয় যেগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন বিদ্যমান—অথবা যেগুলি অতি সহজেই বাহিরে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিতে পারে।

বোমা বা কামানের গোলা যে প্রচণ্ড শক্তিতে বিদীর্ণ হয় এবং যে অসহ্য তাপ সৃষ্টি করে, তাহা ধারণাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে রুদ্ধ গ্যাসের চাপে বোমা ও কামানের গোলা ফাটে, তাহার চাপ পড়ে প্রতি

বর্গ ইঞ্চিতে ২ লক্ষ হইতে ৩ লক্ষ পাউণ্ড। বাষ্পের যতখানি চাপে কলঘরে একটি বয়লার ফাটিতে পারে, বোমা বা কামানের গোলা ফাটে তদপেক্ষা হাজার গুণ বেশী চাপে। ইহাতেই বুঝা যায়, রুদ্ধ গ্যাসরাশি কিরূপ দুর্ব্বার শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। বোমা বা কামানের গোলার যে ধাতব আধারে বিস্ফোরক রাখা হয় তাহা এই প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায় এবং বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া সম্মুখে যাহা পায় তাহাতেই আঘাত করে। এদিকে অপর্য্যাপ্ত গ্যাস অকস্মাৎ চারিদিকে ছাড়া পাইয়া বায়ুর



বিমান হইতে বোমা ফেলা হইতেছে

উপর ভীষণ চাপ দেয়। সেই চাপে আশেপাশে সবকিছু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। কামানের গোলা বা বোমা বিদীর্ণ হইলে অকস্মাৎ বায়ুতে যে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়—সহস্র সহস্র কালবৈশাখী একত্র তাণ্ডব নৃত্য করিলেও বুঝি তাহার সহিত তুলনা হয়না। বিস্ফোরণের স্থলে সমস্ত ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ তো হয়ই; এতদ্ব্যতীত দূরে যেসকল বাড়ীঘর থাকে, বায়ুর চাপে

সেগুলির কাচের জানালা-কপাট পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায় এবং গাছপালা সব উল্টাইয়া পড়ে। এই জন্যই বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাড়ীর জানালা-কপাটগুলির সম্মুখে বালির বস্তা দিয়া প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হয়। বোমা এবং কামানের গোলা ফাটিলে যেমন বায়ুতে চাপ পড়ে—টর্পেডো, মাইন এবং ডেপ্‌থ্‌চার্জ্জ ফাটিলেও ঠিক তেমনই জলে অসম্ভব চাপ পড়ে। সেই জলের চাপেই জাহাজ ঘায়েল হয়।

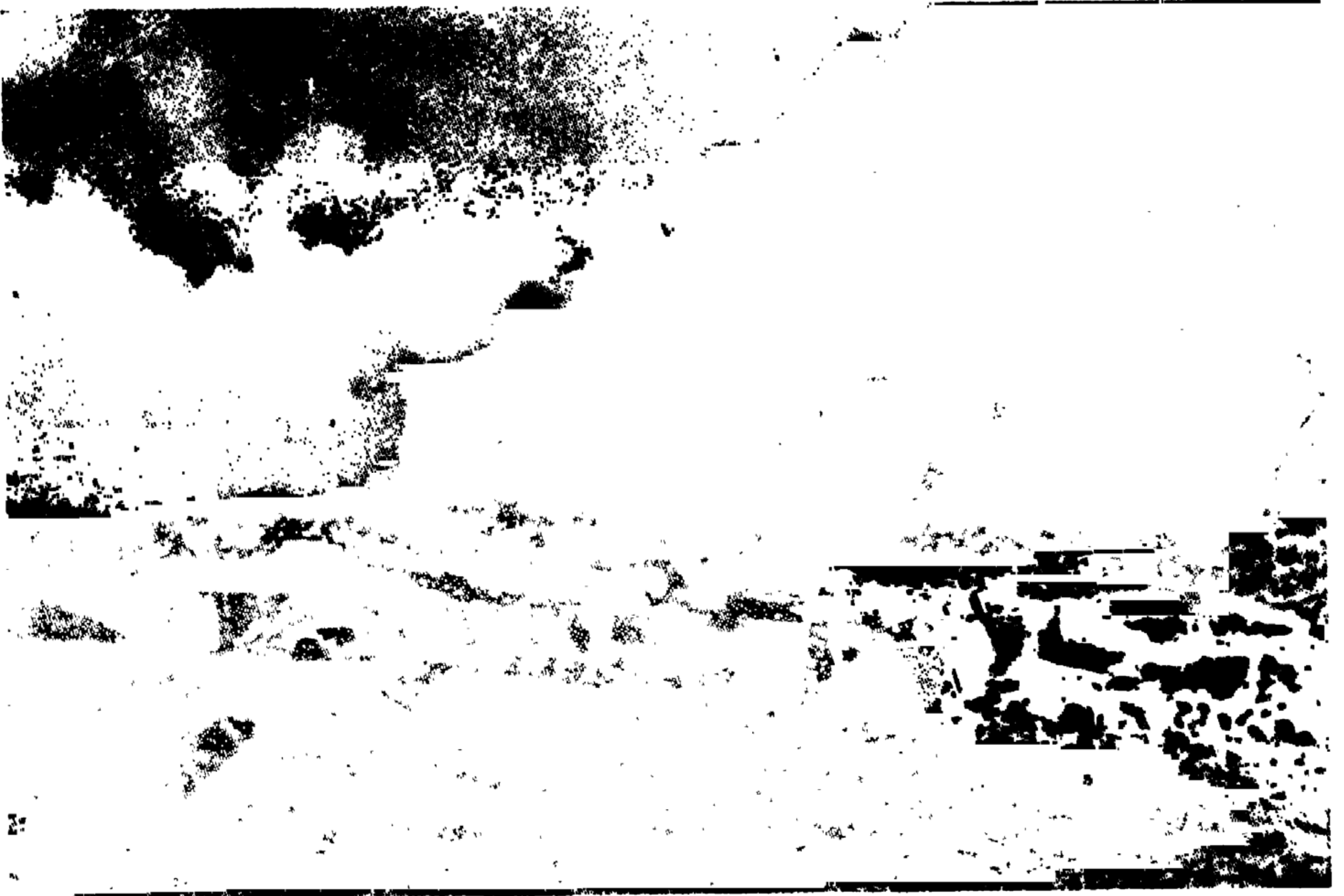
বিমান আক্রমণের প্রধান অস্ত্রই হইল বোমা। বিমানে যেসব কামান-বন্দুক থাকে, সেগুলি ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ যখন যুদ্ধ বাধে বিমানে-বিমানে। অন্তরীক্ষ হইতে ভূপৃষ্ঠে আক্রমণ চালাইতে হইলে বোমাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী আয়ুধ।

বিমান হইতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত করিবার জন্য ফেলা হয় অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক বোমা; কোথাও ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালাইবার জন্য ফেলা হয় আগ্নেয় বোমা; আর বিপক্ষকে বিষাক্ত গ্যাসে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য ফেলা হয় গ্যাস-বোমা। আন্তর্জ্জাতিক নীতি অনুসারে অবশ্য বিষাক্ত গ্যাস-বোমা ব্যবহারের নিয়ম নাই; কিন্তু শত্রুতা যখন চরমে পৌঁছে তখন সকলে এই নীতি মানিয়া চলে না।

বোমার আকৃতি ফুটবলের মত গোল নয়; দেখিতে একটু লম্বা। বোমার বহিরাবরণ বা খোল নির্ম্মিত হয় ইস্পাতে—ভীতর ফাঁপা আর মুখের দিকটা থাকে অত্যন্ত চোখা। উহার ভিতরে ভরিয়া দেওয়া হয় যতরকম মারাত্মক পদার্থ।

বড় বিস্ফোরক বোমাগুলি ওজনে এক একটি পাঁচ ছয় মণ হইতে চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত হয়। মাঝারি বোমাগুলির ওজন দেড় মণ হইতে দুই মণ এবং ছোট বোমাগুলির ওজন দুই তিন সের হইতে চৌদ্দ পনর সের পর্য্যন্ত। এক শ্রেণীর বোমা আছে কোন কিছুর উপর পড়িবামাত্রই ফাটিয়া যায়, আবার

আর এক শ্রেণীর বোমা আছে যেগুলি কোন বিরাট অট্টালিকার ছাদে পড়িলে কয়েকতলা ভেদ করিয়া নীচে চলিয়া যায় এবং তারপর বিদীর্ণ হয়। বোমা বিদীর্ণ হইবার সময় এত জোরে শব্দ হয় যে, কানের পর্দ্দা ফাটিয়া অনেকে সেই শব্দে চিরদিনের মত বধির পর্য্যন্ত হইয়া যায়। অনেকের



বোমায় বিধ্বস্ত অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ

ধারণা আছে যে, মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিলে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে চাপ ও পাল্টা চাপের সৃষ্টি হয় তাহাতে বুঝি তাহার নাক মুখ দিয়া অপর্য্যাপ্ত বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে এবং পাল্টা টানে ভিতর হইতে সমস্ত বায়ু টানিয়া বাহিরে আনে। এই ধারণা ভুল। যেভাবে বায়ুতরঙ্গ বিস্তারলাভ করে তাহাতে খাড়া মানুষের নাসারন্ধ্রে বা মুখগহ্বরে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। তবে বায়ুর চাপ শরীরের বাহিরে লাগিলে

অনেক সময় ফুস্‌ফুস্‌ ও দেহাভ্যন্তরে অন্যান্য যন্ত্রের বিষম ক্ষতি হইতে পারে। বড় বোমাগুলি ভূতলে পড়িয়া যে কাণ্ড বাধায় তাহা বর্ণনাতীত। বিস্ফোরণের ফলে মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায় এবং বিরাট এক একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়। প্রবল কম্পনের ফলে চতুষ্পার্শ্বস্থ বাড়ীঘর অসহায়ের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। বোমার খোলের ভাঙ্গা টুক্‌রা এবং অভ্যন্তরস্থ ধাতুখণ্ড বুলেটের মত নানাদিকে ছুটিতে থাকে। ধূলামাটি সব একত্রে মিশিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ভীষণ তাপে সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

ইহার পর আছে আগ্নেয় বোমা। আগ্নেয় বোমার ওজন বেশী হয় না। দেড় সের দুই সের হইতে বড় জোর ত্রিশ সের পর্য্যন্ত। সমস্ত আগ্নেয় বোমা বিস্ফোরিত হয় না, কতকগুলি পড়িয়াই জ্বলিতে আরম্ভ করে। আগুন জ্বলিবার জন্য উহার ভিতরে রাসায়নিক দ্রব্য তো পূরিয়া দেওয়া হয়ই; তাছাড়া উহার খোলটিও দাহ্য পদার্থে প্রস্তুত বলিয়া নিজেই জ্বলিতে থাকে—অর্থাৎ আকাশ হইতে পড়িয়াই ঐগুলি এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয় এবং যাহা পায় তাহাতেই আগুন ধরাইয়া দেয়। এই আগ্নেয় বোমার অগ্নিলীলা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর, ইতিপূর্ব্বে থারমাইট বোমা প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে।

আজকাল নানা প্রকার আগ্নেয় বোমা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। রুশ-ফিন যুদ্ধে প্রথম সোভিয়েট বিমানবাহিনী এক নূতন ধরণের আগ্নেয় বোমা ব্যবহার করে। উহার নাম 'মলোটফস্‌ ব্রেড বাস্কেট' বা মলোটফের রুটির ঝুড়ি। একটি বড় আধারে উগ্র বিস্ফোরক এবং অনেকগুলি আগ্নেয় বোমা ভরিয়া দেওয়া হয়। আসল বোমাটি কিছুদূর নামিয়াই শূন্যপথে বিস্ফোরিত হয় এবং উগ্র বিস্ফোরক বোমাটি হইতে আগ্নেয় বোমাগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তারপর উগ্র বিস্ফোরক বোমা নামিয়া বাড়ীঘর ধ্বংস করে এবং আগ্নেয় বোমাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পড়িয়া সেই ধ্বংসস্তূপে ভীষণভাবে

অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। ফলে ধ্বংসস্তূপ হইতে কিছু উদ্ধার করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আগুন লাগাইবার উদ্দেশ্যে এখন অনেকস্থলে পেট্রল-বোমাও ব্যবহার করা হয়। বোমাগুলিতে পেট্রল ভরতি থাকে। ভূতলে পড়িলেই রাসায়নিক বস্তুর সংস্পর্শে তাহা জ্বলিয়া ওঠে। জাপানীরা আবার ফসফরাস বোমা নামে একপ্রকার আগ্নেয় বোমা ফেলে। বোমাগুলি খুবই মারাত্মক। একটি বোমার মধ্যে রবারে প্রস্তুত অনেকগুলি ছোট ছোট বল থাকে। বলগুলি ফসফরাসে ভরতি। বোমাটি পড়িয়াই ফাটিয়া যায় এবং বলগুলি দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। এমন কি বলগুলি অনেক সময় পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। বলগুলি ছিটকাইয়া পড়া মাত্রই, কি দুই এক মিনিট অন্তে জ্বলিতে আরম্ভ করে। পাঁচ সাত মিনিটকাল পর্য্যন্ত সেগুলি জ্বলে। জ্বলিবার সময় রবারপোড়া একটা বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়।

এই আগ্নেয় বোমার হাত হইতে রেহাই পাইবার এখন নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। একপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত পাত্র বাহির হইয়াছে যাহার হাতল ঘুরাইলে অবিরল ধারে বালু নির্গত হইয়া আগ্নেয় বোমার দাহন ও বিস্তার প্রতিহত করে। দমকলের লোক, পুলিশ, পথিক, গৃহবাসী প্রত্যেকের সঙ্গে যদি ঐরূপ বালুপূর্ণ যন্ত্র থাকে তাহা হইলে আগ্নেয় বোমার সর্ব্বধ্বংসী বিস্তার হইতে আত্মরক্ষা করা কতকাংশে সম্ভব।

তারপর আসে গ্যাস-বোমার কথা। আজকাল বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইতে হইলেই বিমান হইতে ফেলা হয় বোমা। গত মহাযুদ্ধে কিন্তু কামানের গোলা সাহায্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্যাস ছড়ান হইত। কামানের গোলার মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইত বিষাক্ত গ্যাস এবং সেই কামানের গোলা যেখানে গিয়া ফাটিত সেখানে চারিদিকে গ্যাস ছড়াইয়া পড়িত। এতদ্ব্যতীত ইস্পাতের চোঙ্গায় গ্যাস ভরিয়া শত শত চোঙ্গা সারবন্দী ভাবে বসান হইত। অনুকূল বাতাস পাইলেই চোঙ্গাগুলির মুখ একসঙ্গে খুলিয়া দেওয়া হইত এবং

অপর্য্যাপ্ত গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া মেঘের মত শত্রুপক্ষের পরিখার দিকে উড়িয়া যাইত। স্থলযুদ্ধে এইভাবে গ্যাস ছাড়িবার আরও নানা উপায় অবলম্বিত হইত; কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে বিমান হইতেই গ্যাস ছড়াইবার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে বেশী।

বিমান হইতে গ্যাস নিক্ষেপ করা যায় দুইভাবে—বোমা ছুঁড়িয়া অথবা কোন পাত্র হইতে তরল গ্যাসের ধারা ফেলিয়া। শেষোক্ত উপায়ে গ্যাস ছাড়ায় একটু অসুবিধা আছে; কারণ বেশী উপর হইতে গ্যাস ফেলিতে



আগ্নেয় বোমার অগ্নিলীলা

গেলে ভূতলে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই উহার অধিকাংশ বায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পে পরিণত হয় এবং উড়িয়া যায়। ভূতলে আসিয়া আদৌ উহা নাও পৌছিতে পারে। কাজেই উহাতে লোকসানের সম্ভাবনাই থাকে অধিক। আর বেশী নীচে নামিতে গেলেও বিমানধ্বংসী কামানের ভয় আছে। কাজেই বোমা-

সাহায্যে গ্যাস ছড়ানই হইল সুবিধা। তাহাতে এক ঢিলে দুইপাখী মরে—বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ আধুনিক বিস্ফোরক বোমাগুলি ফাটিলে একদিকে যেমন সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, তেমনই অপর দিকে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া পাইয়া প্রতিপক্ষকে বিষম বিপদের মধ্যে ফেলে। গ্যাস-বোমাগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত হয় যাহাতে ঐগুলি ভূতলে পড়িয়া মাটির মধ্যে না প্রবেশ করে। তাহাতে সুবিধা এই যে, বোমাটি বিদীর্ণ হইলেই উহার অভ্যন্তরস্থ সবখানি গ্যাস একসঙ্গে মাটির উপর ছাড়া পায় এবং তাহাতে গ্যাসে জোর ধরে বেশী।

বোমার মধ্যে কঠিন, তরল ও বাষ্প এই তিন আকারেই গ্যাস রাখা চলে। কঠিন গ্যাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে থাকে এবং বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া তাহা ক্রমশঃ বাষ্পে পরিণত হয়। তরল গ্যাস কোন কিছুর উপর পড়িলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; এমন কি সাতদিন পর্য্যন্ত ইহাকে সক্রিয় থাকিতে দেখা যায়। আর বাষ্পীয় গ্যাস ছাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়; তাহা অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। কাজেই দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া তরল গ্যাসই ব্যবহার করা হয় বেশী। ইহাকে বলা হয় 'মাষ্টার্ড গ্যাস'। গন্ধ অনেকটা সরিষার তেলের মত, সেজন্যই ইহার নামকরণ হইয়াছে 'মাষ্টার্ড গ্যাস'। এই গ্যাস কোন কিছুর উপর পড়িলে তাহার সহিত মিশিয়া যায় এবং আস্তে আস্তে বিষাক্ত বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে। ইহার ক্রিয়া অতি মারাত্মক, শরীরের কোন স্থানে লাগিলে ফোস্কা পড়িয়া ঘা হইয়া যায়। জামা কাপড় ভেদ করিয়া পর্য্যন্ত ইহা শরীরে প্রবেশ করে। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ হইল এই যে, ইহার আক্রমণ প্রথমে উপলব্ধি করা যায় না; আক্রান্ত হইবার সাত আট ঘণ্টা পর শরীরে সব উপসর্গ দেখা দেয়। এই গ্যাস যেস্থানে পড়ে সেই স্থান দিয়া হাঁটিয়া যাওয়াও অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইহার মত আর এক প্রকার মারাত্মক গ্যাস আছে যার নাম লিউসাইট। তবে শেষোক্ত গ্যাসের তীব্র গন্ধ আছে এবং উহার ক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত

দ্রুত হয়। আর তাছাড়া উহার প্রথম আক্রমণেই নাকেচোখে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়; কাজেই লোক সময় থাকিতে সাবধান হইবার সুবিধা পায়।

আরও নানাপ্রকারের গ্যাস আছে। কোনটিতে হাঁচি, কোনটিতে কাসি—আবার কোনটিতে আসে চক্ষে জল। কাঁদুনে-গ্যাস লাগিলে লোকের চক্ষু দিয়া যত জল পড়ে, পুত্রশোকেও বুঝি তত জল আসে না। গ্যাস লাগিয়া লোক অন্ধ পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

বিমান হইতে কেবল যে গ্যাসই ফেলা হয় এমন নয়। শুনা যায়, শত্রু-পক্ষের শিবিরে অথবা কোন জনপদে মহামারী সৃষ্টির জন্য সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুও ফেলার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধে ইহার মত বর্ব্বরতা আর নাই।

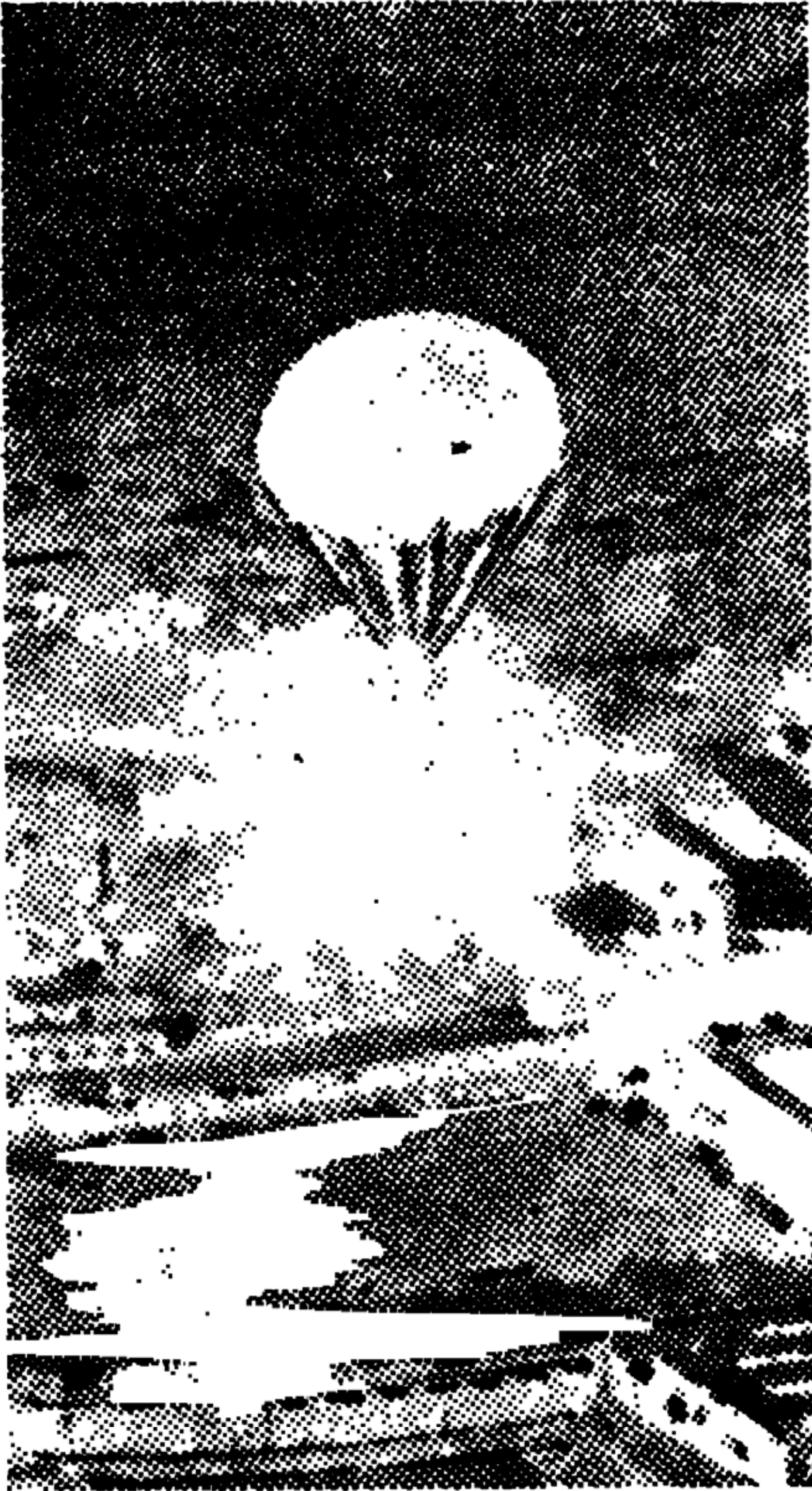
আলোক-বোমা

নৈশ বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেমনই সহর নিষ্প্রদীপ করার ব্যবস্থা হইয়াছে, তেমনই অপরদিকে উহা ব্যর্থ করিয়া কিভাবে রাত্রির অন্ধকারেই সাফল্যের সহিত বিমান আক্রমণ চালান যায় তজ্জন্যও নানারূপ আয়োজন হইয়াছে। রাত্রির অন্ধকার দূর করার জন্য একপ্রকার আলোক-বোমা ব্যবহৃত হয়। এই বোমা সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া আক্রমণ তো চালান যায়ই; তদুপরি শত্রুপক্ষের ঘরবাড়ী, কল-কারখানা, সৈন্য-শিবির প্রভৃতির নিখুঁত চিত্রটিও রাত্রির অন্ধকারেই অনায়াসে তুলিয়া আনা যায়। এই আলোক-বোমা আবিষ্কৃত হওয়ায় বিমান হইতে রাত্রিতে ফটো তুলিতে আর কোন অসুবিধা হয় না।

ভূতলে রাত্রিতে 'ফ্ল্যাশ লাইট' সাহায্যে যেমন ফটো তোলা হয়—আলোক-বোমা সাহায্যে বিমান হইতে ফটো গ্রহণের উপায়ও প্রায় তদনুরূপই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বিভাগ গত দশ বার বৎসর যাবৎ

ইহা লইয়া বিস্তর গবেষণা করিয়াছে এবং বহু চেষ্টায় এদিকে অনেকখানি অগ্রসরও হইয়াছে। ফটো গ্রহণের কায়দাটি বড়ই মজার।

প্যারাশুটের সহিত সংলগ্ন একটি আলোক-বোমা বিমান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্যারাশুটের ভাঁজ খুলিয়া গেলেই বোমাটি বিদীর্ণ হয়। প্যারাশুটটি এমন সময় খোলে এবং বোমাটিও এমন সময়ই বিদীর্ণ হয়, যেসময়ের মধ্যে বিমানখানি বোমা বিস্ফোরণের বিপজ্জনক এলাকা ছাড়াইয়া গিয়া ফটো গ্রহণের জন্য ঠিক ঠিক অবস্থান লইতে পারে। বোমাটি বিদীর্ণ হইলেই যে আলোর ঝল্‌কানি হয় তাহাতে ভূতলের সব দেখা যায় এবং ঐ আলো হইতে যে রশ্মি আসে তাহাতেই বিমানস্থ ক্যামেরায় 'শাটার'এর কাজ হইয়া যায়। ভূতলের ছবিটি দিব্যি ক্যামেরায় ধরা পড়ে।



আলোক-বোমা

সামরিক দিক দিয়া এই নূতন ধরনের আলোক-বোমার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে বিমান হইতে বোমা ফেলিতে হইলে লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু এই আলোক-বোমা বিদীর্ণ করিয়া ভূতলের সব কিছু চমৎকার দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। আবার রাত্রিতে শত্রুপক্ষের অবস্থানের ফটো তুলিয়া আনিবার পক্ষেও ইহা অতি চমৎকার। লক্ষ্য নির্ণয়

এবং ফটো গ্রহণ—দুই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। বোমা ফেলিয়া ধ্বংস তো করা হইলই—আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধ্বংসলীলার চিত্রটিও তুলিয়া লওয়া হইল। কাজেই সংবাদপত্র জগতেও এই আলোক-বোমা কম বিস্ময় সৃষ্টি করে নাই। কবে কোথায় কোন রাত্রিতে জাহাজডুবি হইল বা নৈশ আক্রমণে কোন নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িল তাহার ছবি। পরদিন সকাল বেলায় সংবাদপত্রগুলি তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া সকলকে একেবারে তাক লাগাইয়া দিল।

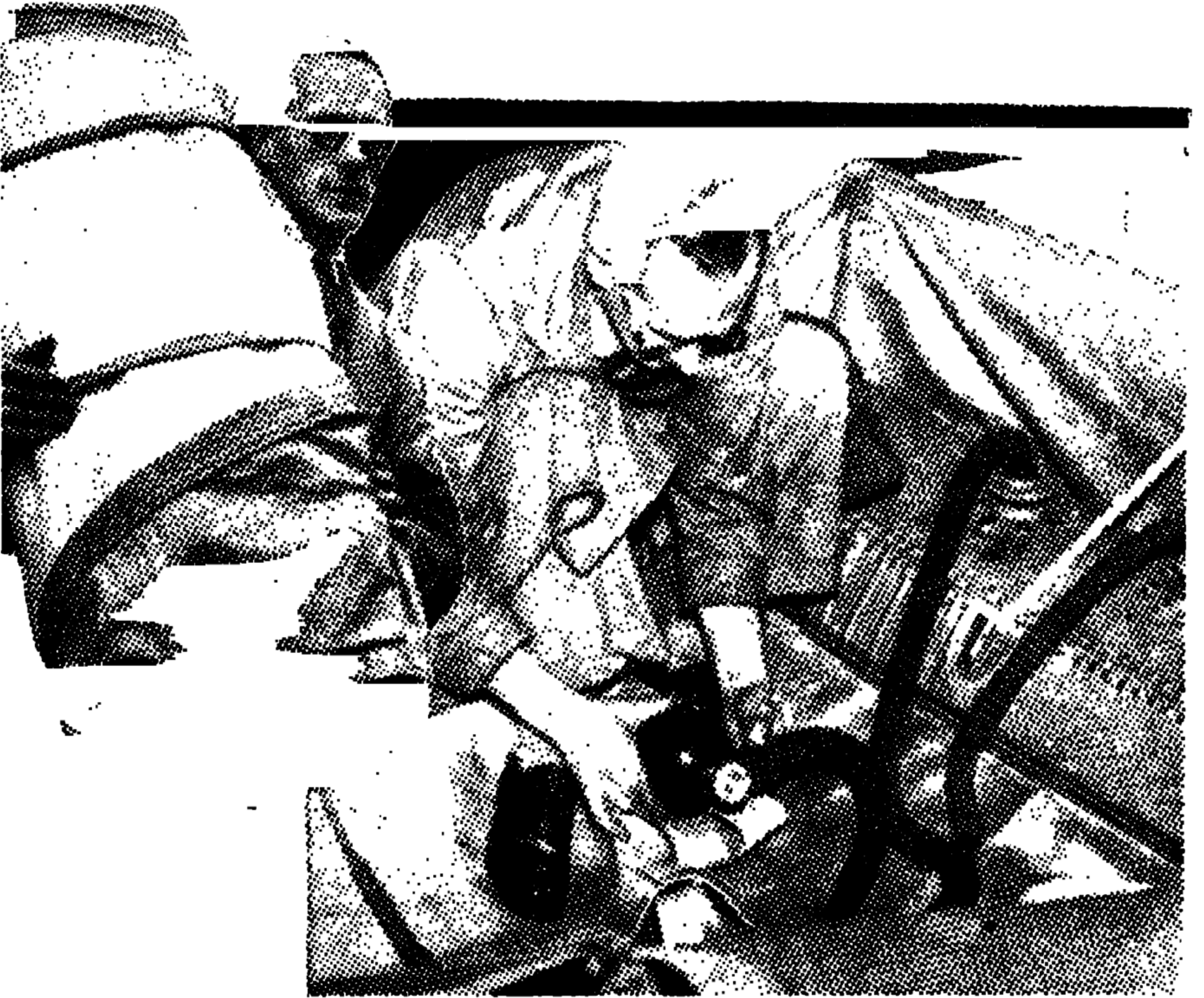
ষোল শত ফুট উর্দ্ধ হইতে এইভাবে ফটো তোলা হইয়াছে। এই আলোক-বোমা আবিষ্কৃত হওয়ায় সহর নিষ্প্রদীপ করিয়া বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কতখানি সম্ভব, সত্যই আজ তাহা প্রশ্নের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অকূলে জীবন-তরী

বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জীবননাশের জন্য যেমনই নিত্য নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, তেমনই মৃত্যুর হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্যও কতরকম অভিনব ব্যবস্থাই না দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের সময় অকূল পাথারে জীবনরক্ষার এইরূপ একটি অভিনব ব্যবস্থার কথাই এখানে বলিব।

সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার কালে কোনও বিমান যদি বিপন্ন হয়, তবে তাহার আরোহীরা যে কি বিষম বিপদে পড়ে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মনে করুন, আকাশ হইতে একখানি বিপন্ন বিমান সাগরবক্ষে আসিয়া পড়িল। শত্রুপক্ষের গুলীতে জখম হইয়া বিমানখানির এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ডুবিতে আর বেশী বাকি নাই। ধারে কাছে কেহ নাই বৈমানিকদিগকে আসিয়া রক্ষা করে। সেই অবস্থায় ডুবিয়া মরা ছাড়া আর তাহাদের গতি কি?

গতি একটা আছে। সেই বিপদসায়রেও তাহাদের জীবনরক্ষার একটা পন্থা বৈজ্ঞানিকগণ বাতলাইয়া দিয়াছেন। এক প্রকার রবার-নির্ম্মিত জীবন-তরী সাহায্যে সেই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। য়ুরোপে বর্ত্তমান



বিছানার মত গুটান রবারের ডিঙ্গিখানিকে ঘন চাপের বায়ুতে ফাঁপাইয়া তোলা হইতেছে

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই জীবন-তরীর সাহায্যে অনেকের জীবনরক্ষার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এই নূতন ধরনের জীবন-তরীর প্রথম আবিষ্কার হয় বৃটেনে। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর যেসকল বিমান সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করে সেগুলির প্রত্যেকটিতেই এইরূপ জীবন-তরী রাখা হয়। আজকাল বৃটেনের

দেখাদেখি অন্যান্য দেশও তাহাদের বিমানগুলিতে এই অভিনব জীবন-তরী আমদানী করিয়াছে।

গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় এই রবারনির্ম্মিত জীবন-তরী সমুদ্রবক্ষে ভাসাইবার এবং উহাতে আরোহণ করিবার ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।



ভাসান জীবন-তরীতে দুইজন সৈনিক

বড় বড় বিমানে এত বড় এক একটি জীবন-তরী রাখা হয় যাহাতে বারজন লোক পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারে। কোন কোন জীবন-তরীতে পাল খাটাইবারও ব্যবস্থা আছে, দাঁড় টানিবার ব্যবস্থা তো আছেই। পূর্ব্বে রবারের জীবন-তরীগুলির আকৃতি ছিল গোল। আজকাল ত্রিভুজাকৃতির জীবন-তরীই ব্যবহৃত হয় বেশী। ত্রিভুজাকৃতির জীবন-তরীগুলিকে 'ডি টাইপের' জীবন-তরী

বলা হয়। এগুলির পশ্চাৎ দিক ছয় ফুট পাশ। পশ্চাৎ দিকেই থাকে আরোহীদের বসিবার আসন। বসিবার আসনের পশ্চাতে একটি মোটা পর্দ্দা খাটান থাকে। তরীগুলি ভাঁজ করিয়া দিব্যি গুটাইয়া রাখা যায়; দেখিয়া মনে হয় যেন একটি বিছানা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। আবার প্রয়োজন হইলেই অনায়াসে সমুদ্রে ভাসান চলে। এইগুলির ওজন আধ মণ ত্রিশ সেরের বেশী হয় না। বিমানে করিয়া নিতে হয় বলিয়া এইগুলিকে যথাসম্ভব হালকা করা হয়।

এই অভিনব জীবন-তরী সমুদ্রে ভাসাইবার কৌশলটিও বড় চমৎকার। একটি পাত্রে ঘনীভূত বায়ু রাখা হয়। জীবন-তরী সমুদ্রে ভাসাইবার প্রয়োজন হইলেই উহাতে সংলগ্ন নলের সাহায্যে ঘনীভূত বায়ুর পাত্র হইতে উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করান হয়। বায়ু প্রবেশ করিলেই জীবন-তরীখানি ফাঁপিয়া ওঠে। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডে ২০ কিউবিক ফুট ঘনীভূত বায়ুতে এই জীবন-তরীর অভ্যন্তর পূর্ণ হইয়া যায়। একজনেই কাঁধে করিয়া এই জীবন-তরী বিমানে চাপাইতে পারে এবং একজনেই বায়ুতে পূর্ণ করিয়া ইহা জলে ভাসাইতে পারে।

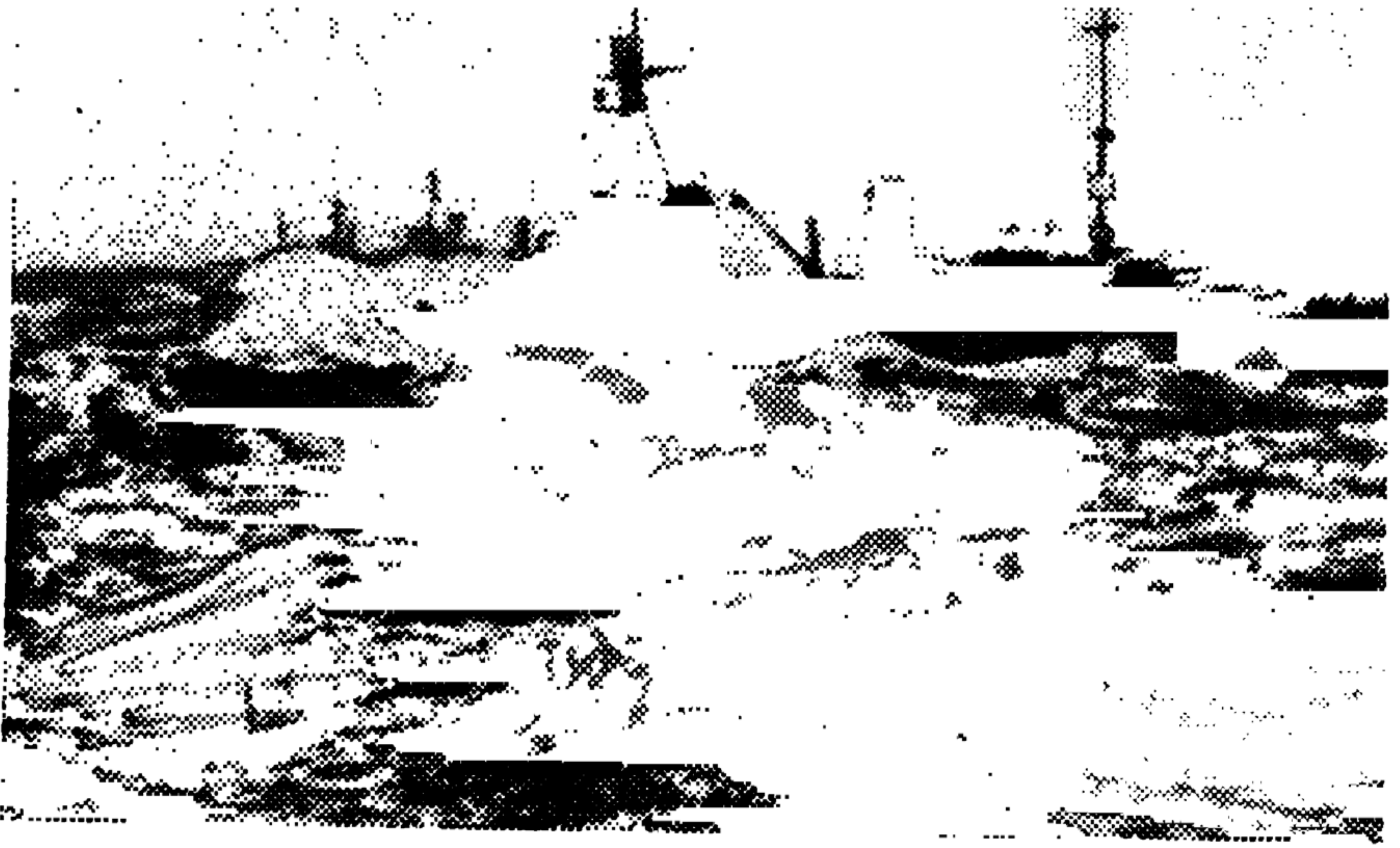
আকাশ হইতে জখম হইয়া কোন বিমান সমুদ্রবক্ষে পড়িলে উহার সলিলসমাধি ঘটিতে যত অল্প সময়ই লাগুক না কেন, বিপন্ন বিমান হইতে সমুদ্রবক্ষে এই জীবন-তরী ভাসাইয়া তাহাতে আরোহণ করিবার পক্ষে ততটুকু সময়ই যথেষ্ট। এইরূপ জীবন-তরীতে ভাসিয়া লোক তিন দিন পর নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছে এমনও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সত্যই যুদ্ধে ইহা মানুষকে খানিকটা অকূলে কূল দিয়াছে।

জলযুদ্ধ

জলযুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে বিভিন্ন শ্রেণীর রণতরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর অবশ্য মালজাহাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার জাহাজেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল জাহাজকেই আর যুদ্ধজাহাজ বলা যায় না। ঠিক যুদ্ধ করিবার জন্যই যে-সকল জাহাজ প্রস্তুত হয় সেগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার এবং ক্যাপিট্যাল ব্যাটল্‌শিপ বা অতিকায় রণতরী। এতদ্ব্যতীত রসদবাহী, তেলবাহী এবং বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতিও যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়, তবে সেগুলিকে যুদ্ধ জাহাজ বলা হয় না—কেবল যোগান দেওয়াই ঐগুলির কাজ। উপরে যে-সকল জাহাজের কথা বলিলাম সেগুলি সবই সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া চলে। এছাড়া আর এক শ্রেণীর জাহাজ আছে সাবমেরিণ বা ডুবো-জাহাজ। এই চোরা জাহাজের কথা আর কে না শুনিয়াছেন।

প্রথমে ক্রুজার সম্বন্ধেই বলি। ক্রুজারের সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্যে: সমুদ্রে বাণিজ্যজাহাজ চলাচলের পথ পাহারা দেওয়া এবং নৌবহরের অগ্রে থাকিয়া শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্বন্ধে খবরদারী করা। ক্রুজারগুলি খুব দ্রুতগতিতে চলে। একমাত্র ডেষ্ট্রয়ার ছাড়া সমুদ্রবক্ষে আর কোন জাহাজ এইগুলিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ক্রুজারের আকৃতি খুব বড় নয়। সাধারণতঃ বড় ক্রুজারগুলি আট দশ হাজার টনের অধিক হয় না। জাপানে

২৭ হাজার টনী ক্রুজার পর্য্যন্ত আছে; নামে ক্রুজার হইলেও ঐগুলি অতি-কায় রণতরীরই সামিল। বেশী ওজন হইলেই গতি হ্রাস হয়; এইজন্যই



বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরে ক্রুজার

দুর্ভেদ্য করিবার জন্য ক্রুজারগুলিতে খুব বেশী পুরু লোহার পাত লাগান হয় না বা অধিক ওজনের বড় কামান রাখা চলে না। বেশীর ভাগ ক্রুজারেই নয় ইঞ্চি মুখের চাইতে বড় কামান থাকে না। কোন কোন ক্রুজারে অবশ্য বার চৌদ্দ ইঞ্চি মুখের কামানও থাকে, তবে সেগুলির সংখ্যা খুবই কম।

বৃটেনের খানকয়েক ব্যাটল্‌-ক্রুজার আছে। সেইগুলিকে ক্রুজার না বলিয়া ব্যাটল্‌শিপই বলা যাইতে পারে। ব্যাটল্‌শিপের সঙ্গে সেইগুলির এইমাত্র পার্থক্য যে, ব্যাটল্‌শিপ অপেক্ষা হাল্কা বর্ম্মাবৃত হওয়ায় ব্যাটল্‌-ক্রুজারগুলির গতি সামান্য কিছু বেশী। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, ব্যাটল্‌ক্রুজারের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। বর্ম্ম অপেক্ষাকৃত হাল্কা

হওয়ায় ঐগুলি প্রতিপক্ষের আক্রমণে ঘায়েল হয় সহজে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে য়ুরোপীয় দরিয়ায় জার্ম্মান ব্যাটল্‌শিপ বিসমার্কের আক্রমণে নিমজ্জিত জগতের বৃহত্তম রণতরী 'হুড' ছিল ব্যাটল্‌-ক্রুজার শ্রেণীর জাহাজ। এছাড়া জাপানের সঙ্গে যুদ্ধেও শ্যাম উপসাগরে বৃটেন 'রিপাল্‌স্‌' নামে আর একখানি ব্যাটল্‌-ক্রুজার হারাইয়াছে। বর্ত্তমানে কেহ আর ব্যাটল্‌-ক্রুজার নির্ম্মাণ করাইতেছে না।

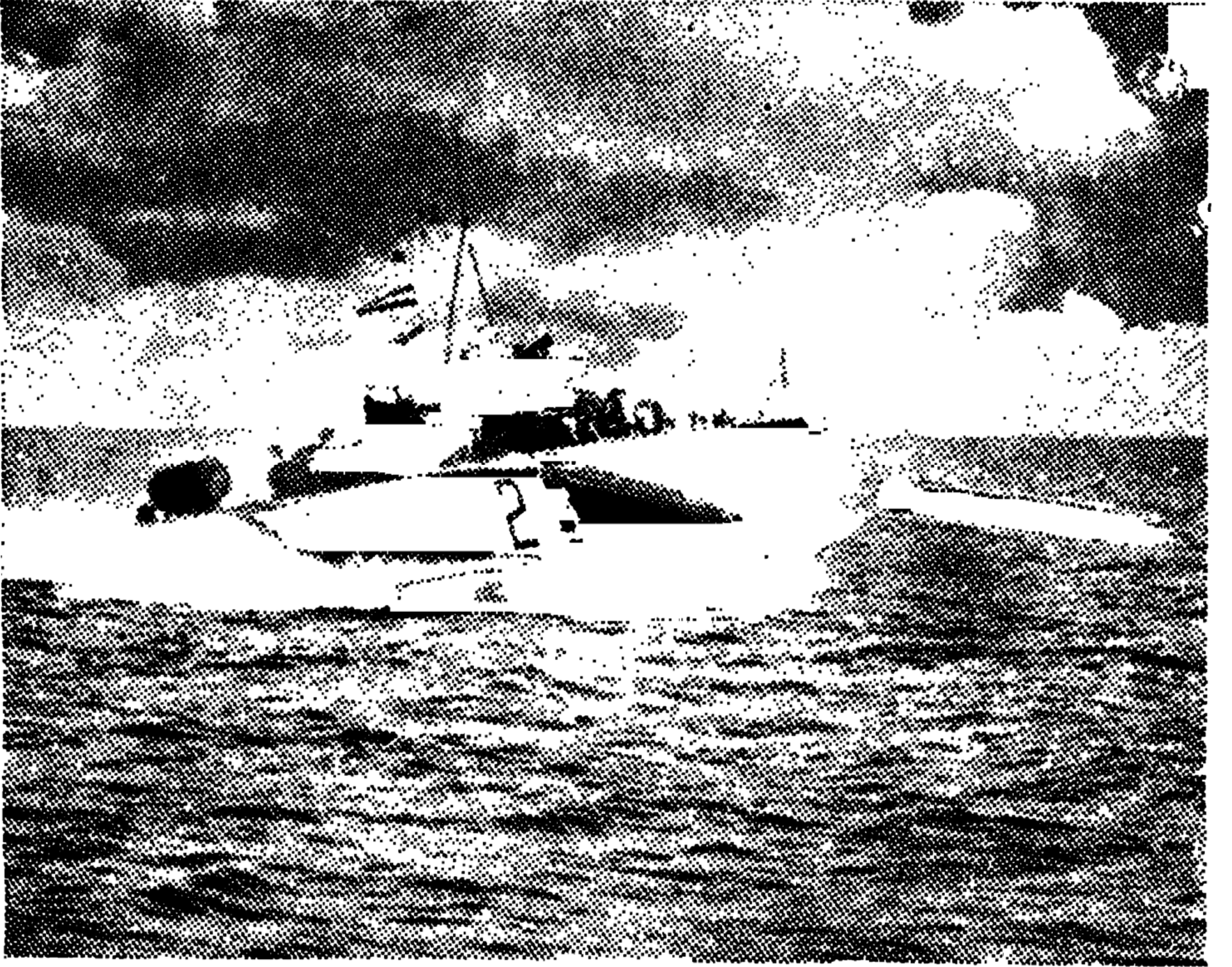
ডেষ্ট্রয়ার

ক্রুজারের পরই আসে ডেষ্ট্রয়ারের কথা। ডেষ্ট্রয়ারের আকৃতি খুবই ছোট। যুদ্ধজাহাজের মধ্যে ঐগুলিই হইল সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। ছোট ডেষ্ট্রয়ারগুলি একহাজার দেড়হাজার টনী এবং বড়গুলি দেড়হাজার দুইহাজার টনী। ছোট ডেষ্ট্রয়ারগুলিতে চার ইঞ্চি সাড়ে চার ইঞ্চি মুখের চাইতে বড় কামান রাখা হয় না; তবে টর্পেডো ছুঁড়িবার ভালরকম ব্যবস্থাই ঐগুলিতে থাকে। বড় ডেষ্ট্রয়ারগুলিতে অপেক্ষাকৃত বড় কামান রাখা হয়।

টর্পেডো-বোটকে জব্দ করিবার জন্যই সৃষ্টি হয় ডেষ্ট্রয়ারের। আজকাল যেমন ডুবো-জাহাজের ভয়ে সমুদ্রবক্ষে সকলে সন্ত্রস্ত; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে টর্পেডো-বোটের ভয়ে সকলে তেমনই ছিল থরহরি কম্পমান। টর্পেডো-বোটের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্যই আবির্ভাব হইল দ্রুতগামী ডেষ্ট্রয়ারের। যখন দেখা গেল ছোট ছোট টর্পেডো-বোটগুলি ডেষ্ট্রয়ারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তখন টর্পেডো-বোট ছাড়িয়া বিভিন্ন দেশের নৌবিভাগ ডেষ্ট্রয়ারের দিকে নজর দিল। ধীরে ধীরে সাবেক দিনের ছোট টর্পেডো-বোটগুলি লোপ পাইল এবং সেগুলির স্থান আসিয়া দখল করিল ডেষ্ট্রয়ার। অবশ্য আধুনিক মোটর টর্পেডো-বোটগুলির কথা স্বতন্ত্র। এইগুলি ডেষ্ট্রয়ার অপেক্ষাও ঢের বেশী দ্রুতগামী এবং সেই জন্যই

ডেষ্ট্রয়ার থাকা সত্ত্বেও এইগুলির প্রয়োজন যথেষ্টই রহিয়াছে। সাবেক দিনের টর্পেডো-বোটের সঙ্গে আধুনিক টর্পেডো-বোটের কোন তুলনাই হয় না।

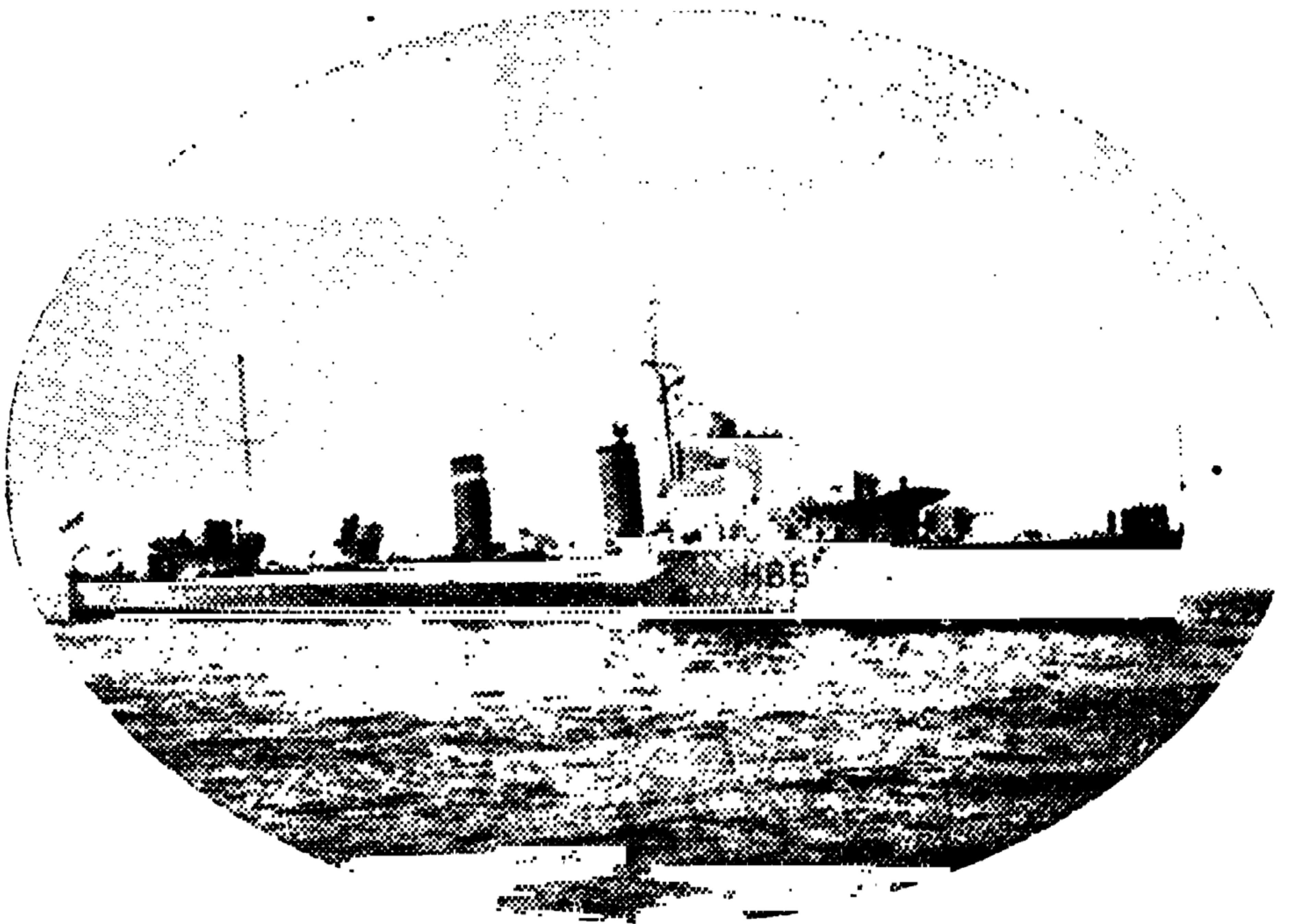
কেবল টর্পেডো ছুঁড়িবার জন্যই যে ডেষ্ট্রয়ারের প্রয়োজন এমন নয়; নৌবহরে ঐগুলি আরও অনেক প্রয়োজনে আসে। কোনও বড় রকম



আধুনিক মোটর-টর্পেডো-বোট হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডো

নৌযুদ্ধে যখন অতিকায় যুদ্ধজাহাজগুলি হইতে গোলাগুলী ছুটিতে থাকে এবং ধূমজালে যখন চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া ওঠে, তখন ডেষ্ট্রয়ারগুলি তাহার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া দিব্যি অনায়াসে গিয়া শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাইতে পারে। ডেষ্ট্রয়ারের যে অংশ জলের উপর ভাসানো থাকে তাহা ঢাকিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না। কৃত্রিম উপায়ে সমুদ্রবক্ষে ধূমজাল

সৃষ্টি করিয়া অতি সহজেই তাহা গোপন করা চলে। বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলির এই সুবিধা নাই। একপক্ষের ডেষ্ট্রয়ার টর্পেডো ছুঁড়িবার জন্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অপর পক্ষের ডেষ্ট্রয়ার গিয়া উহাকে আক্রমণ করে। এতদ্ব্যতীত ধূমজাল বিস্তার করিয়া ডেষ্ট্রয়ারগুলি স্বপক্ষের জাহাজগুলিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারে যাহাতে বিপক্ষের ডুবো-জাহাজ বা



ডেষ্ট্রয়ার

বিমান হইতে সেগুলি আর দৃষ্টিগোচর না হয়। শত্রুপক্ষের চক্ষে ধূলি দিতে হইলে নৌবহরের সঙ্গে ডেষ্ট্রয়ার থাকা একান্ত আবশ্যক।

ডেষ্ট্রয়ারে মাল বেশী ধরে না। কাজেই টর্পেডো বেশী রাখা হইবে—না কামানই বেশী রাখা হইবে, ইহা লইয়া বেশ কিছুকাল প্রবল মতদ্বৈধ চলে। পরে ডেষ্ট্রয়ারের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হয়।

আধুনিক ডেষ্ট্রয়ারগুলিতে আক্রমণের জন্য টর্পেডো ছুঁড়িবার যেমনই প্রচুর ব্যবস্থা থাকে, তেমনই বিপক্ষের ডেষ্ট্রয়ার হইতে আক্রমণ হইলে পাল্টা জবাব দিবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী কামানও রাখা হয়। আবার মাইন পাতিবার জন্যও বিশেষ এক শ্রেণীর ডেষ্ট্রয়ার আছে। অন্ধকারে বা কুয়াশায় গা-ঢাকা দিয়া চুপে চুপে গিয়া এই শ্রেণীর ডেষ্ট্রয়ারগুলি মাইন পাতিয়া আসে। এ ছাড়া ডুবো-জাহাজকে ঘায়েল করিবার জন্য যে 'ডেপ্‌থ্‌ চার্জ্জ' বা জলবোমা ফাটান হয়, তাহাও নিক্ষেপ করা হয় ডেষ্ট্রয়ারগুলি হইতে। কাজেই আধুনিক জলযুদ্ধে ডুবো-জাহাজকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যও ডেষ্ট্রয়ার-গুলির প্রয়োজন খুবই বেশী। তাছাড়া সমুদ্রে মাইন কুড়াইবার কাজেও ডেষ্ট্রয়ারের প্রয়োজন হয়।

ব্যাটল্‌শিপ

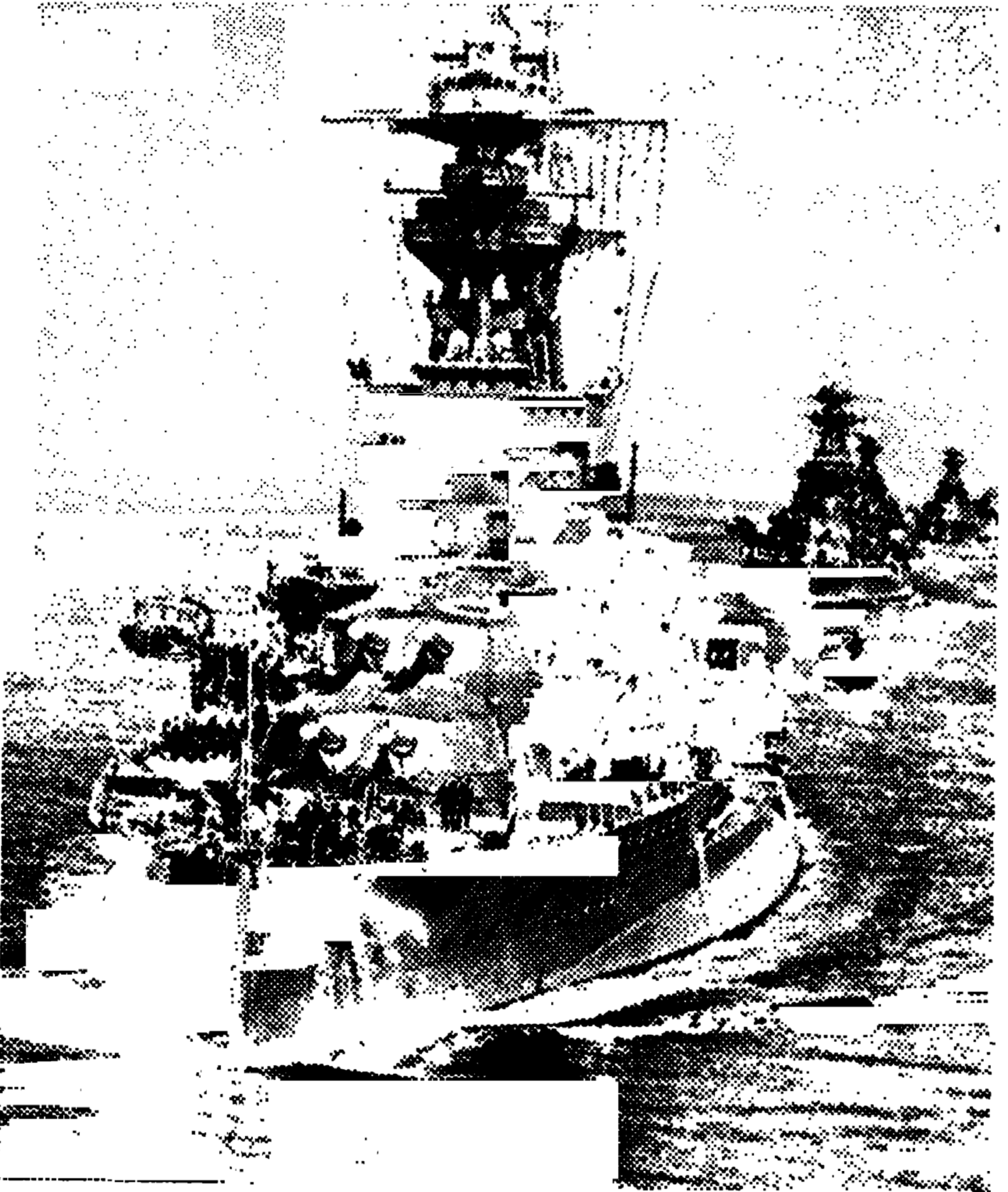
এইবার ব্যাটল্‌শিপ বা অতিকায় রণতরীর কথা বলা যাক। ব্যাটল্‌শিপগুলি নির্ম্মাণের সময় দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। জাহাজের আয়তনের অনুপাতে কত বড় কামান রাখা যায় এবং কি পরিমাণ লৌহবর্ম্মের দ্বারা জাহাজখানিকে সুরক্ষিত করা চলে—ইহাই হইল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। খুব বেশী বড় কামান রাখিতে গেলে লৌহবর্ম্মের স্থূলত্ব হ্রাস করিতে হয়; তাহা না হইলে জাহাজের উপর গুরুভার পড়ে। পক্ষান্তরে লৌহবর্ম্মের দ্বারা জাহাজকে অত্যধিক সুরক্ষিত করিতে গেলে কামানের কলেবর হ্রাস করিতে হয়। এই জন্যই আধুনিক ব্যাটল্‌শিপ নির্ম্মাণ-ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত।

গত মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধজাহাজের আয়তন যখন কেবলই বাড়তির দিকে যাইতে থাকে, তখন আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে এক নৌসম্মেলনে স্থির হয়—কোনও দেশ ৩৫ হাজার টনের অধিক বড় যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য ঐ চুক্তি হয়।

উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বৃটেনও ছিল অন্যতম। বৃটেনের তখন 'হুড' নামে একখানি ৪২ হাজার টনী যুদ্ধজাহাজ ছিল। (পূর্ব্বে উহার কথা বলিয়াছি।) উহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩২ নট অর্থাৎ ৩৬ মাইল। এতদপেক্ষা বড় জাহাজ নির্ম্মাণের ইচ্ছাও বৃটেনের ছিল; কিন্তু ওয়াশিংটন চুক্তি হইবার পর বৃটেন সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করে। একদিকে ওয়াশিংটন চুক্তি হয় এবং অপর দিকে কেহ কেহ তলে তলে জাহাজের আয়তন বৃদ্ধি করে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জাপান 'সাকাকু' নামে যে যুদ্ধজাহাজখানি জলে ভাসায় তাহা ৪০ হাজার টনী। আমেরিকাও তখন ৪৫ হাজার টনী যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের মতলব আঁটে। সেই যুদ্ধ-জাহাজে থাকিবে ১৮ ইঞ্চি মুখের কামান এবং সেই কামান দাগিলে এক একটি গোলা গিয়া পড়িবে ২৪ মাইল দূরে। এক একখানি জাহাজ প্রস্তুত করিতে খরচ পড়িবে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে 'নেলসন' এবং রোডনী' নামে যে দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত হয় তাহার এক একখানি ৩৩ হাজার ৯ শত টনী। ইহার এক একটি জাহাজে বসান হয় ১৬ ইঞ্চি মুখের ৯টি করিয়া কামান। কামানগুলি হইতে ছোটে আড়াই হাজার পাউণ্ড ওজনের এক একটি গোলা এবং সেই গোলা গিয়া পড়ে ১৮ মাইল দূরে। কিন্তু উহার পর 'জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্'; 'প্রিন্স-অব-ওয়েলস্' (নিমজ্জিত); 'ডিউক-অব-ইয়র্ক'; 'জেলিকো'; 'বীটি'; 'হাউ' প্রভৃতি যে কয়খানি ৩৫ হাজার টনী জাহাজ প্রস্তুত হয় ঐগুলিতে স্থাপন করা হইয়াছে ১৪ ইঞ্চি মুখের ১০টি করিয়া কামান; সেগুলির এক একটি গোলার ওজন ২ হাজার পাউণ্ড এবং গোলাগুলি যায় প্রায় ১২ মাইল। বৃটেন ৩৫ হাজার টনী যুদ্ধজাহাজে কামানের কলেবর হ্রাস করিলেও আমেরিকা এবং জাপান কিন্তু তাহা করে নাই। আমেরিকার 'ওয়াশিংটন' এবং জাপানের 'মাৎসুস' এই দুইখানি যুদ্ধজাহাজই ৩· হাজার টনী; কিন্তু দুইখানি জাহাজেই বসান হইয়াছে ১৬ ইঞ্চি মুখের কামান। একই

আয়তনের যুদ্ধজাহাজে ফ্রান্স এবং ইতালী বসাইয়াছে ১৫ ইঞ্চি মুখের কামান এবং জার্ম্মানীও সর্ব্বশেষে যে দুইখানি অতিকায় যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করে



ব্যাটল্‌শিপ

তাহাতে ফ্রান্স এবং ইতালীরই পন্থা অনুসরণ করা হয়। এখন কথা হইল,

একই আয়তনের যুদ্ধজাহাজের কোনটিতে বড় কামান এবং কোনটিতে ছোট কামান রাখা হয় কেন?

কোন কোন নৌবিশারদ মনে করেন, ১৬ ইঞ্চি মুখের ৯টী কাম্যানের চাইতে ১৪ ইঞ্চি মুখের ১০টি কামানই অধিকতর কার্যাকরী; কম সংখ্যক বড় গোলার চাইতে অধিক সংখ্যক ছোট গোলা ছুঁড়িয়া শত্রুপক্ষের অনিষ্ট করা যায় বেশী। তবে ছোট কামানের পাল্লার মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখনই সেই কথা খাটে। তাহা না হইলে দূর হইতে যুদ্ধ করিতে বড় কামান সাহায্যেই সুবিধা। জাহাজে কামান রাখাই যদি একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইত তবে সকলেই যত বড় সম্ভব কামান রাখিত। কিন্তু তাহা তো নয়; যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আরও অনেকগুলি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়। আজকাল যেমন সব মারাত্মক কামানের গোলা এবং বোমা প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলি হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধজাহাজগুলিকে অতি পুরু লৌহ আবরণে আচ্ছাদিত করিতে হয়। ব্যাটল্‌শিপের দুই পার্শ্বে যে মোটা লৌহপাত থাকে তাহা ১৪ হইতে ১৬ ইঞ্চি পুরু। আর জাহাজের উপর দিকটাও তদনুপাতেই পুরু করিতে হয়। জাহাজের যে-অংশ জলে নিমজ্জিত থাকে তাহাও মাইন এবং টর্পেডোর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য করিতে হয়। 'হাউ' নামে বৃটেনের যে ৩৫ হাজার টনী ব্যাটল্‌শিপখানি আছে তাহার লৌহবর্ম্মের ওজনই হইল ১৪ হাজার টন অর্থাৎ জাহাজকে বর্ম্মাচ্ছাদিত করিতেই গিয়াছে শতকরা ৪০ ভাগ।

যুদ্ধজাহাজের লৌহবর্ম্মই যে বড় কামান রাখার একমাত্র অন্তরায় এমন নয়। যুদ্ধজাহাজগুলিকে দ্রুতগামী করিতে হইলে খুব শক্তিশালী ভারী এঞ্জিন বসাইতে হয়। তাহাতেও জাহাজ কম বোঝাই হয় না। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধজাহাজকে সমুদ্রবক্ষে বহু দূর বিচরণ করিতে হইলে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানিও লইয়া যাইতে হয়। আবার বন্দর ছাড়িয়া দীর্ঘকাল

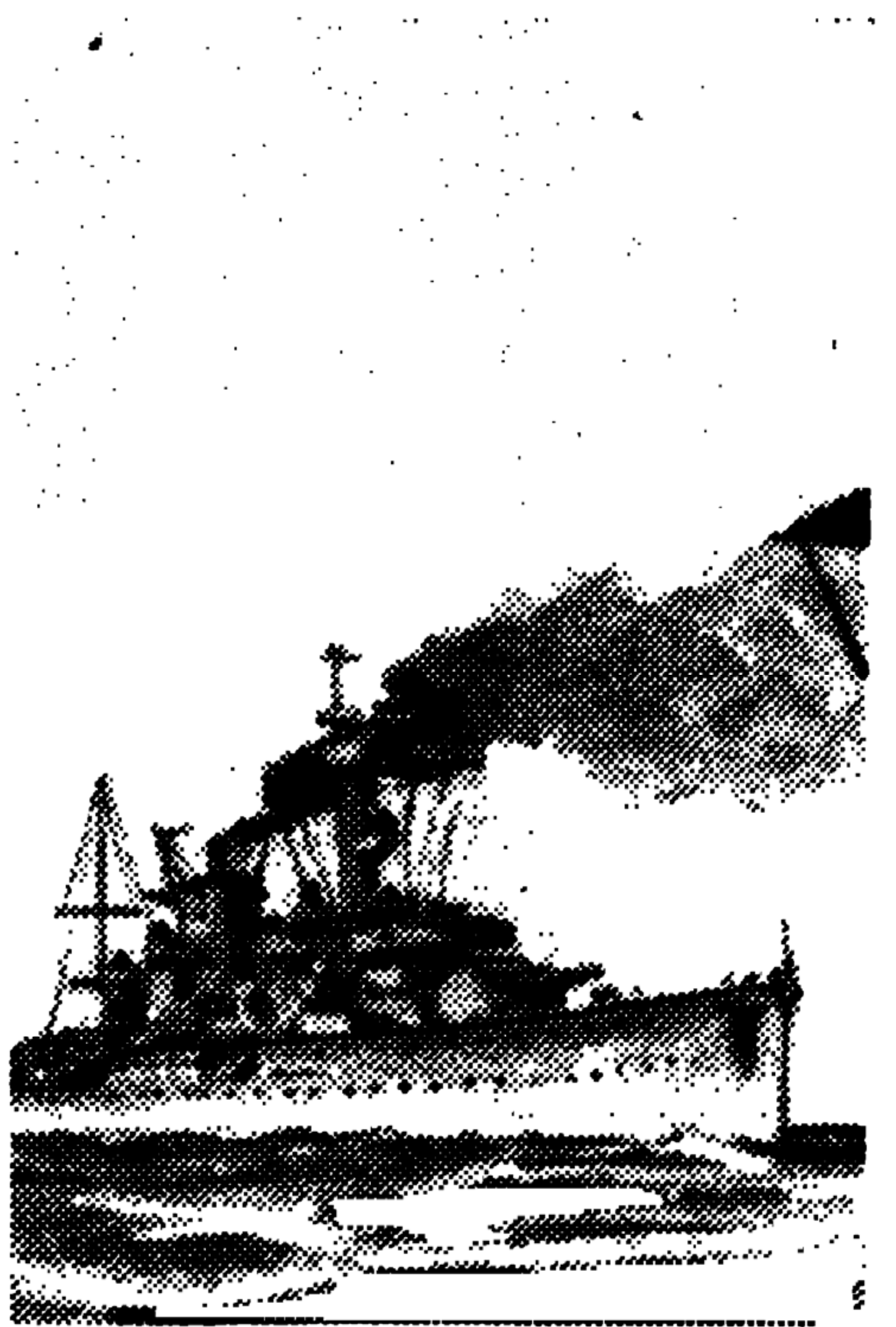
সমুদ্রবক্ষে থাকিতে হইলে নাবিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং তজ্জন্য নানারূপ সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহাতেও কম যায়গা জোড়ে না এবং জাহাজ কম বোঝাই হয় না।

কাজেই দেখা যায়, যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের সময় মারণাস্ত্র, বর্ম্ম, গতিবেগ, পাল্লা এবং নাবিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা—এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। জাহাজের আয়তন যেখানে বাঁধিয়া দেওয়া হয়,—যেমন ওয়াশিংটন চুক্তিতে স্থির হইয়াছিল কেহ ৩৫ হাজার টনের চাইতে বড় যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিতে পারিবে না—সেখানে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের একটি বাড়াইতে গেলে অপরটিকে কমাইতে হয়। কাজেই বড় যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ লইয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমস্যা রহিয়াছে; এক এক দেশের- জন্য প্রয়োজন এক এক রকম। এই জন্যই কোন দেশের যুদ্ধজাহাজে লৌহবর্ম্ম হ্রাস করিয়া বড় কামান রাখা হয়; আবার কোন দেশে কামান ছোট করিয়া লৌহবর্ম্মের দ্বারা জাহাজকে অধিকতর সুরক্ষিত করা হয়। বৃটেনের আধুনিক ব্যাটল্‌শিপগুলিতে গতি বৃদ্ধির জন্য অতি শক্তিশালী ও ভারী ওজনের এঞ্জিন বসান হইয়াছে এবং লৌহবর্ম্মের দ্বারা অধিকতর সুরক্ষিত করা হইয়াছে; কাজেই সকল দিকে সাম্য বিধানের জন্য কামানগুলিকে ১৬ ইঞ্চি হইতে কমাইয়া ১৪ ইঞ্চি মুখের করিতে হইয়াছে।

ব্যাটল্‌শিপের ন্যায় ক্রুজার নির্ম্মাণেও উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয়। বার বৎসর পূর্ব্বে বৃটেনে 'কেণ্ট' শ্রেণীর যে পাঁচখানি ক্রুজার প্রস্তুত হয় তাহাতে আছে ৮ ইঞ্চি মুখের ৮টি কামান। উক্ত কামানের গোলার এক একটির ওজন ২৫৬ পাউণ্ড, অর্থাৎ একসঙ্গে ৮টী কামান দাগিলে একবারে বাহির হয় ২০৪৮ পাউণ্ড ওজনের গোলা। কিন্তু সম্প্রতি বৃটেনে 'এডিনবরা' এবং 'বেলফাষ্ট' শ্রেণীর যে দশখানি নূতন দশহাজার টনী ক্রুজার নির্ম্মিত হইয়াছে সেগুলির এক একখানিতে বসান হইয়াছে ৬ ইঞ্চি মুখের ১২টি করিয়া কামান। উক্ত কামানের গোলার এক একটির ওজন ১০০

পাউণ্ড, অর্থাৎ এক সঙ্গে কামানগুলি দাগিলে একবারে বর্ষিত হয় ১২০০ পাউণ্ড ওজনের গোলা। ৮ ইঞ্চি মুখের কামানের ওজন ১৬২ টন এবং ৬ ইঞ্চি মুখের কামানের ওজন মাত্র ৭২ টন। কাজেই ৮ ইঞ্চি মুখের কামান বসাইতে যে ভারী লোহার কাঠামো দরকার, ৬ ইঞ্চি মুখের কামান বসাইতে তাহা দরকার হয় না—অনেক কমেই হয়। এই জন্যই কামানের আকার কমাইয়া সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে।

জার্ম্মানীর ক্ষুদে ব্যাটল্‌শিপ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এই প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ঐগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন ধরণের যুদ্ধজাহাজ। গত মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধিতে সর্ত্ত থাকে যে, যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণে জার্ম্মানী দশহাজার টনের উর্দ্ধে যাইতে পারিবে না। জার্ম্মানী তখন চেষ্টা করিতে থাকে, সন্ধির সর্ত্ত লঙ্ঘন না করিয়াও কিভাবে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করা যায়। অবশেষে সে দশহাজার টনের মধ্যে থাকিয়াই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের তিনখানি ব্যাটল্‌শিপ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই 'ডয়চলাণ্ড'; 'শের' ও 'গ্রাফ স্পী' নামে তিনখানি ক্ষুদে ব্যাটল্‌শিপ প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার কিছুদিন



জার্ম্মানীর ক্ষুদে ব্যাটল্‌শিপ

পর দক্ষিণ আটলান্টিকে 'গ্রাফ স্পী' বৃটিশ ক্রুজারের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্মনিমজ্জনে বাধ্য হয়।

জার্ম্মানীর ক্ষুদে ব্যাটল্‌শিপের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার খোলের লৌহপাতগুলি পিটাইয়া মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, রিবিট মারা হয় নাই। সম-আয়তনের যত যুদ্ধজাহাজ আছে সেগুলির তুলনায় এই ক্ষুদে ব্যাটল্‌শিপের ওজন ৫৫০ টন কম এবং এত বড় যুদ্ধজাহাজে 'ডিজেল এঞ্জিনও' এইগুলিতেই প্রথম বসান হয়। ফলে এইগুলি ঘণ্টায় ২৬ নট যাইতে পারে এবং একবারে দশহাজার মাইল বিচরণ করিতে এইগুলির কোন অসুবিধাই হয় না। তেলচালিত 'ডিজেল এঞ্জিন' থাকায় আরও সুবিধা হইয়াছে এই যে, জাহাজ থামিলেই সঙ্গে সঙ্গে তেলখরচও বন্ধ হয়; পক্ষান্তরে ষ্টীম-চালিত জাহাজ থামিলেও উহার কয়লাখরচ বন্ধ হয় না—কারণ বয়লারে ষ্টীম রাখিতেই হয়। কাজেই জ্বালানি বস্তু খরচের দিক দিয়াও জার্ম্মানীর ক্ষুদে ব্যাটল্‌শিপে খুবই সুবিধা। তবে গতির দিকে অত্যন্ত নজর দিতে গিয়া জাহাজগুলিকে খুব বেশী দুর্ভেদ্য করা সম্ভব হয় নাই।

ডুবো-জাহাজ

এইবার ডুবো-জাহাজে আসা যাক। ডুবো-জাহাজ সম্বন্ধে জানিবার এত বিষয় আছে যে সংক্ষেপে তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। সমুদ্রগর্ভে এই যন্ত্রদানবের গতিবিধি, আক্রমণ, আত্মরক্ষা, সবই অতি রহস্যময়।

ডুবো-জাহাজগুলি কিভাবে জলের নীচে ডুব দেয় প্রথমে সে সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা মন্দ নয়। প্রত্যেক ডুবো-জাহাজেই কয়েকটি করিয়া ট্যাঙ্ক বা জলাধার থাকে। ঐ ট্যাঙ্কগুলি জলে ভরিলেই জাহাজ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া আত্মগোপন করিতে পারে। কি কৌশলে ট্যাঙ্কগুলি জলে পূর্ণ করা হয় এবং প্রয়োজন মত কিভাবে সেই জল নিকাশ করা হয়, আগে তাহাই বলিব।

জল ভরিবার অথবা জল নিকাশ করিবার জন্য প্রতিটি ট্যাঙ্কেরই নিম্নদেশে একটি করিয়া ভাল্‌ভ্‌ এবং বায়ু-চলাচলের জন্য ট্যাঙ্কের শীর্ষদেশে একটি করিয়া ভাল্‌ভ্‌ থাকে। এতদ্ব্যতীত ট্যাঙ্ক হইতে জল নিকাশের নিমিত্ত ঘনচাপের বায়ু আনিবার জন্য একটি করিয়া নলও যুক্ত থাকে। আবার কতগুলি ট্যাঙ্ক থাকে যেগুলি হইতে পাম্প করিয়াও জল নিকাশ করা যায়।



ঝড়ের মুখে ডুবো-জাহাজ

জলের উপর ভাসিয়া যখন ডুবো-জাহাজ চলে তখন ট্যাঙ্কগুলির নীচের দিক্‌কার ভাল্‌ভ্‌ খোলা এবং উপর দিক্‌কার ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ রাখা হয়। তখন ট্যাঙ্কের মধ্যে খানিকটা জল প্রবেশ করিয়াই থামিয়া যায়, কারণ উপর হইতে বায়ুর চাপ পড়ে। সেই চাপও যদি পর্য্যাপ্ত না হয়, তবে ট্যাঙ্কের মধ্যে খানিকটা ঘনীভূত বায়ু প্রবেশ করাইয়া সমতা রক্ষা করা হয়। আর জাহাজ যখন জলের নীচে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন ট্যাঙ্কসমূহের শীর্ষদেশস্থ

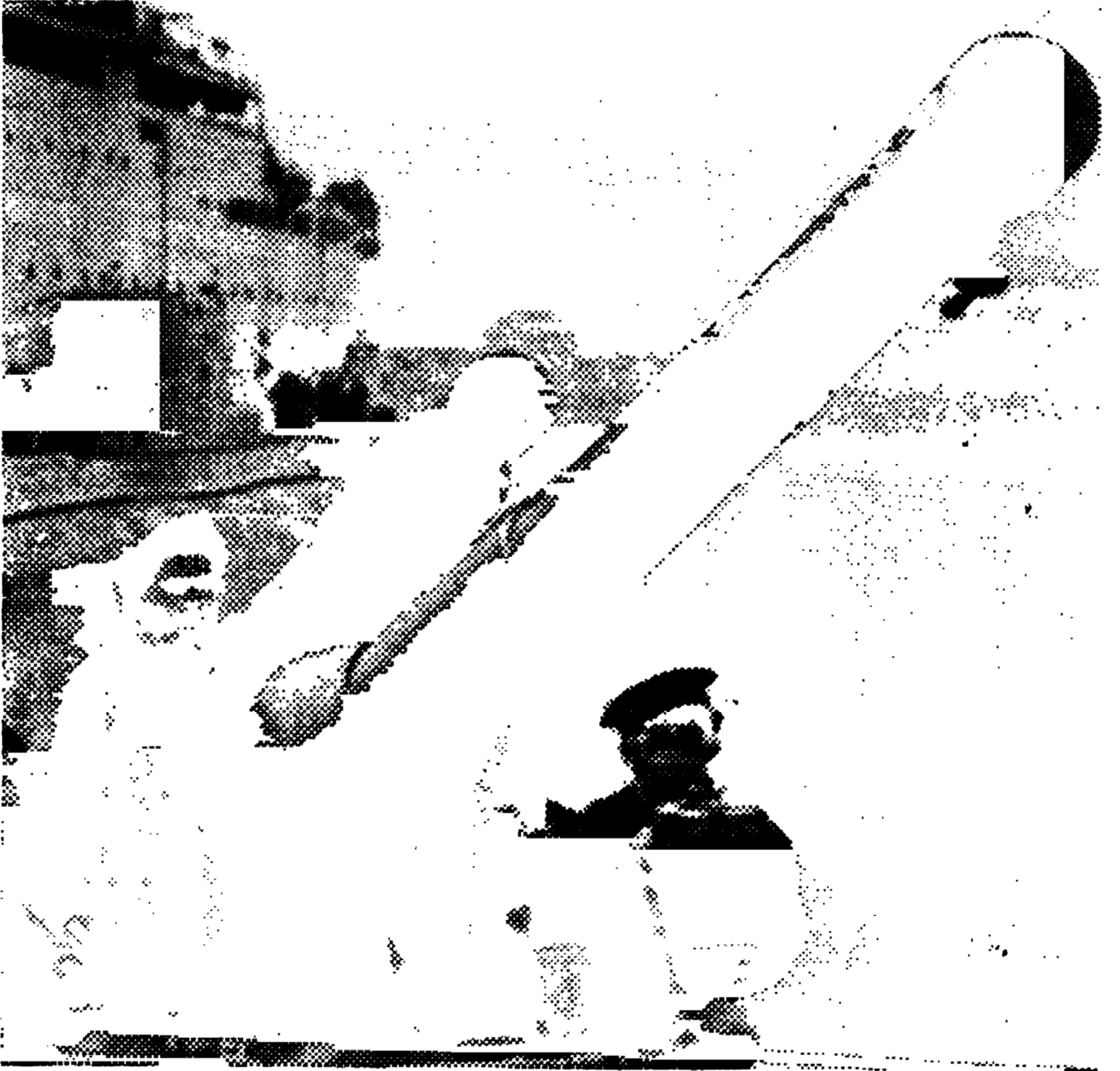
ভাল্‌ভ্‌গুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে ট্যাঙ্কগুলি জলে ভরতি হইয়া যায় এবং ট্যাঙ্কের সবখানি বায়ু উপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। ট্যাঙ্ক জলে ভরতি হইলেই শীর্ষদেশীয় ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় একটি ডুবো-জাহাজের জলের মধ্যে লুকাইতে অন্ততঃ পঁচিশ মিনিট সময় লাগিত ; আর আজকাল দুই-এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না। কাজেই শত্রুপক্ষের দৃষ্টিপথে পড়িতে না পড়িতেই আজকাল ডুবো-জাহাজগুলি জলের মধ্যে ডুব দিয়া আত্মগোপন করিতে পারে। জল ভরিবার এবং জল নিকাশের ভাল্‌ভের সংখ্যা বাড়াইয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

ডুবো-জাহাজ যখন সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া চলে তখন জল ভরিবার ভাল্‌ভ্‌গুলি খুলিয়া রাখা হয় এবং বায়ু নিকাশের ভাল্‌ভ্‌গুলি বন্ধ করিয়া রাখা হয়। তারপর ডুবো-জাহাজকে যখন আবার সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিতে হয় তখন জল নিকাশের জন্য ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে জোর করিয়া ঘনীভূত বায়ু প্রবেশ করাইতে হয়। কণ্ট্রোলঘর হইতে ট্যাঙ্কের শীর্ষদেশীয় ভাল্‌ভ্‌ এবং ব্লোইং ভাল্‌ভ্‌গুলি চালান হয়। বায়ুর চাপে ট্যাঙ্কগুলি হইতে জল বাহির হইয়া গেলেই জাহাজখানি আবার জলের উপর ভাসিয়া ওঠে। শত্রুপক্ষের দৃষ্টি পথে পড়িবামাত্রই যাহাতে তাড়াতাড়ি ডুবিয়া যাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য প্রায়ই ডুবো-জাহাজের প্রধান ট্যাঙ্কগুলি অর্দ্ধেক জলে ভরতি করিয়া রাখা হয়। ট্যাঙ্কগুলি অর্দ্ধেক জলে ভরা থাকিলে ডুবো-জাহাজখানি অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় থাকে ; তিন ভাগে তিন ভাগ এবং ট্যাঙ্কগুলি সম্পূর্ণ খালি থাকিলে জাহাজখানি একেবারে ভাসিয়া ওঠে।

যুদ্ধের সময় ডুবো-জাহাজগুলির প্রধান ট্যাঙ্কসমূহ সর্ব্বদাই এমনভাবে জলে ভরিয়া রাখা হয় যেন একটু হইলেই জলের মধ্যে ডুব দেওয়া চলে। সেই অবস্থায় ডুবো-জাহাজের চালকদিগকে সব দিকে অতিশয় সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কোনও কারণে জাহাজের ওজনের কমবেশ হইলেই জল ভিতরে টানিয়া বা জল-নিকাশ করিয়া সমতা রক্ষা করিতে হয়। এই সমতা রক্ষার

জন্য ডুবো-জাহাজগুলিতে আবার অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক থাকে। প্রধান ট্যাঙ্কগুলির মতই ঐগুলিতে জলনিকাশ ও জল প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। জাহাজের ওজন হ্রাস পায় প্রধানতঃ দুই কারণে—তেল খরচ হইলে এবং মাইন ও



ডুবো-জাহাজের কামান

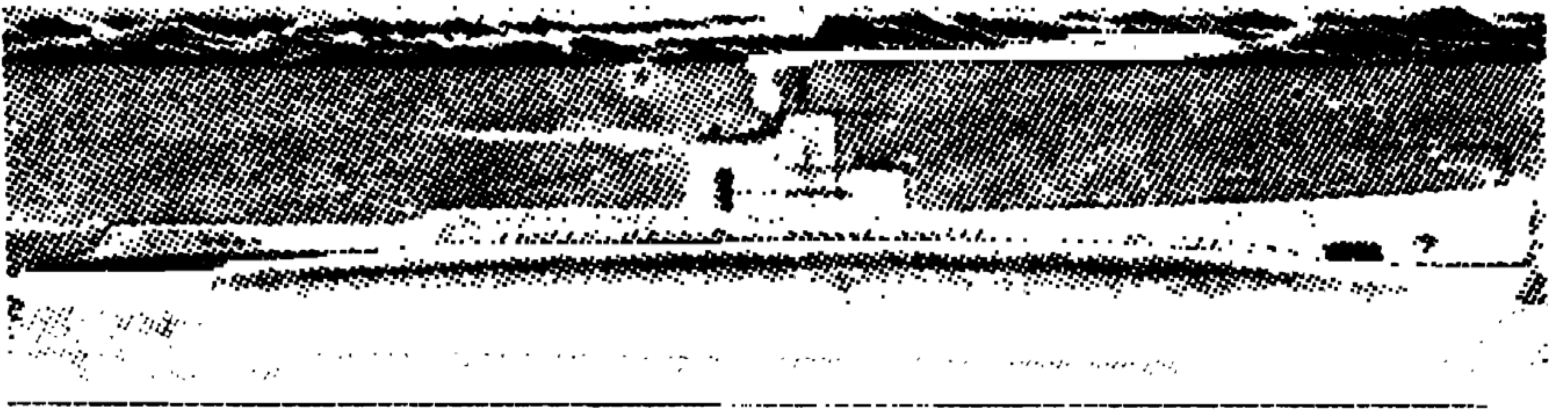
টর্পেডো ছুঁড়িলে। এতদ্ব্যতীত পানীয় জল, খাদ্য প্রভৃতি যতই ফুরাইতে থাকে জাহাজের ওজনও ততই হ্রাস পায়। কাজেই যে পরিমাণ জিনিস ফুরায় সেই পরিমাণ জল ট্যাঙ্কে ভরিয়া সমতা রক্ষা করিতে হয়।

সাধারণ অবস্থায়ও ডুবো-জাহাজের যতটুকু অংশ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকে তাহা বেশী দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে মালজাহাজ বা যুদ্ধজাহাজগুলি সমুদ্রবক্ষে এতখানি ভাসমান থাকে যে, বহুদূর হইতেও সেগুলি নজরে আসে। এতদ্ব্যতীত ডুবো-জাহাজের গায়ে এমন ওস্তাদীভাবে রং লাগান হয় যেন দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় উহা সমুদ্রজলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। এই জন্যই ডুবো-জাহাজের নাবিকরা শত্রুপক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মগোপনে অধিকতর সুবিধা পায়। তাহারা সব দেখিয়া লয়, অথচ তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না।

খুব গভীর সমুদ্র না হইলে ডুবো-জাহাজগুলি একেবারে সমুদ্রের তলদেশে চলিয়া যায় এবং সমস্ত কলকব্জা বন্ধ করিয়া দিয়া সেখানে ওত পাতিয়া বসিয়া থাকে। বিপক্ষের জাহাজ বহুদূরে থাকিতেই তাহার চাকার আওয়াজ ডুবো-জাহাজের হাইড্রোফোন যন্ত্রে ধরা পড়ে। যখন বুঝিতে পারে জাহাজ কাছে আসিয়াছে, তখন ধীরে ধীরে উপরে ওঠে এবং জলের উপর পেরিস্কোপ যন্ত্রটী ভাসাইয়া বিপক্ষের জাহাজখানিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। পেরিস্কোপটি কিন্তু বেশীক্ষণ ভাসাইয়া রাখা হয় না; কারণ জলের নীচে চলন্ত অবস্থায় ডুবো-জাহাজটিকে দেখা না গেলেও পেরিস্কোপে জল আটকাইয়া সমুদ্রবক্ষে যে শুভ্র তরঙ্গরেখার সৃষ্টি হয় তাহা বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কাজেই মাঝে মাঝে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য পেরিস্কোপ জলের উপর ভাসান হয়। এইভাবে নিরীক্ষণ করিয়া যখন বুঝা যায় বিপক্ষের জাহাজ টর্পেডোর পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তখন ডুবো-জাহাজ হইতে উহাকে লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়া হয় টর্পেডো।

ডুবো-জাহাজে যে অক্সিজেন লইয়া নামা হয় তাহা হিসাব করিয়া খরচ করিলে এবং জাহাজের কোন কিছু না বিগড়াইলে একখানি ডুবো-জাহাজ সমুদ্রগর্ভে একাদিক্রমে ৪৮ ঘণ্টাকাল নিমজ্জিত অবস্থায় থাকিতে পারে। ডুবো-জাহাজ যখন সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া চলে, তখন তাহার গতি

ঘণ্টায় সাধারণতঃ পনর-যোল নটের বেশী হয় না। (এক নটের মাপ ৬০৮০ ফুট অর্থাৎ এক মাইলের কিছু বেশী)। তবে ঘণ্টায় আঠার-উনিশ নট যাইতে পারে এমন দুই-চারিখানি ডুবো-জাহাজও আছে। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এত দ্রুত গতিতে ডুবো-জাহাজ চলেনা—সাধারণতঃ দুই-তিন নট কম চলে। আর ডুবো-জাহাজ যখন জলের মধ্যে ডুবিয়া চলে তখন উহা কোনক্রমেই ঘণ্টায় দশ নটের অধিক অতিক্রম করিতে পারে না। সাধারণতঃ নিমজ্জিত অবস্থায় ডুবো-জাহাজ ঘণ্টায় আট-নয় নট পথ চলিয়া থাকে। একান্ত প্রয়োজন না হইলে জলের নীচে দিয়া ডুবো-জাহাজ বেশী দূরে অগ্রসর হয় না; কারণ সে অবস্থায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে গেলে কলকব্জা বিগড়াইবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই বেগতিক দেখিলে



পেরিস্কোপ ভাসাইয়া নিমজ্জিত ডুবো-জাহাজ চলিয়াছে

ডুবো-জাহাজ বরঞ্চ একেবারে সমুদ্রের তলদেশে গিয়া অবস্থান করে; তথাপি পারতপক্ষে নিমজ্জিত অবস্থায় সে বেশী পথ চলেনা। বিপদ কাটিয়া গিয়াছে মনে হইলে ডুবো-জাহাজ আবার সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াই পথ চলে।

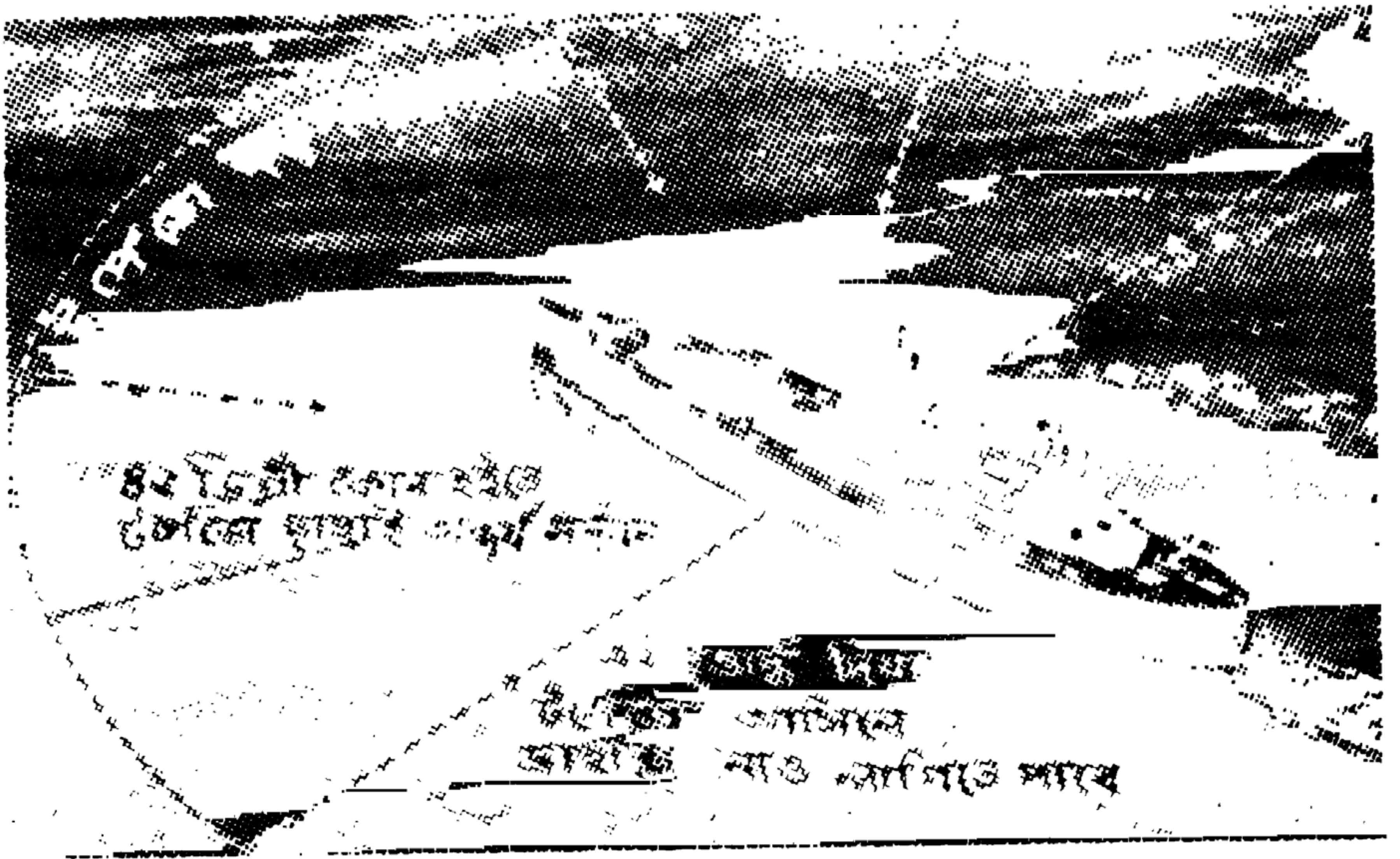
ডুবো-জাহাজ নির্ম্মাণে জার্ম্মানরা যে ওস্তাদ একথা সকলেই স্বীকার করে। গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানীতে যে-সকল উন্নত ধরণের ডুবো-জাহাজ নির্ম্মিত

হইয়াছে সেগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আড়াই শত, পাঁচ শত এবং সাত শত চল্লিশ টনী। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যে-সকল জার্ম্মান ডুবো-জাহাজ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় সেগুলির তুলনায় বর্ত্তমান ডুবো-জাহাজগুলি আকারে অনেক ছোট। গত যুদ্ধের সময় দুই হাজার সওয়া দুই হাজার টনী ডুবো-জাহাজ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। আয়তন ছোট হইলেও আধুনিক ডুবো-জাহাজগুলির সুদূরপথে চলাফেরা করিতে কোন অসুবিধা হয় না। কলকব্জার এতখানি উন্নতি হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র আকারের একখানি ডুবো-জাহাজও আজকাল আটলান্টিক মহাসাগরে অনায়াসে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দর হইতে রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলে জার্ম্মান ডুবো-জাহাজগুলি নিজেদের নৌঘাঁটি ছাড়িয়া দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিতে পারে; কলকব্জা বিগড়াইবার বড় একটা ভয় থাকে না।

একমাত্র জাপান ব্যতীত জার্ম্মানীর মত অত ক্ষুদ্র ডুবো-জাহাজ আর কোন রাষ্ট্রের নাই। বৃটিশ ডুবো-জাহাজগুলির আয়তন খুবই বড়। সর্ব্ববৃহৎ বৃটিশ ডুবো-জাহাজখানির দৈর্ঘ্য ৩২৫ ফুট। এতদপেক্ষাও বড় ডুবো-জাহাজ ছিল ফ্রান্সের। তাহার 'সারকোফ' নামে ৩৬১ ফুট দৈর্ঘ্যের বিরাট ডুবো-জাহাজখানিই ছিল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ডুবো-জাহাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পর এই ডুবো-জাহাজখানি নিমজ্জিত হয়। আর সেই তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জার্ম্মান ডুবো-জাহাজের দৈর্ঘ্য মাত্র ১৩৬ ফুট। জাপান কিন্তু আবার জার্ম্মানীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। সে এক প্রকার ক্ষুদে ডুবো-জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে যাহার খরচ পড়ে মাত্র একটি মোটর গাড়ীর সমান। জাপানের এই ক্ষুদে ডুবো-জাহাজগুলি একবারে ছয়শত মাইল ঘুরিয়া আসিতে পারে এবং সমুদ্রগর্ভে ১৮০০ ফুট পর্য্যন্ত ডুবিতে পারে। এইগুলিতে মাত্র দুইজন লস্কর থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান কোন কোন স্থানে এই ক্ষুদে ডুবো-জাহাজ ব্যবহার করিয়াছে।

টর্পেডো

এইবার টর্পেডো প্রসঙ্গে আসা যাক। কোন্ স্থান হইতে টর্পেডো ছুঁড়িলে নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ হয় প্রথমে তাহাই বলি। মনে করুন, একটি জাহাজ অগ্রসর হইতেছে। সেই জাহাজখানির মধ্যস্থল হইতে কল্পনায় সমুদ্রবক্ষে দুই দিকে দুইটি লম্ব রেখা টানুন এবং সেই লম্ব দুইটিকে একটি ব্যাস ধরিয়া জাহাজের সম্মুখের দিকে তাহার উপর একটি বৃত্তার্দ্ধ টানুন। টর্পেডো ছুঁড়িবার জন্য ডুবো-জাহাজ এই কল্পিত বৃত্তার্দ্ধের মধ্যে চলিয়া যাইবে এবং



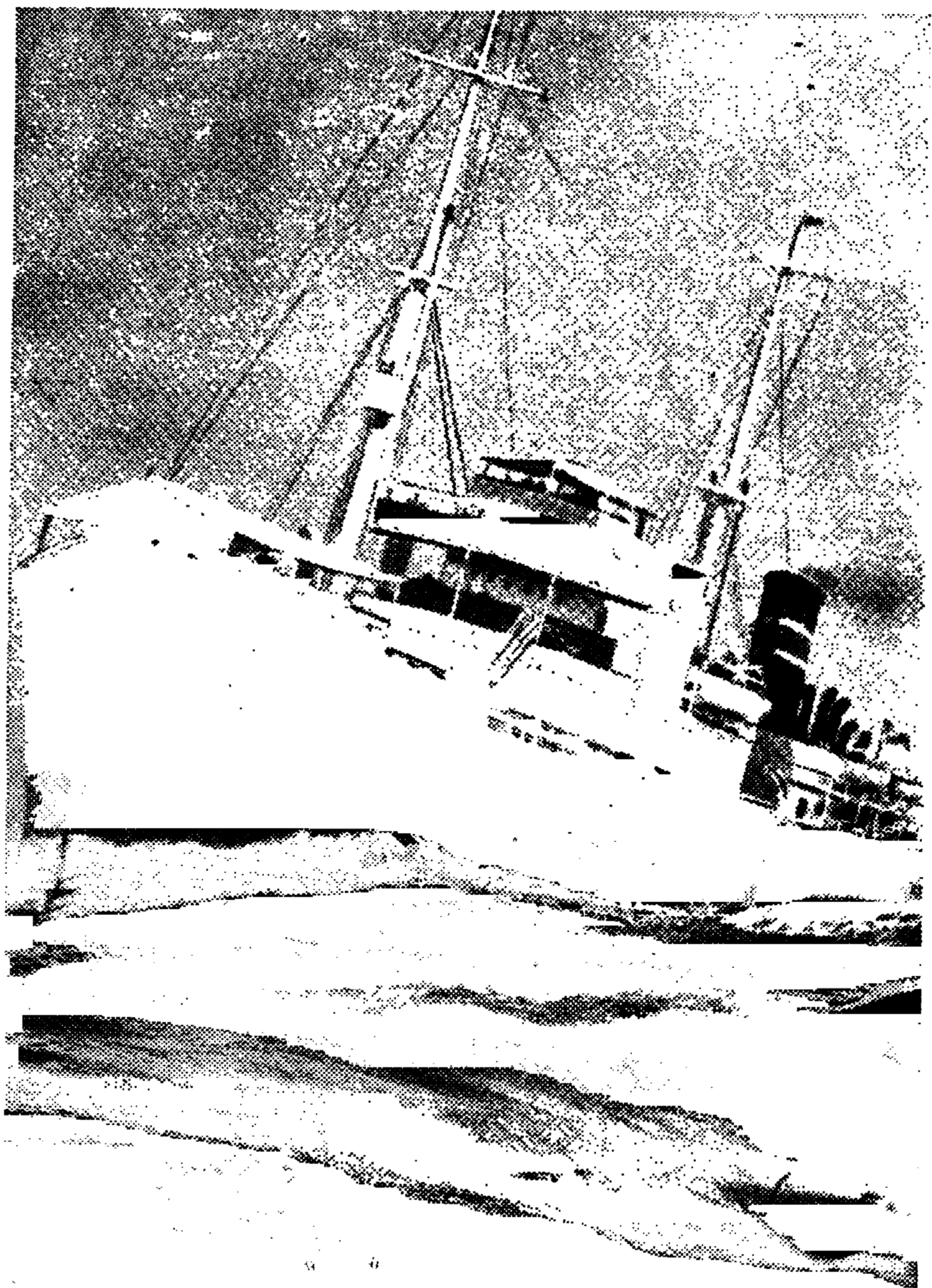
টর্পেডো মারিবার প্রশস্ত এলাকা

জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো ছুঁড়িবে। যে-জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো ছোঁড়া হয় তাহার সহিত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ গঠন করিয়া টর্পেডো ছুঁড়িলে আক্রমণ অব্যর্থ হয়। সেক্ষেত্রে টর্পেডোর হাত হইতে জাহাজ কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। পশ্চাৎ দিক হইতে কোনও

জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো কদাচিৎ ছোঁড়া হয়; কারণ সেই স্থলে টর্পেডো লক্ষ্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। যে-জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো ছোঁড়া হয় তাহার গতির উপর আক্রমণস্থলের দূরত্ব নির্ভর করে। সাধারণতঃ মালজাহাজের দিকে টর্পেডো ছুঁড়িতে হইলে পাঁচ ছয় শত গজ দূর হইতে ছোঁড়া হয়। টর্পেডো ডুবো-জাহাজ হইতে ছাড়া পাইয়াই ঘণ্টায় প্রায় ৫০ নট বেগে ছুটিতে থাকে। অবশ্য ক্রমশঃ উহার গতি হ্রাস হইয়া আসে। গড়ে উহা ঘণ্টায় ৪০ নট বেগে ধাবিত হয়। পাঁচ ছয় শত গজের বেশীও টর্পেডো যাইতে পারে; কিন্তু বেশীদূর হইতে টর্পেডো ছুঁড়িলে উহার গতিবেগ যথেষ্ট কমিয়া যায় এবং লক্ষ্যচ্যুত হইবারও সম্ভাবনা থাকে। তবে একাধিক জাহাজ যখন একসঙ্গে চলিতে থাকে তখন অপেক্ষাকৃত অধিকদূর হইতেই টর্পেডো ছোঁড়া হয়; কারণ সেক্ষেত্রে একটিতে না লাগিলে আর একটিতে লাগিবেই।

স্বাভাবিক গতির কোনও জাহাজ একবার যদি একখানি ডুবো-জাহাজকে অতিক্রম করিয়া আগাইয়া যাইতে পারে তবে বিপদের ভয় অনেকখানি কাটিয়া যায়; কারণ নিমজ্জিত অবস্থায় ডুবো-জাহাজের গতি খুবই কম। আর তাছাড়া জলের নীচে পূর্ণ গতিতে দুই এক ঘণ্টার বেশী চালাইলেই ডুবো-জাহাজের ব্যাটারীগুলি বিকল হইবার সম্ভাবনা। জলের নীচে ধীরে চলিলে একখানি ডুবো-জাহাজ অবশ্য কোন রকমে ৪৮ ঘণ্টা চলিতে পারে; কিন্তু সেভাবে চালাইতে গেলে ডুবো-জাহাজের নাবিকদিগকে গলদ্ঘর্ম্ম তো হইতেই হয়, তদুপরি কলকব্জা বিগড়াইবারও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই ডুবো-জাহাজের কোন বুদ্ধিমান অধ্যক্ষই অত বড় ঝুঁকি লইতে যান না।

ডুবো-জাহাজের সম্মুখের দিকে চোঙের মধ্যে টর্পেডো বসান থাকে। কাজেই ইচ্ছা করিলে কোনও চলন্ত জাহাজের পশ্চাৎদিক লক্ষ্য করিয়াও ডুবো-জাহাজ হইতে টর্পেডো ছোঁড়া যায়; কিন্তু জাহাজের পশ্চাৎদিকে গিয়া আঘাত করিবার পূর্ব্বেই জাহাজের চাকায় সৃষ্ট আবর্ত্তে পড়িয়া টর্পেডো



টর্পেডোর মুখ হইতে অল্পের জন্য জাহাজখানি রক্ষা পাইয়াছে

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে। এই জন্যই সাধারণতঃ পশ্চাৎদিক হইতে টর্পেডো মারা হয় না।

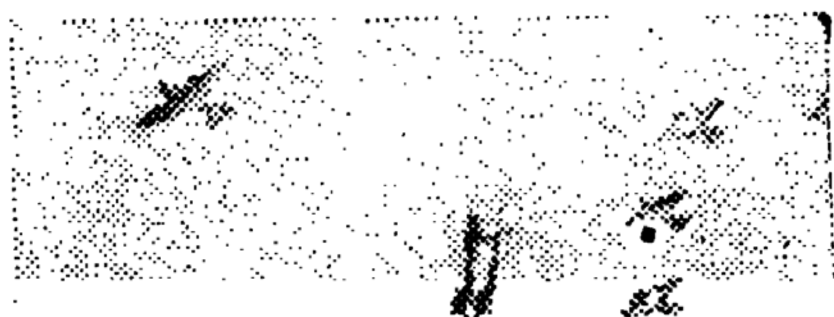
যে অস্ত্র পাঁচ ছয় শত গজ ছুটিয়া গিয়া জাহাজ ঘায়েল করে—আপনা হইতে যাহার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়—হালখানি পর্য্যন্ত যাহার এদিক সেদিক হইবার উপায় নাই—তাহার কলকব্জার মধ্যে যে কতখানি হিসাব রহিয়াছে, ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়! এই মারণাস্ত্রটি কিন্তু চলে বায়ুর চাপে। ইহার মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে ঘনচাপের বায়ু ভরিয়া দেওয়া হয়। সেই বায়ুর চাপেই ইহার চাকা ঘোরে এবং হালখানি পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। কতটুকু ডুবিয়া চলিবে এবং কখন কোথায় ভাসিয়া উঠিবে, তাহার কলটিও বাঁধা আছে।

টর্পেডোর মুখেই থাকে বিস্ফোরকের প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠে সাধারণতঃ পাঁচ শত পাউণ্ড ওজনের বিস্ফোরক থাকে। তাহার পরেই থাকে ঘনচাপের বায়ু রাখিবার প্রকোষ্ঠ। সেই প্রকোষ্ঠ হইতে ছাড়া পাইয়া বায়ু এঞ্জিনে প্রবেশ করে এবং তাহাতেই এঞ্জিন চলিতে থাকে। বায়ু-চালিত এই ক্ষুদ্র মোটরের শক্তি প্রায় ৩৫০ অশ্বশক্তির সমান। মোটর এত শক্তিশালী বলিয়াই টর্পেডো-গুলি ঘণ্টায় ৪০ নটেরও অধিক বেগে ধাবিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যুদ্ধ-জাহাজগুলিরও টর্পেডোর সহিত পাল্লা দেওয়া কঠিন। একবর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর ২৫০০ পাউণ্ড ওজনের চাপ পড়ে—বায়ুপ্রকোষ্ঠে এরূপ ঘনীভূত বায়ু থাকে। এই বায়ুপ্রকোষ্ঠের পশ্চাতে থাকে এঞ্জিনকক্ষ। টর্পেডোর এঞ্জিনকক্ষটিই হইল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের স্থান। সেখানে কলকব্জার যত রকম মারপ্যাঁচ। মাত্র তিন ফুট লম্বা স্থানের মধ্যে চাকা ঘুরিবার, গতি ঠিক রাখিবার এবং জলের মধ্যে ওঠানামা করিবার সকল প্রকার কলকব্জা বসান থাকে। টর্পেডোর চাকার পাতাগুলিও অদ্ভুতভাবে বসান। পাতাগুলি এক লাইনে না বসাইয়া পর পর বসান হয় এবং সেগুলি পরস্পরের বিপরীত দিকে ঘোরে। ইহার ফলে গতির সাম্যরক্ষায় সুবিধা হয়। আজকাল এক নূতন উপায়ে টর্পেডোর পাল্লা কিছু বাড়ান হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে

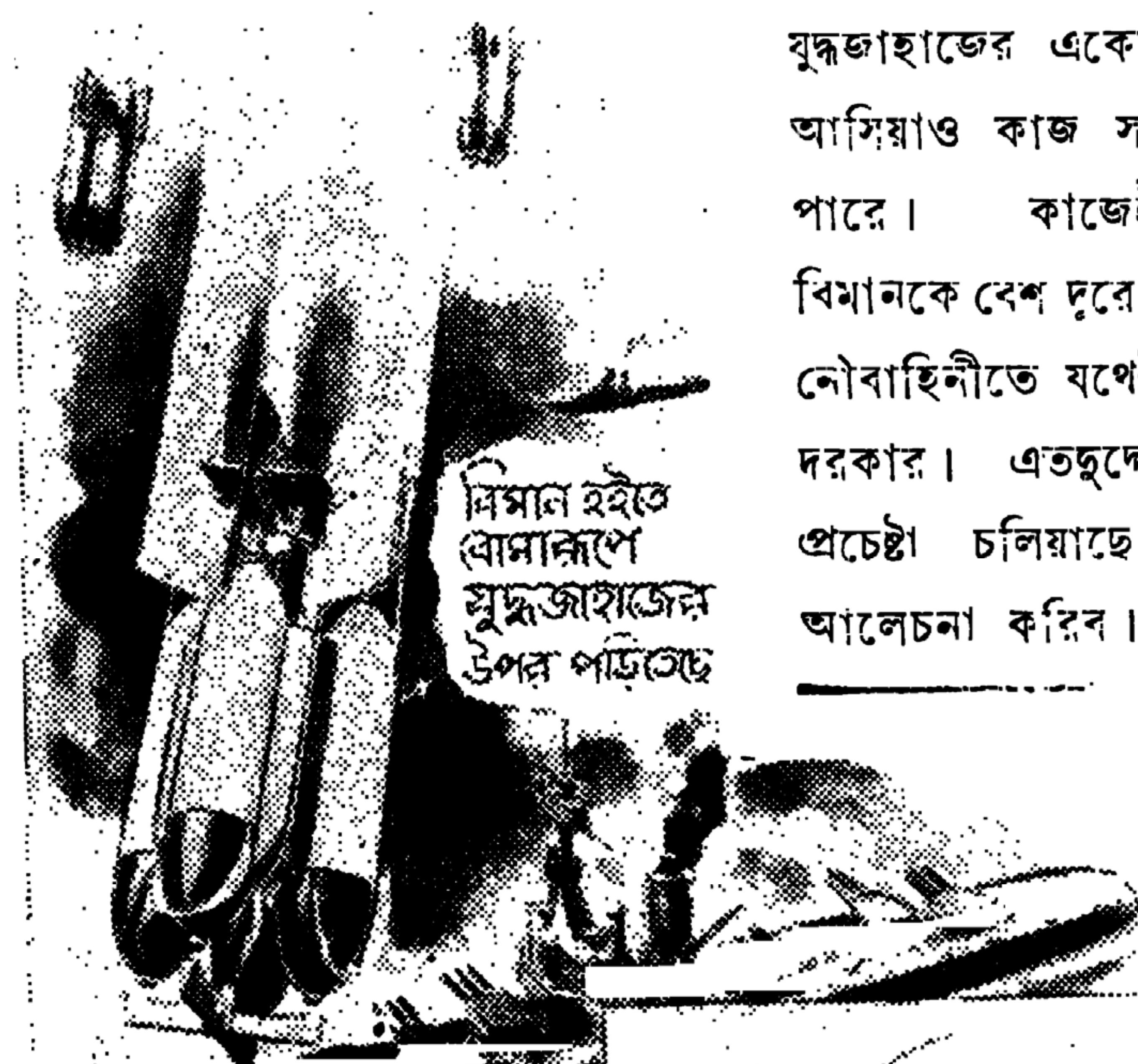
ঘনীভূত বায়ুর চাপের পরিবর্ত্তে অতি উত্তপ্ত ষ্টীমের সাহায্যে টর্পেডো চালান হয়। ঘনীভূত বায়ুর মধ্যে তেল জ্বলিতে আরম্ভ করে এবং সেই তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। পোড়া তেলে উৎপন্ন শক্তির সহিত মিলিত হইয়া উহা এঞ্জিনে প্রবেশ করে এবং তাহাতেই এঞ্জিন চালু হয়।

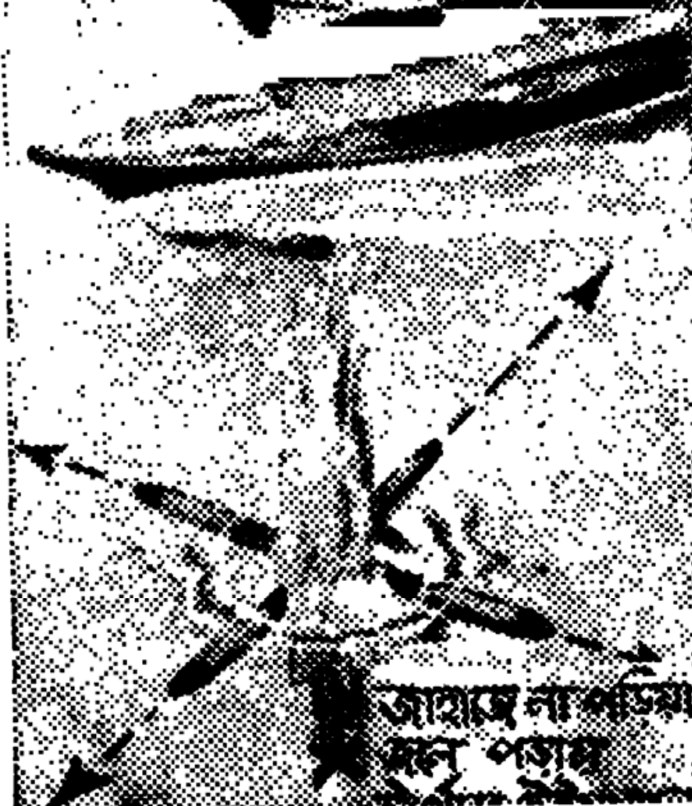
মারণাস্ত্রের মধ্যে টর্পেডো সত্যই এক বিস্ময়কর বস্তু! একটি টর্পেডোর মধ্যে ছয় হাজারেরও অধিক সূক্ষ্ম কলকব্জা থাকে। ক্ষুদ্রতম ঘড়ির কলকব্জার চাইতেও টর্পেডোর কলকব্জাগুলি অধিকতর সূক্ষ্ম।

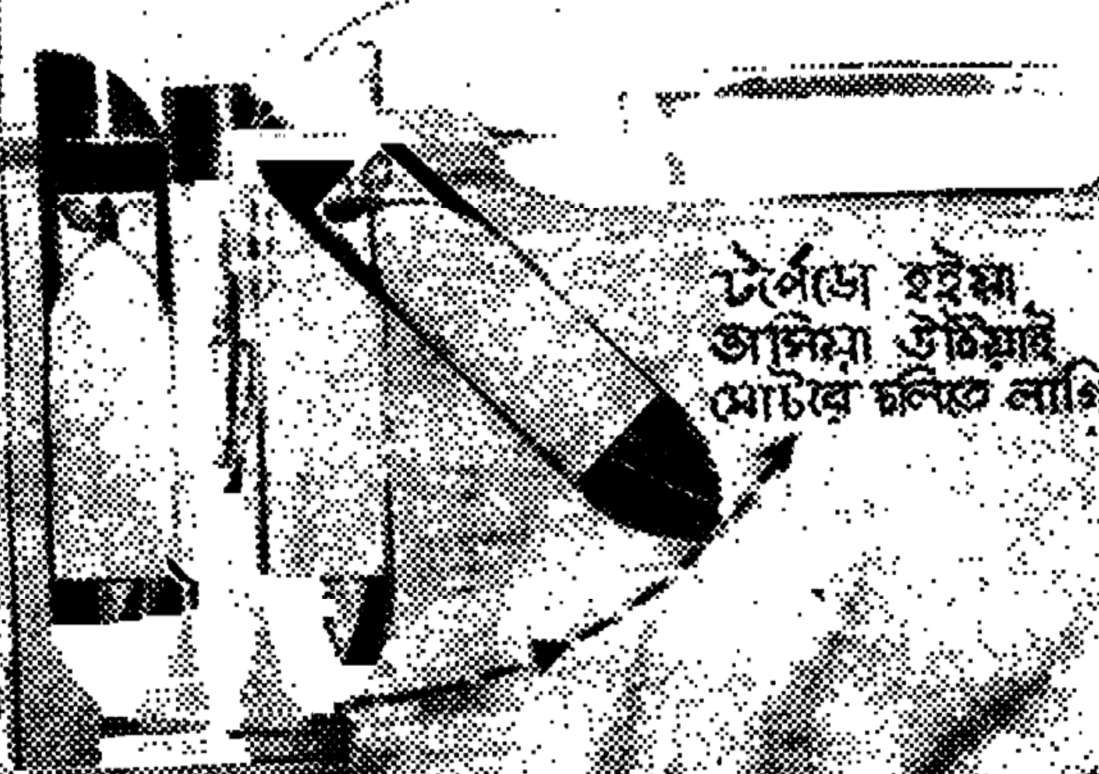
আবার বিমান হইতেও এক শ্রেণীর টর্পেডো ফেলা হয়। যে-সকল বিমান টর্পেডো ফেলে সেগুলিকে বলে 'টর্পেডো-প্লেন'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার আগে বিভিন্ন দেশের নৌকর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন নাই যে, বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোগুলি আধুনিক যুদ্ধ-জাহাজসমূহের পক্ষে কতখানি মারাত্মক হইতে পারে। বৃটিশ বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর ঘায়ে যখন য়ুরোপীয় দরিয়ায় জার্ম্মানীর অতি আধুনিক ৩৫ হাজার টনী ব্যাটল্‌শিপ 'বিসমার্ক' ঘায়েল হইল তখনই সকলে উপলব্ধি করিল যে, বিমান হইতে টর্পেডো মারিয়া আধুনিক নৌযুদ্ধে কতটা সফল হওয়া সম্ভব। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানীরা বিমান হইতে টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া যেদিন বৃটেনের নূতন ব্যাটল্‌শিপ 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' ও ব্যাটল্‌-ক্রুজার 'রিপাল্‌স্‌' ডুবাইয়া দিল, সেদিন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে টর্পেডোগুলি আজকাল যুদ্ধজাহাজের পক্ষে বেশী বিপজ্জনক। বোমা ফেলিতে হইলে বিমানকে জাহাজের একরূপ উপরে আসিয়াই ফেলিতে হয়। তাহাতে বিমানধ্বংসী কামানের মুখে পড়ার সম্ভাবনা এবং বোমাও লক্ষ্যচ্যুত হইতে পারে। আধুনিক যুদ্ধজাহাজ-গুলিকে বোমা হইতে রক্ষার জন্য যতখানি সুদৃঢ় করা হইয়াছে, টর্পেডো হইতে রক্ষার জন্য ততখানি সুব্যবস্থা হয় নাই; কারণ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, বিমান হইতে



নিক্ষিপ্ত বোমাই যুদ্ধজাহাজের পক্ষে ভয়ের কারণ হইবে বেশী। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে সকলে বুঝিতে পারিল যে, টর্পেডো মারিবার জন্য প্রতিপক্ষের বিমান যুদ্ধজাহাজের একেবারে কাছে না আসিয়াও কাজ সারিয়া যাইতে পারে। কাজেই বিপক্ষের বিমানকে বেশ দূরে রাখিতে হইলে নৌবাহিনীতে যথেষ্ট বিমান রাখা দরকার। এতদুদ্দেশ্যে যে নূতন প্রচেষ্টা চলিয়াছে পরে তাহা আলোচনা করিব।







টর্পেডো-বোমা

কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, আর এক প্রকার টর্পেডো লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিয়াছে। উহাকে এক কথায় বলা যায় টর্পেডো-বোমা। উহা টর্পেডো এবং বোমা উভয়ের কাজই করিতে পারিবে। ব্যাপারটি হইল এই। ধরুন, বিমান হইতে কোন জাহাজের উপর ঐ শ্রেণীর বোমা ফেলা হইল। বোমা লক্ষ্যস্থলে পড়িল তো ভালই—আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জাহাজে না পড়িয়া যদি জলে পড়ে তাহাতেও ক্ষতি নাই। জলে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটি চারিটি টর্পেডোতে পরিণত হইয়া চারিদিকে ছুটিল। আর যায় কোথায়! চারিটির মধ্যে যে-কোন একটির সামনে যদি বিপক্ষের জাহাজ আসিয়া পড়ে তৎক্ষণাৎ তাহা ঘায়েল হইবে। এই নূতন অস্ত্র কোনদিন ব্যবহার করা সম্ভব হইলে জলযুদ্ধে সত্যই তাহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে।

ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ

জলযুদ্ধে ডুবো-জাহাজের আক্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজের সম্মুখীন হইলে দুই পক্ষের মধ্যে কামান দাগিয়া, কি যেভাবেই হোক, সম্মুখযুদ্ধ করা চলে। বোমা ফেলিবার জন্য শত্রুপক্ষের বিমানকে উড়িয়া আসিতে দেখিলে জাহাজ হইতে বিমানধ্বংসী কামানের সাহায্যে তাহাকে ঘায়েল করা যায়; কিন্তু চোরের মত ডুব দিয়া আসিয়া ডুবো-জাহাজ যে কখন কোন্ জাহাজকে টর্পেডো মারিয়া যায় তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। যুদ্ধকালে ডুবো-জাহাজের আক্রমণে কেবল যে যুদ্ধ-জাহাজই বিপন্ন হয় এমন নয়, নিরপরাধ যাত্রীবাহী এবং মালজাহাজও ডুবো-জাহাজের চোরা আক্রমণের হাত হইতে অব্যাহতি পায় না।

ডুবো-জাহাজ সাধারণতঃ ভাসিয়াই চলে; কিন্তু শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখিলেই উহা জলের মধ্যে ডুব দেয় এবং জলের নীচ হইতেই টর্পেডো ছুঁড়িয়া

আক্রমণ চালায়। সেই নিমজ্জিত অবস্থায়ই ডুবো-জাহাজের উপর কি ভাবে পাণ্টা আক্রমণ চালান যায়, এবার সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব।

ডুবো-জাহাজের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় উহাকে বলে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইহা আবিষ্কৃত হয়। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ-কৌশলের বিবরণ পরে দিতেছি। প্রথমে ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জকে এক কথায় জলবোমা বলা



নিমজ্জিত ডুবো-জাহাজের নিকটেই ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ ফাটিয়াছে

যায়। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ যে সব সময়ে ডুবো-জাহাজকে ডুবাইয়া দেয় তাহা নয়; ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের বিস্ফোরণ ডুবো-জাহাজের খুব কাছে হইলে বিস্ফোরণের জোরে ডুবো-জাহাজের খোল তুবড়াইয়া ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায় এবং বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। তবে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ দূরে ফাটিলেও সেই বিস্ফোরণের আঘাতে ডুবো-জাহাজ এমন জখম হয় যে, যন্ত্র বিগড়াইয়া উহা আয়ত্তের

বাহিরে চলিয়া যায় এবং হয় উপরে ভাসিয়া ওঠে, নয় এত জোরে সমুদ্রতলে আছড়াইয়া পড়ে যে, তাহার ফলে ডুবো-জাহাজ আরও ঘায়েল হয়। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের আর একটি গুণ আছে। উহার বিস্ফোরণের জোর সংঘাতিক, সমুদ্রের চাপে তাহা আরও বাড়ে। এই আঘাতের ফলে ডুবো-জাহাজের নাবিকদের মনের দৃঢ়তা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা যায় যে, একবার যাহারা ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা আর স্বেচ্ছায় সেই পথে পা বাড়াইতে রাজী হয় নাই। সুতরাং ডুবোজাহাজের যথেচ্ছ ব্যবহার নিবারণের পক্ষে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জই প্রধান উপায়।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের নির্ম্মাণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহা দেখিতে ঠিক ষ্টীলের পিপার মত। গত মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে যখন ডুবো-জাহাজধ্বংসী অস্ত্র সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছিল, তখন তিন রকম ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ উদ্ভাবিত হয়। একটিতে থাকিত ৩০০ পাউণ্ড বিস্ফোরক; আর একটিতে থাকিত ১২০ পাউণ্ড ও তৃতীয়টিতে থাকিত ৪০ পাউণ্ড। শেষোক্ত চার্জ্জটি শুধু ছোট জাহাজ বা ষ্টীমারে ব্যবহৃত হইত এবং উহা দেখিতে মোটেই পিপার মত ছিল না। এই ধরণের চার্জ্জ উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ব্বে ডুবো-জাহাজ ঘায়েল করিবার উপযুক্ত কোন অস্ত্র ছিল না। পূর্ব্বে রক্ষী জাহাজে হাতুড়ী থাকিত; তাহা দ্বারা ডুবো-জাহাজের পেরিস্কোপ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। শেষোক্ত চার্জ্জটি অনেকটা ঐ পদ্ধতির অনুসরণেই তৈয়ারী করা হয়। উহার আকৃতি ছিল অনেকটা বর্শার মত এবং উহার অগ্রভাগে একটা ফাঁপা চোঙ্গা থাকিত; সেই চোঙ্গার মধ্যে থাকিত বিস্ফোরক। যেমন হাত দিয়া বর্শা ছুঁড়িয়া তিমি মাছ শিকার করা হয়, তেমনি ভাবে উহার দ্বারা ডুবো-জাহাজকে আঘাত করা হইত। এই 'বর্শা-বোমা' এবং ১২০ পাউণ্ডের ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এখন ৩০০ পাউণ্ডের ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জই ব্যবহৃত হয়; কারণ উহাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী।

আজকালের ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ হইতেছে একটি ষ্টীলের চোঙ্গা যাহার ব্যাস ১ ফুট ৫॥ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৩ ইঞ্চি। এই চোঙ্গার ভিতর ৩০০ পাউণ্ড ট্রাই-নাইট্রো-টোলুয়েন বিস্ফোরক ভরিয়া দেওয়া হয়; মাঝখান দিয়া একটি নলের মত ফাঁক থাকে। এই স্থান দিয়া পিস্তল বসান হয়। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের কলকব্জা বলিতে যা কিছু সে এই পিস্তলটি। ইহার মধ্যে বিশেষ কোন জটিলতা নাই। কলের মধ্যে প্রধান হইতেছে একটি হাইড্রোষ্ট্যাটিক ভাল্‌ভ্‌ (কপাটকল) ও তৎসংযুক্ত একটি স্প্রিং। ভাল্‌ভ্‌টি স্প্রিং-এর টানে বন্ধ থাকে। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জটি জলের কত নীচে ফাটিবে তাহারই হিসাবে স্প্রিং-এর টান ঠিক করিয়া দিতে হয়। সমুদ্রের মধ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় সমুদ্রজলের চাপ স্প্রিং-এর টান অপেক্ষা বেশী থাকে এবং চার্জ্জটি ঐ পর্য্যন্ত নামিবামাত্রই ভাল্‌ভ্‌ খুলিয়া যায়। ভাল্‌ভ্‌ খোলার ফলে পিস্তলে লাগান বারুদলিপ্ত ছোট টোপরটি ফুটিয়া যায় এবং তাহার ফলে আবার পিস্তলটি আঘাত করিয়া আসল চার্জ্জটিকে বিস্ফোরিত করে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের স্প্রিং-এর টান সমুদ্রতলের চারটী পরিমাপে ঠিক করা হইত—৫০ ফুট, ১০০ ফুট, ১৫০ ফুট ও ২০০ ফুট। ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ সম্পর্কে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গত মহাযুদ্ধের পর অন্য সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রেরই উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কারণ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যে ডেপ্‌থ-চার্জ্জ উদ্ভাবিত হয় তাহাই সম্পূর্ণ কার্য্যকরী।

ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ নিক্ষেপের দুই রকম পদ্ধতি এখন আছে। প্রথম যুদ্ধজাহাজের পশ্চাৎভাগে বক্র কাষ্ঠফলকের উপর দিয়া ফেলিয়া দেওয়া। একটি উত্তোলনদণ্ডের সাহায্যে উহা উঠাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বক্র কাষ্ঠফলকের গা বাহিয়া গড়াইয়া জলে পড়ে। যে ডেষ্ট্রয়ার হইতে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ ফেলা হয় তাহা দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে; নতুবা

জাহাজের পশ্চাৎভাগের নিকটে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের বিস্ফোরণ হইলে জাহাজের গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে যুদ্ধজাহাজের পথ হইতে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ দূরে



ডেষ্ট্রয়ার হইতে নিক্ষিপ্ত ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ জলের মধ্যে ফাটিলে যে অবস্থা হয় চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে

নিক্ষেপের প্রণালী। ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ নৌসেনাধ্যক্ষ স্যার সেসিল বার্ণি এই পদ্ধতি বাহির করেন। তাঁহার পদ্ধতি হইল, ডেষ্ট্রয়ারের দুই দিকে

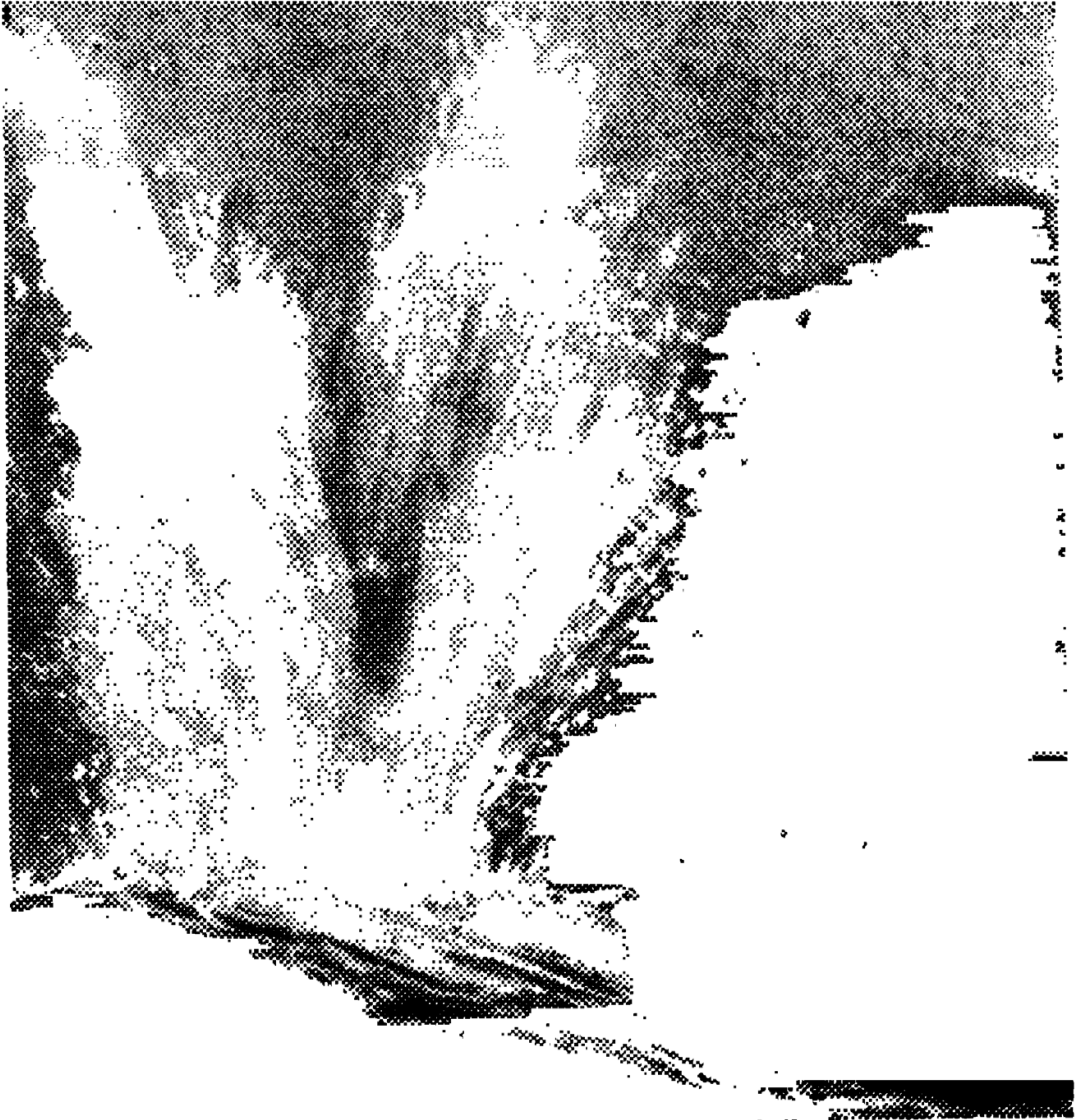
দুইটি হাউইটজার কামানের মত কামান থাকিবে যাহার দ্বারা গোলার মত ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ দূরে নিক্ষেপ করা যাইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্রজলে পেরিস্কোপ দেখিবামাত্র ডেষ্ট্রয়ার তাহাকে অনুসরণ করিয়া ডুবো-জাহাজ পার হইয়া যাইবে এবং তারপর হাউইটজার হইতে একাধিক ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ ছুঁড়িবে। সেইগুলি ডুবো-জাহাজকে জলের মধ্যে চাপিয়া ধরিবে; ইহার ফলে আক্রমণ অনেকটা অব্যর্থ হইবে।

পিপার আকৃতির ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জটি একটি লঘু ষ্টীলের দোলনার মধ্যে রাখা হয়; দোলনাটির একটি মোটা ডাঁটি থাকে। দোলনাটি থাকে হাউইটজারের মুখে এবং ডাঁটিটি কামানের চোঙ্গার মধ্য দিয়া ভিতরে চলিয়া যায়। হাউইটজারটি যখন ফুটান হয় তখন দোলনাসহ ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ ডেষ্ট্রয়ারের পথ হইতে ৪০ গজ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

আজকাল ডুবো-জাহাজ শিকারের কৌশল এত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে, আধুনিকতম উদ্ভাবনের সাহায্যে শুধু যে সমুদ্রতলে ডুবো-জাহাজের পথই নির্ণয় করা যায় তাহা নয়, উহার সঠিক অবস্থানও নির্ণয় করা সম্ভব। অতএব এখন আর ডেষ্ট্রয়ারের পক্ষে পেরিস্কোপ লক্ষ্য করিয়া ডুবো-জাহাজের গতিপথ নির্ণয় করা এবং পেরিস্কোপ লক্ষ্য করিয়া পিছু পিছু গিয়া ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ ছুঁড়িবার প্রয়োজন নাই। এখন ডুবো-জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করিয়াই ডেষ্ট্রয়ার সেই স্থানে যায় এবং একাধিক ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ নিক্ষেপ করে। যে কায়দায় আজকাল ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জগুলিকে ফেলা হয় তাহাকে বলে প্যাটার্ণ। প্যাটার্ণটি এই—ডেষ্ট্রয়ার প্রথমে তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে একটি ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়; তারপর কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া দুইটি ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ হাউইটজার হইতে একসঙ্গে ছোঁড়া হয়; আবার ডেষ্ট্রয়ারটি ঠিক অত গজ দূরে অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎভাগ হইতে আর একটি ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়।

এই চারিটি চার্জ্জ কিন্তু সমুদ্রজলের একই গভীরতায় ফাটে না।

বিভিন্ন পরিমাপে বিস্ফোরণের জন্য উহাদের স্প্রিং-এর টান ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে ডুবো-জাহাজটি আঘাত হইতে না বাঁচিতে পারে সেইজন্যই এরূপ করা হয়; কারণ ডুবো-জাহাজ কত নীচে আছে তাহার



ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ ফাটিলে সমুদ্রের জল এইভাবে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়

সঠিক মাপ পাওয়া কঠিন। এইরূপ প্যাটার্ণে আটকা পড়িয়া ডুবো-জাহাজ নিশ্চিতই ডুবিয়া যাইবে এমন কথা বলিলে ঠিক হইবে না। তবে

ডুবো-জাহাজটি যে জখম হইবে ইহা নিশ্চিত এবং উহার নাবিকদের দৃঢ়তাও নষ্ট হইয়া যাইবে।

ডুবো-জাহাজ হইতে কত দূরে বিস্ফোরিত হইলে যে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ কার্য্যকরী হইবে তাহা তর্কের বিষয়। কারণ অনেকগুলি পরিবর্ত্তনশীল বিষয়ের উপর বিস্ফোরণের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। বিস্ফোরণের ফলে সমুদ্রে জলের চাপ অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায় এবং উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জলে এবং ডুবো-জাহাজের চতুর্দ্দিকে জলের চাপের উপর সেই চাপ বিন্যস্ত হয়—ইহারই উপর ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের কার্য্যকারিতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের চাপ বাড়িতে থাকে; প্রতি এক ফুট গভীরতায় আধ পাউণ্ডের কিছু কম করিয়া চাপ বাড়ে; সুতরাং যে গভীরতায় ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের বিস্ফোরণ হয় সেই গভীরতার উপর উহার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। তারপর বিস্ফোরণের কেন্দ্রের সহিত ডুবো-জাহাজের অবস্থান এবং কোণের মাপও তারতম্য ঘটায়। আরও সূক্ষ্ম হিসাব করিতে হইলে জলের লবণাক্ততা ও বায়ুমণ্ডলের চাপের হিসাবও ধরিতে হয়।

তবে একাধিক পরীক্ষার দ্বারা ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের কার্য্যকারিতার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে। যদি ডুবো-জাহাজের ৫০ গজের মধ্যে বিস্ফোরণ হয় তাহা হইলে ডুবো-জাহাজটি অন্ততঃ খুব নাড়া খাইবে এবং তাহার গুরুতর ক্ষতি হইবে। বৈদ্যুতিক আলোর সার্কিট নষ্ট হইয়া যাইবে; যন্ত্রপাতি অকেজো হইয়া পড়িবে; যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র ডুবো-জাহাজটিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাহার ফিউজগুলি ছুটিয়া যাইবে, অন্যান্য যন্ত্র আটকাইয়া যাইবে; রিবিটগুলি ফাঁক হইয়া ডুবো-জাহাজের মধ্যে পিচকারীর মত সমুদ্রের জল ঢুকিয়া যাইবে। সব চেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, ডুবো-জাহাজটি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে; তাহার নাবিকগণ এমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে যে, যে-সময়ে তৎপরতার প্রয়োজন সেই সময় তাহাদের শিথিলতা আসিবে।

ডুবো-জাহাজের বিরুদ্ধে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের কার্য্যকারিতার কথা বাদ দিলে উহার আরও দুইটি গুণ আছে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ খুব সস্তা এবং সহজে অল্প সময়ের মধ্যে উহা তৈয়ারী করা যায়।

ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জ বা জলবোমার বিস্ফোরণে জলের মধ্যে ডুবো-জাহাজের যে কি দুর্দ্দশা হয়, একটি কাহিনী হইতে তাহা কিছু উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

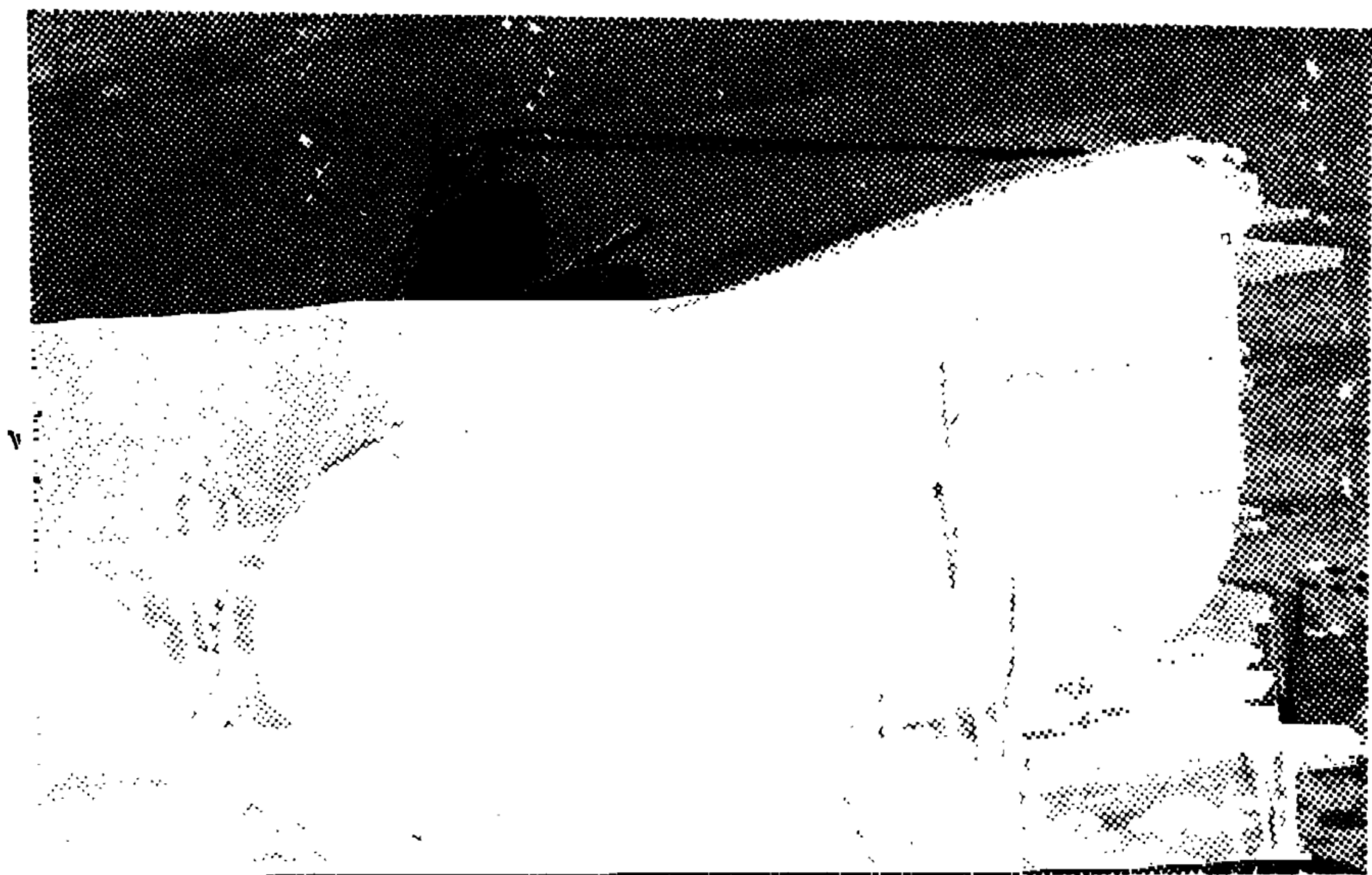
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পর একখানি বৃটিশ ডুবো-জাহাজ শত্রুপক্ষের গতিবিধি জানিবার জন্য উত্তর সাগরে চৌকি দিতে বাহির হয়। কুক্ষণেই সে যাত্রা করে—যাত্রামুখেই ওঠে প্রবল ঝড়। সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরেই সে আপন পথ করিয়া চলে। কখনও ডুবিয়া কখনও ভাসিয়া সে অগ্রসর হইতে থাকে। শত্রুমিত্র কাহারও জাহাজ দেখিলেই সে ডুব দেয়। কেহ তাহাকে দেখিতে পায়—ইহা তাহার ইচ্ছা নয়।

যাইতে যাইতে ডুবো-জাহাজখানি গিয়া শত্রুপক্ষের এলাকায় উপস্থিত হইল। সকালবেলা—পূর্ব্বাকাশ অরুণালোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য তখনও ওঠে নাই। সেই সময় জাহাজখানি ডুবিয়া যাইয়া একেবারে আত্মগোপন করিল।

ডুবো-জাহাজের নাবিকেরা প্রাতরাশে বসিয়াছে—এ কি সর্ব্বনাশ! তাহার মধ্যে কাছেই হইল জলবোমার বিস্ফোরণ! ভয় হইল, শত্রুরা তবে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে! জাহাজের অধ্যক্ষ পেরিস্কোপে ব্যাপারটা দেখিয়া লইবার জন্য 'ব্যালাষ্ট পাম্প' চালাইলেন। জাহাজ উপরের দিকে উঠিতেছে, ইহারই মধ্যে ফাটিল আবার আর একটা জলবোমা। এত কাছে যে, বিস্ফোরণের খানিকটা আঘাত আসিয়া লাগিল জাহাজখানিতে। বুঝিতে বাকী রহিল না, শত্রুপক্ষ টের পাইয়া তাহাদিগকে ঘায়েল করিবার জন্য জলবোমা ফাটাইতেছে। কাপ্তান তখন জাহাজের সমস্ত কলকব্জা বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে সমুদ্রের তলদেশে গিয়া পৌঁছিলেন। ইহার পর এক ঘণ্টার মধ্যে ছয়টি বিস্ফোরণ হইল। কিছুক্ষণ বাদে প্রতি দুই মিনিট অন্তর

এক একটি বিস্ফোরণ হইতে লাগিল। ভীষণ অবস্থা—চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। যে পরিমাণ অক্সিজেন সঙ্গে ছিল অতি সাবধানে তাহা খরচ করিবার ব্যবস্থা হইল; কারণ সেই অবস্থায় তাহাদিগকে কতক্ষণ থাকিতে হইবে কে জানে!

সেই মরণের মুখে দাঁড়াইয়াও নাবিকরা কিন্তু একেবারে ঘাবড়াইয়া গেল না। করিবার তাহাদের কিছুই নাই; কিন্তু চুপ করিয়াই বা কতক্ষণ থাকা যায়। মরণের সঙ্গে যাহাদের নিত্য কোলাকুলি, মরণকে দেখিয়া কি তাহারা



সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত ডুবো-জাহাজ

কখনও ভয় পায়! চারিদিকে মৃত্যুবাণ, হয় তো তাহাদের জীবন সেখানেই শেষ, পৃথিবীর আলোবাতাস হয় তো তাহাদের ভাগ্যে আর নাই, তাহাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা হয় তো জগদ্বাসীর নিকটে কোনক্রমেই পৌছিবে না, হয় তো তাহা চির-রহস্যপূর্ণই থাকিয়া যাইবে—গেলই বা, তাই বলিয়া মৃত্যুভয়ে তাহারা কি কাপুরুষের মত হাতপা ছাড়িয়া কাঁদিতে বসিবে?—সাধারণ

মানুষ হইলে হয় তো তাহাই করিত, কিন্তু মরণবিজয়ীরা তাহা করিল না। সেই বিপদের মধ্যেও তাহারা একটা আনন্দের পথ খুঁজিয়া বাহির করিল। বাজি রাখিয়া তাহারা খেলা সুরু করিয়া দিল। স্থির হইল, পরবর্ত্তী বেতনের তারিখে বাজির হারজিতের দেনাপাওনা মিটান হইবে। হায়রে—কি দুরাশা! বেতনের তারিখ পর্য্যন্ত যে তাহারা জীবিত থাকিবে তাহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে!—নাই বা থাকিল;—তখনকার মত খেলিয়া সময় কাটাইতে পারিলেই বা মন্দ কি!

এইভাবে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারপর অপরাহ্ণে তাহারা চা-পানে বসিল। কেহ চায়ের কাপে চুমুক দিয়াছে, কেহ রুটির টুক্‌রা মুখের কাছে তুলিয়াছে, এমন সময় শব্দ হইল—গুরুম্ গুরুম্ গুম্! চায়ের কাপ, রুটির টুক্‌রা যাহার হাতে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। সকলে মনে করিল, এইবার মৃত্যু নিশ্চিত। পর পর বিস্ফোরণের শব্দে মনে হইল, যেন কোন দৈত্য-দানব চারিদিক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চারিদিকে জলবোমা বিদারণের গুরুগর্জ্জন। সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, একটা বিস্ফোরণের ধাক্কা যেন আসিয়া তাহাদের জাহাজের খোলে লাগিল। আলোগুলি সব নিভিয়া গেল। এখানে সেখানে কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। শুধু কি তাই! জাহাজে জল প্রবেশের কল্ কল্ শব্দও তাহাদের কাণে আসিতে লাগিল। শোঁ শোঁ শব্দ শুনিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল, যেখানে ঘনচাপের বাতাস রাখা হইয়াছে সেখানেও একটা কিছু বিভ্রাট ঘটিয়াছে। হাত-লণ্ঠন সাহায্যে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল, বিপদ ভালমতই হইয়াছে। দুইটি এঞ্জিনই বিগড়াইয়াছে। ঘনচাপের বাতাস যেখানে রাখা হইয়াছে সেখানে প্রায় আধ ডজন ফুটা হইয়াছে। মোটরের টায়ার ফুটা হইলে যেমন ভাবে বাতাস বাহির হয়, ঐ ফুটাগুলি দিয়াও তেমনই ভাবে শোঁ-শোঁ করিয়া বাতাস বাহির হইতেছে। অতি সাবধানে বহুক্ষণের

চেষ্টায় তাহারা ফুটাগুলি বন্ধ করিতে সক্ষম হইল এবং আলোগুলিও আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সেই অবস্থায়ই অপেক্ষা করিতে লাগিল। ডুবো-জাহাজের ভিতরের আবহাওয়া ক্রমশঃই অস্বস্তিকর বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে জাহাজের লেফ্‌টেনাণ্ট ঘড়ি দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে রাত্রি হইয়াছে, তখন তিনি সঙ্গীদিগকে জানাইলেন, 'ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্কগুলি' যদি ঠিকমত থাকিয়া থাকে—অবশ্য আছে কি না সন্দেহ—তবে সেইগুলি হইতে জল বাহির করিয়া দিয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া ওঠাই সমীচীন। মরিতেই যদি হয়—শেষ চেষ্টা করিয়া মরাই ভাল। জাহাজের তখন যে অবস্থা—কোথায় কি ভাঙ্গিয়াছে, কোথায় কি বিগড়াইয়াছে—কিছুই ঠিক নাই। তথাপি শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট অগ্রসর হইলেন; সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র তিনি নন।

ডুবো-জাহাজখানি অত্যন্ত মজবুত থাকায় প্রচণ্ড আঘাতেও উহার 'ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্ক' বিধ্বস্ত না হইয়া ঠিক অবস্থায়ই ছিল। কাজেই সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিতে জাহাজখানির কোন বেগ পাইতে হইল না। উপরে উঠিয়া দেখা গেল, স্বচ্ছ আকাশে অসংখ্য তারকা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। যে বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে তাহারা যাত্রা করিয়াছিল সেই সাগর তখন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। উর্দ্ধে অসীম নীলাকাশ—নিম্নে অবারিত জলরাশি—চারিদিকে আর কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের প্রাণের মধ্যে এতক্ষণ যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল, এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা প্রশমিত হইল। অন্ততঃ তখনকার মত তো তাহারা জীবনে রক্ষা পাইয়াছে। দুশ্চিন্তার রেখা মুছিয়া গিয়া আবার সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ভাসিয়া না হয় উঠিল, কিন্তু জাহাজের সমস্ত কলকব্জা যেভাবে অচল হইয়াছে তাহাতে কি আবার বন্দরে ফিরিয়া যাওয়া যাইবে? বেতারযন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—জাহাজ প্রায় চলচ্ছক্তিহীন—শত্রুর কবল হইতে সেই অবস্থায় পলাইবার পথ কি? বেশী দেরী করিলে শত্রুপক্ষ হয় তো আবার তাহাদিগকে



ডুবো-জাহাজের নাবিকগণ বাজি রাখিয়া খেলিতেছে

দেখিয়া ফেলিবে। কলকব্জার যে অবস্থা তাহাতে জলে ডুবিয়া আত্মগোপন করাও আর চলিবে না। নিরুপায় হইয়া একটি মাত্র মোটর সাহায্যেই সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এঞ্জিনিয়ার বিগড়ান কলগুলি আবার চালু করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনঘণ্টা চেষ্টার পর তিনি আসিয়া জানাইলেন, বড় এঞ্জিন চালু হইয়াছে—আর ভয় নাই—এইবার প্রাণে বাঁচা গেল। সারারাত্রি কাটিবার পর অতি প্রত্যুষে আসিয়া বেতারচালক খবর দিলেন, বেতারযন্ত্রও চালু হইয়াছে। ব্যাস! একেবারে নিশ্চিন্ত। প্রথমেই স্বপক্ষের ডুবো-জাহাজগুলিকে বেতার সাহায্যে বিপজ্জনক এলাকার বিশদ বিবরণ জানাইয়া দেওয়া হইল। তারপর বেতারে সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। খানিকদূর অগ্রসর হইতেই বৃটিশ নৌবহরের সহিত ডুবো-জাহাজখানির সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের সাহায্যে সে গিয়া আবার বৃটিশ বন্দরে পৌছিল।

মাইন

জলযুদ্ধে মাইন একটি মারাত্মক অস্ত্র। এই মারণাস্ত্রের নির্ম্মম আঘাতে এযাবৎ যত জাহাজডুবি হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী ব্যাপকভাবে এই অস্ত্র প্রয়োগ করে এবং এবারও যুদ্ধ বাধিতে না বাধিতেই এই সর্ব্বনাশা মারণাস্ত্রের সাহায্যে সে তুমুল কাণ্ড বাধায়। শত্রু মিত্র কাহারও জাহাজ ইহার আক্রমণ হইতে রেহাই পায় নাই।

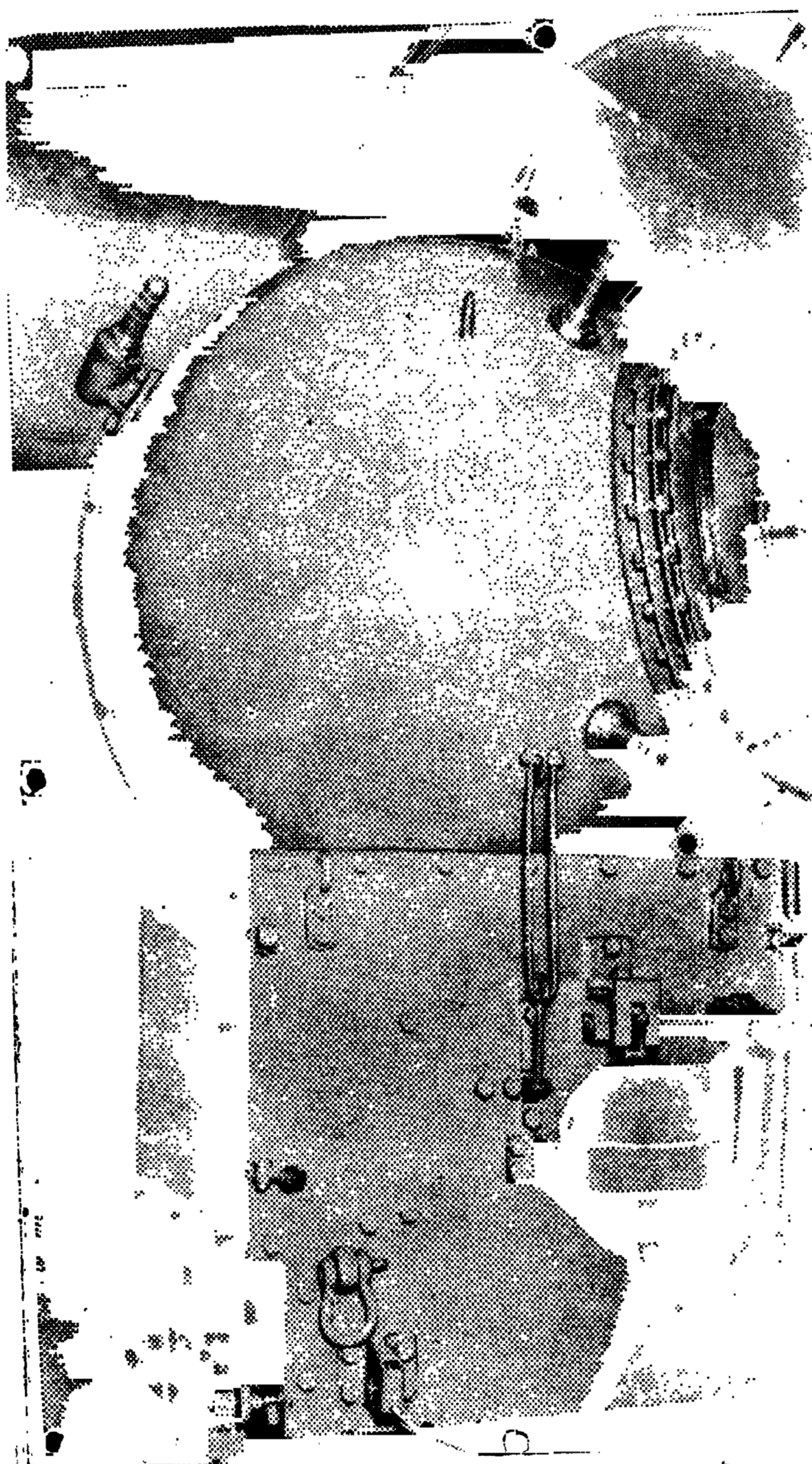
সাধারণ মাইন জাহাজের সংস্পর্শে আসিলে বিদীর্ণ হয় এবং চুম্বক মাইন ও শব্দকাতর মাইন কোন কিছুর সংস্পর্শে না আসিলেও দূর হইতেই বিদ্যুৎ-প্রভাবে আপনা আপনি ফাটিয়া পড়ে। চুম্বক ও শব্দকাতর মাইন

সম্বন্ধে পরে বলিব। যে-সকল মাইন জাহাজের সংস্রবে আসিয়া বিদীর্ণ হয়, প্রথমে সেগুলির সম্বন্ধেই বলি।

জাহাজের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণতঃ যে-সব মাইন বিদীর্ণ হয় সেগুলির আকৃতি গোল এক একটি বলের মত। ভিতরে থাকে উগ্র বিস্ফোরক এবং বিস্ফোরণের অতি সূক্ষ্ম কলকব্জা। এতদ্ব্যতীত মাইন যাহাতে তলাইয়া না যায় তজ্জন্য ভিতরে বায়ু ভরিয়া দেওয়া হয়। ফলে মাইন উপরের দিকে ভাসিয়া ওঠে। তাই বলিয়া একেবারে জলের উপরে ভাসিয়া ওঠে না; কারণ তাহা হইলে এই গুপ্ত অস্ত্র পাতিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। সমুদ্রের তলদেশে থাকে নোঙর। সেই নোঙরের সঙ্গে তারে বাঁধা থাকে মাইন। একেবারে ভাসিয়া না উঠিয়া খানিকটা জলের নীচে থাকে বলিয়াই সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখিয়া কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই কোথায় মাইন পাতা রহিয়াছে।

মাইনের শীর্ষদেশে শিঙ-এর মত কয়েকটি সীসার নল থাকে। খুব নরম সীসায় ঐগুলি প্রস্তুত হয় এবং যাহাতে নাড়াচাড়ার সময় কোন বিপদ না ঘটে তজ্জন্য ঐগুলি রবারে মুড়িয়া দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক সের ওজনের কোন জিনিষের ঘা খাইলেই ঐ নলগুলি বাঁকিয়া যায়। নলগুলি বাঁকিলেই ঐগুলির মধ্যে যে কাঁচের নল থাকে সেগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। কাচের নল ভাঙ্গিলেই উহার অভ্যন্তরস্থ এক প্রকার এসিড মাইনের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে যে তড়িৎশক্তির সৃষ্টি হয় তাহারই প্রভাবে ডিটোনেটর বা বিস্ফুটক সক্রিয় হইয়া মাইনকে বিদীর্ণ করে। এক একটি মাইনের মধ্যে নেহাৎ কমপক্ষে তিনশত পাউণ্ড ওজনের বিস্ফোরক থাকে। কাজেই জলের মধ্যে উহার বিস্ফোরণে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না।

কোন জাহাজের খোলের সহিত সংঘর্ষ হওয়ামাত্রই কিন্তু মাইন বিদীর্ণ হয় না। কিছু সময় লাগে। সংঘর্ষের ফলে সীসার নল বাঁকিবার পর ডিটোনেটরে ক্রিয়া হইতে যতক্ষণ সময় লাগে, মাইনটী ততক্ষণে একেবারে



সমুদ্রে পাতিবার পূর্ব্বের অবস্থায় সংঘাত-মাইন

জাহাজের তলদেশে চলিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় বিস্ফোরণ হইলে কোন জাহাজের আর নিষ্কৃতি নাই। জাহাজের সহিত টক্কর লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাইন বিদীর্ণ হইলে জাহাজের খুব বেশী অনিষ্ট হয় না; কেবল বিস্ফোরণের ফলে জাহাজের সম্মুখে খানিকটা জল ছিটকাইয়া ওঠে মাত্র।

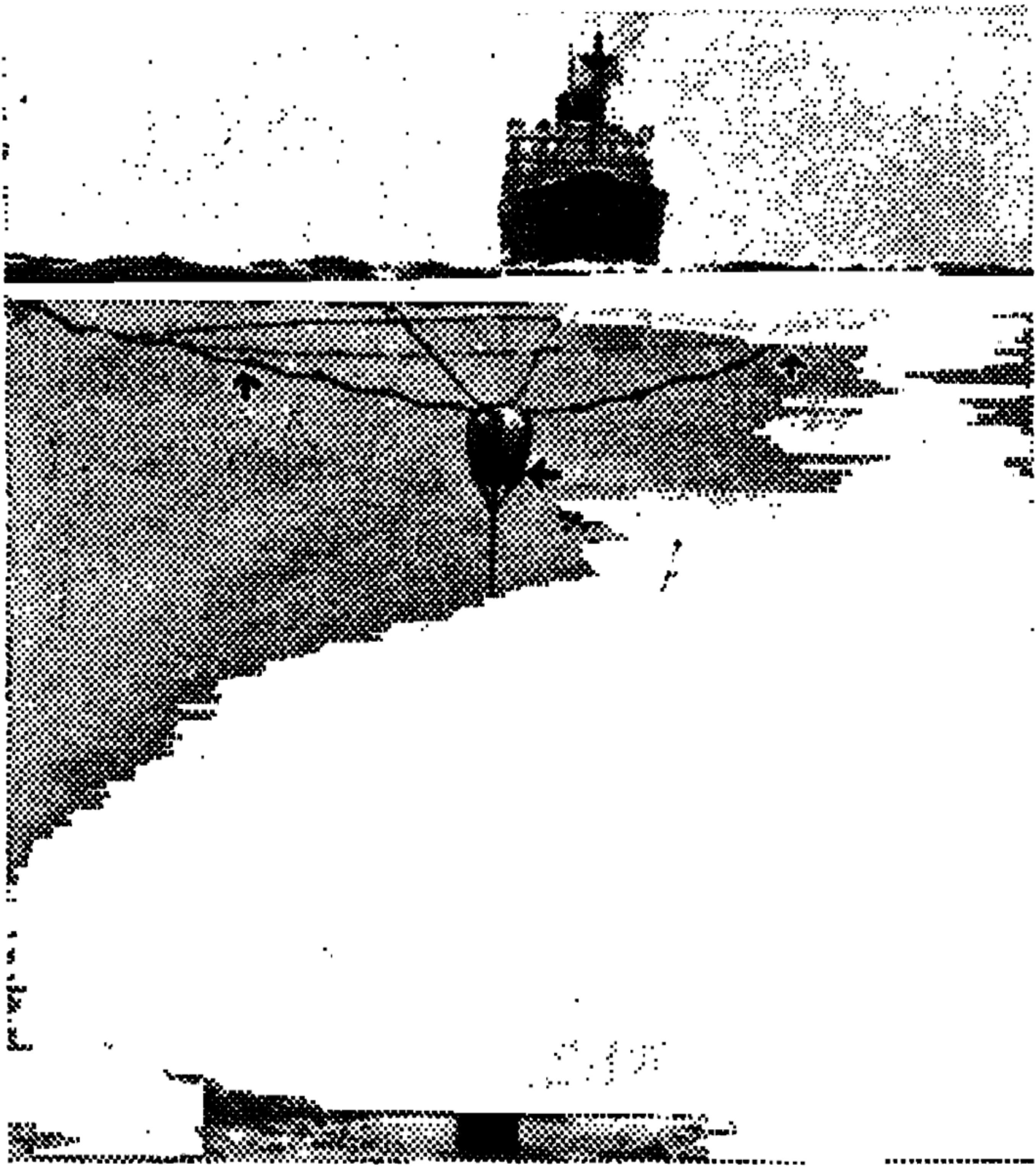
গত মহাযুদ্ধের পর দুই শ্রেণীর মাইন লইয়া বিশেষ গবেষণা ও পরীক্ষা চলে। এক প্রকার হইল য়্যান্‌টেনা মাইন বা হুল-মাইন এবং আর এক প্রকার হইল চুম্বক মাইন।

য়্যান্‌টেনা মাইন সাধারণতঃ ডুবো-জাহাজ ঘায়েল করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সীসার নলের পরিবর্ত্তে উহাতে একাধিক লম্বা বৈদ্যুতিক তার যুক্ত থাকে। কীটপতঙ্গের হুলের মত তারগুলি থাকে সমুদ্রবক্ষের দিকে বিস্তৃত। ঐগুলির সহিত কোন জাহাজের সংস্পর্শ হইল কি আর কথা নাই—অমনি মাইন গেল ফাটিয়া। যতদূরে মাইন ফাটিলে সমুদ্রবক্ষে জাহাজ বিপন্ন হয়, সমুদ্রগর্ভে ডুবো-জাহাজ বিপন্ন হয় তদপেক্ষা ঢের বেশী দূরে। খোল ফুটা না হইলেও জলের চাপে ধাক্কা খাইয়া ডুবো-জাহাজের কলকব্জা এমনভাবে বিগড়াইয়া যাইতে পারে যার ফলে সে সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। ডুবো-জাহাজ যাহারা শিকার করিয়া বেড়ায় তাহারাও উহাই চায়; কারণ ডুবো-জাহাজ জলের নীচে যতখানি ভয়ঙ্কর, জলের উপরে ততখানি নয়। সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিলে ডুবো-জাহাজকে কাবু করা খুবই সহজ।

য়্যান্‌টেনা মাইন পাতিবার সুবিধা এই যে, সমুদ্রজলের বিভিন্ন গভীরতায় বহুসংখ্যক সাধারণ মাইন পাতিয়া না রাখিলেও চলে। যত জল দিয়াই ডুবো-জাহাজ চলুক না কেন, য়্যান্‌টেনা মাইনের তারের সহিত তাহার সংস্পর্শ হইতেই পারে এবং সংস্পর্শ হইলেই মাইন বিস্ফোরণের ফলে তাহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

আর এক প্রকার মাইন আছে যেগুলি ছাড়িয়া দিলে প্রথমে সমুদ্রের

তলদেশে চলিয়া যায় এবং সেখানে গেলেই উহার নিম্নদেশে আপনা হইতেই একটি চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে। ফলে মাইনটী উপরের দিকে উঠিতে থাকে এবং যখন সমুদ্রবক্ষের কাছাকাছি আসে, তখন জলের চাপ লঘু হওয়ায় উহার একটি ভাল্‌ভ্‌-এ এমনভাবে ক্রিয়া হয় যাহাতে চাকাটি

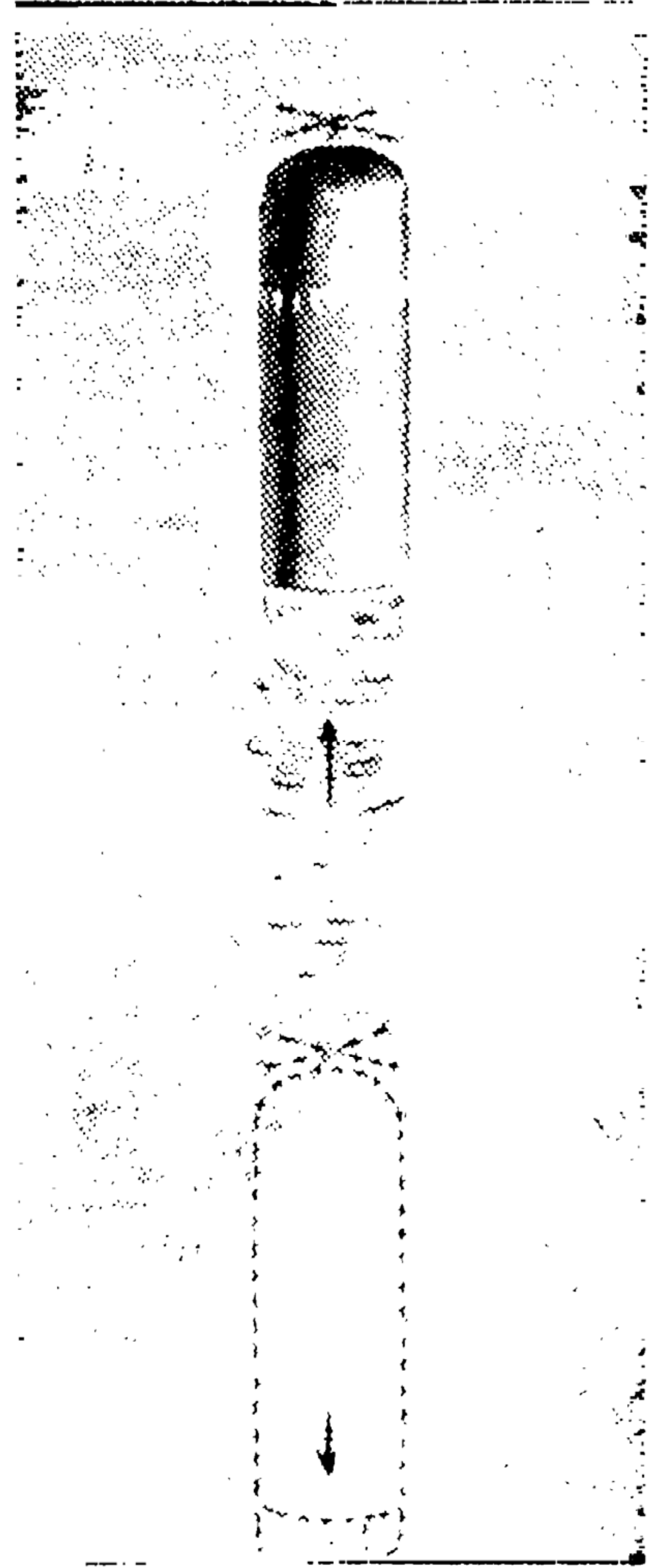


য়্যান্‌টেনা মাইন সমুদ্রে তার বিস্তার করিয়া আছে

আবার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় মাইনটি গভীর জলে চলিয়া যায় এবং আবার ঐভাবে উপরে উঠিতে থাকে। এই নিয়ত সঞ্চরণ-শীল মাইন ব্যবহার করা সম্ভব হয় সেখানেই যেখানে অনবরত জলের

স্রোত কেবল শত্রুপক্ষের দিকেই বহে; নতুবা নিজের অস্ত্রে নিজেকেই ঘায়েল হইতে হয়। এই শ্রেণীর মাইনের ব্যবহার গত মহাযুদ্ধেই হইয়াছিল বেশী। আজকাল ইহার প্রচলন কম।

এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর মাইন আছে যেগুলি জলের উপর ভাসিয়াই চলে। এইগুলির কোন লাগাম নাই; খেয়ালীর মত যেদিকে ইচ্ছা ভাসিয়া যায়। এই মাইনগুলি ফেলা হয় বিমান হইতে। ডুবো-মাইনের মত এইগুলি তত মারাত্মক নয়। আর তা ছাড়া দূর হইতেই দেখা যায় বলিয়া আগেভাগেই সাবধান হওয়া চলে। ফাটিলেও ইহার উচ্ছ্বাস জলের উপরেই মিলাইয়া যায় বেশী, গভীর দেশে প্রবেশের শক্তি কম। তবে খুব সঙ্কীর্ণ জলপথে বা কোন পোতাশ্রয়ে পড়িলে এইগুলি যে বিক্রম দেখায়, তাহা একেবারে অবজ্ঞায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

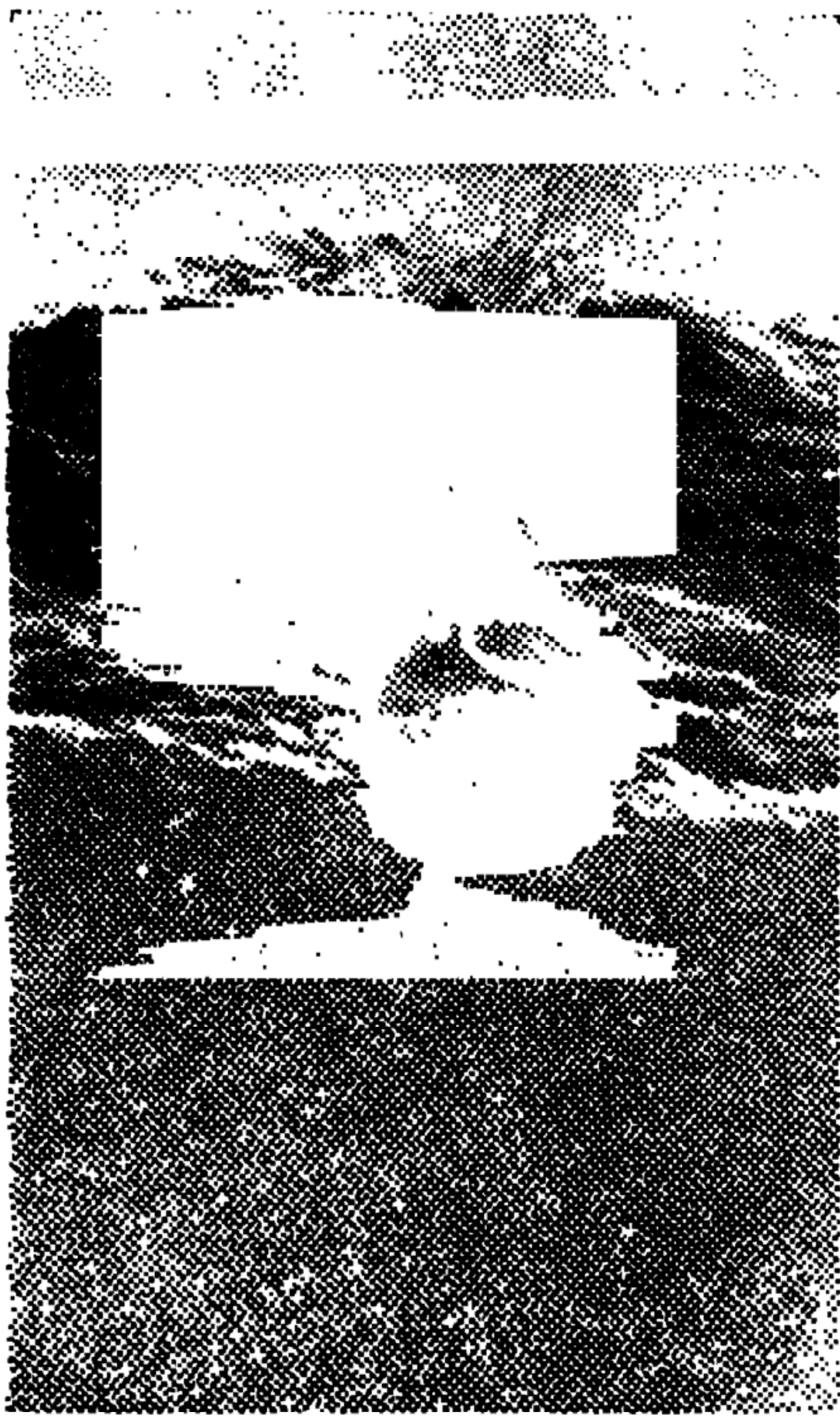


সঞ্চরণশীল মাইন। ইহা জলের মধ্যে ওঠানামা করে

এইবার জার্ম্মানীর প্রিয় অস্ত্র চুম্বক মাইন ও 'অ্যাকাউষ্টিক' বা শব্দকাতর মাইনের কথা বলি। চুম্বক মাইন খুব গভীর সমুদ্রে পাতা হয় না; কারণ মাইনগুলি থাকে সমুদ্রের তলদেশে পড়িয়া। কাজেই গভীর জলে

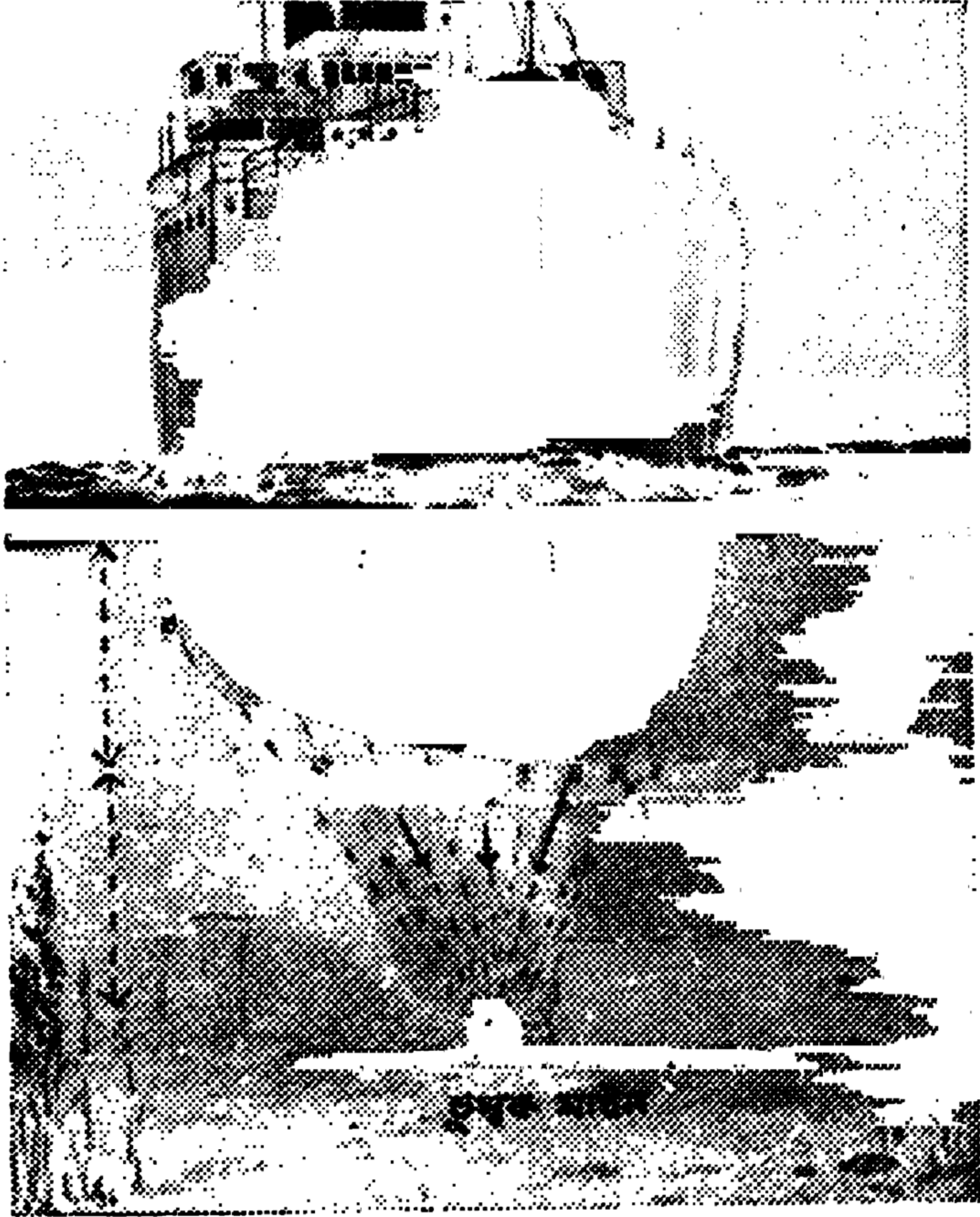
চুম্বক মাইন পাতিলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়; সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া গেলেও উহা বিদীর্ণ হয় না।

চুম্বক মাইন বিমান হইতে সমুদ্রে ফেলা যায় এবং ডুবো-জাহাজ হইতেও সমুদ্রগর্ভে পাতা হয়। বিমান হইতে চুম্বক মাইন সমুদ্রে ফেলিবার সময় উহার অভ্যন্তরস্থ কলকব্জায় চোট যাহাতে বেশী না লাগে তজ্জন্য অনেক সময় উহার সহিত একটি প্যারাশুট বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ৫০ ফুটের অনধিক উর্দ্ধ হইতে চুম্বক মাইন ফেলা হইলে প্যারাশুট বাঁধিবার আর কোন প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রে মাইন পাতিবার ইহা ছাড়া আরও একটি উপায় আছে। সমুদ্র-বক্ষে 'সী-প্লেন' নামিয়াও চুম্বক মাইন ছাড়িয়া যাইতে পারে। ডুবো-জাহাজ হইতে যে-সকল চুম্বক মাইন পাতা হয় সেগুলির তুলনায় বিমান হইতে পাতিত চুম্বক মাইনগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা ধরণের। বলা বাহুল্য, সাধারণ মাইনের চাইতে সকল চুম্বক মাইনই অনেকখানি হালকা। ভাসাইয়া রাখিবার জন্য কোন বায়ু-প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন না থাকায় চুম্বক মাইনের ভিতরটা প্রায় সবখানিই বিস্ফোরকে পূর্ণ করা সম্ভব হয়।


ভাসমান মাইন

চুম্বক মাইনের উপরে একটা আবরণ থাকে। উহা গলিয়া না গেলে চুম্বক মাইন সক্রিয় হইতে পারে না। আবরণ গলিতে ১৫ হইতে ত্রিশ

মিনিটকাল সময় লাগে। এইজন্যই চুম্বক মাইন জলে ফেলিলে উহার আবরণ গলিতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণে ডুবো-জাহাজ বা আর যাহাই মাইন পাতুক, সে নিজে সরিয়া পড়িতে পারে। ইতিমধ্যে

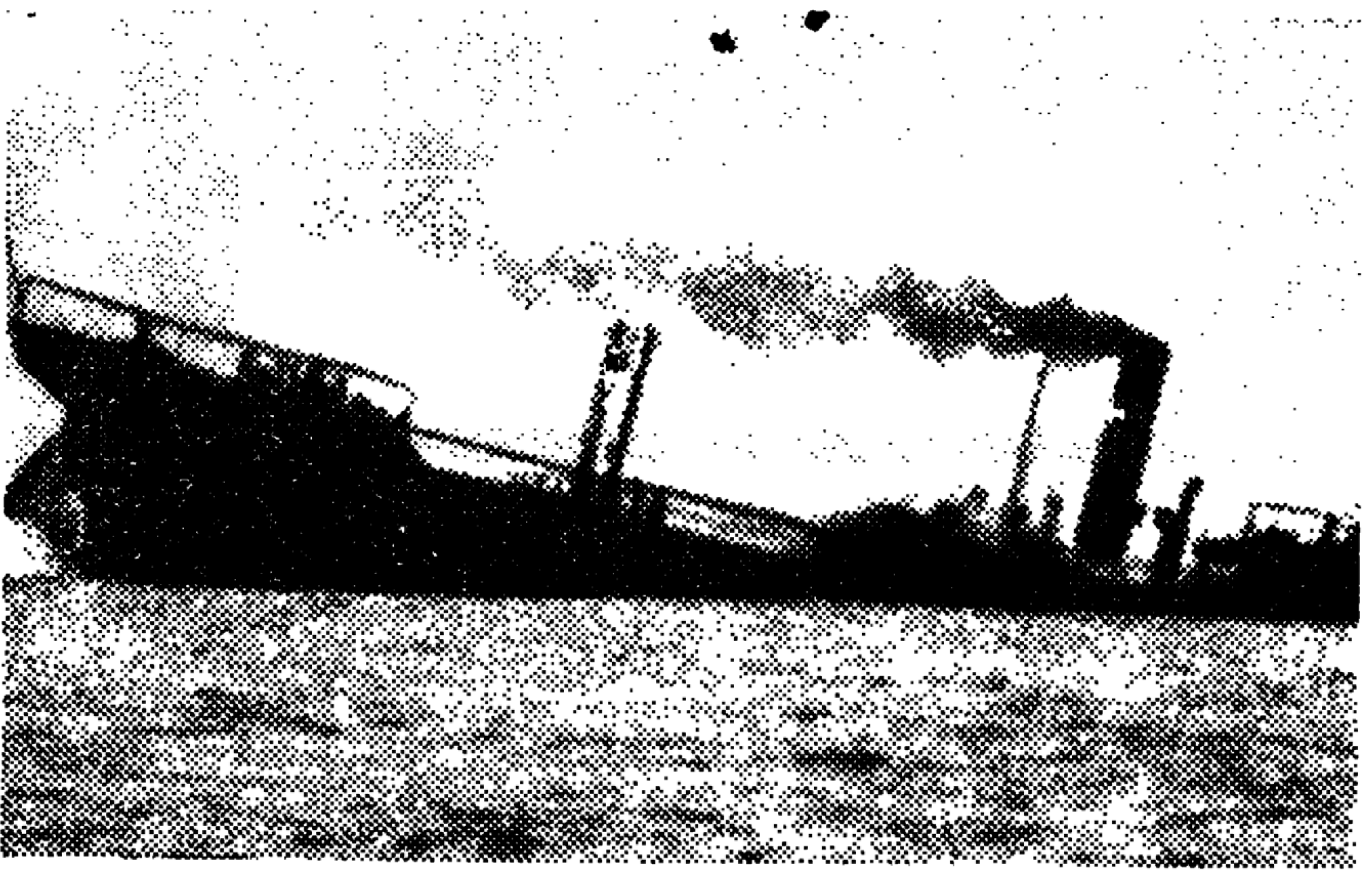


ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রভাবে দূর হইতেই চুম্বক মাইন এইভাবে বিদীর্ণ হয়

সমুদ্রের জলে উপরের আবরণটা গলিয়া যায় এবং মাইন ফাটিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চুম্বক মাইন গভীর জলে পাতা হয় না। মনে করুন, সমুদ্র যেখানে পঞ্চাশ্‌ ষাট ফুট গভীর, সেখানে পাতা হইল চুম্বক

মাইন। মাইন পড়িয়া আছে একেবারে সমুদ্রের তলদেশে। উপর দিয়া চলিয়াছে একখানি জাহাজ। জাহাজখানি যদি ২৫ ফুট জল ভাঙ্গে তবে চুম্বক মাইন হইতে জাহাজের খোল দূরে থাকে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ ফুট। ধাতুনির্ম্মিত জাহাজের চারিদিক স্বভাবতঃই চুম্বক-প্রভাবিত হয় এবং যতই ক্ষীণ হউক না কেন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবিত উক্ত এলাকা চুম্বক মাইনের সূক্ষ্ম সূচকে চঞ্চল করিবার পক্ষে যথেষ্ট। সূক্ষ্ম সূচ চঞ্চল হইয়া যে তড়িৎশক্তি সৃষ্টি করে তাহারই প্রভাবে মাইনের অভ্যন্তরস্থ



মাইনের আঘাতে অর্দ্ধনিমজ্জিত জাহাজ

ডিটোনেটর সক্রিয় হইয়া ভীষণ ভাবে মাইনকে বিদীর্ণ করে। মাইন বিস্ফোরণের ফলে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ্জের মতই জলে ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে। সেই জলের ধাক্কার চোটে জাহাজের খোলের পাতগুলির জোড়া খুলিয়া যায় এবং খোলে ফাটল ধরিলেই জাহাজে প্রবল বেগে জল প্রবেশ করে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই জাহাজের সলিলসমাধি ঘটে। চুম্বক মাইন কখনও ছুটিয়া আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগে না; দূরেই তাহার বিস্ফোরণ হয়।

সমুদ্রে মাইন বিনাশের যে উপায় অবলম্বিত হয় তদ্দ্বারা চুম্বক মাইন বিনাশ করা যায় না। নোঙরের সহিত বাঁধা মাইনগুলির তার 'প্যারাভেন' নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া দেওয়া যায়। তার কাটা হইলেই মাইন জলের উপর ভাসিয়া ওঠে এবং দূর হইতে গুলী ছুঁড়িয়া সেইগুলিকে তখন বিনাশ করা চলে; কিন্তু চুম্বক মাইন সমুদ্রের তল দেশে কোথায় যে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে কে তাহার সন্ধান রাখে। কাজেই সে আজও সাধারণ মাইন শিকারীদের নাগালের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

তবে চুম্বক মাইনের কবল হইতে নিস্তার পাইবার জন্যও এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। জাহাজের ডেকের নিম্নদেশে খোলের চারিদিকে ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক তার লাগান হয়। জাহাজ এবং উহাতে বোঝাই মালপত্র যাহাতে ভূগর্ভস্থ চুম্বক-প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য উক্ত বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ইস্পাতনির্ম্মিত জাহাজের উপরে বিপরীতধর্ম্মী চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং ভূগর্ভস্থ চুম্বকের আকর্ষণের প্রতি জাহাজখানি তখন উদাসীন থাকে। ফলে ইস্পাতের জাহাজ কাঠের জাহাজেরই সামিল হইয়া পড়ে এবং সমুদ্র-গর্ভে আর চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি না হওয়ায় চুম্বক মাইন আকর্ষণ-বিরহিত হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই সমুদ্রের তলদেশে পড়িয়া থাকে।

এইবার জার্ম্মানীর 'অ্যাকাউষ্টিক' বা শব্দকাতর মাইন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। চুম্বক মাইনের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইবার পরই জার্ম্মানী এই নূতন অস্ত্রের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। মাইনে একটি হাইড্রোফোন যন্ত্র বসান হয়। চলন্ত জাহাজের শব্দ উক্ত হাইড্রোফোন যন্ত্রে ধরা পড়ে। শব্দ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাইন-সংলগ্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সেই তড়িৎপ্রভাবে ডিটোনেটর সক্রিয়া হইয়া মাইন বিদীর্ণ করে। এই মাইন

কতখানি কার্য্যকরী বলা কঠিন; কারণ এপর্য্যন্ত কোথাও ইহার ব্যাপক প্রয়োগের কথা শুনা যায় নাই।

নৌবলে রূপান্তর

বলা বাহুল্য, আধুনিক 'টোটাল ওয়ার' বা সার্ব্বিক যুদ্ধ নৌযুদ্ধের রীতি-নীতি অনেকাংশে বদলাইয়া দিয়াছে। নৌবল এতদিন প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্যে রাখা হইত—রণনীতিতে আত্মরক্ষায় নির্ভরশীল দেশগুলি প্রতিপক্ষের জলপথে আক্রমণ প্রতিরোধ ও অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য নৌবল রাখিত; আর আক্রমণশীল দেশগুলি প্রয়োজনক্ষেত্রে নৌবলের সাহায্যে পররাজ্যে অভিযান ও প্রতিপক্ষের বাণিজ্যপোত বিনাশের উদ্দেশ্যে নৌবল গড়িয়া তুলিত। এই প্রয়োজন অনুসারেই বিভিন্ন দেশের নৌবল গঠিত হয় এবং সেই জন্যই বিভিন্ন দেশের নৌবলের গঠনপদ্ধতিতে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিতেও বাধ্য। উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইতে পারে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌনীতি আত্মরক্ষাত্মক; পররাজ্য আক্রমণের জন্য তাহাদের নৌবল নয়, রাজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই তাহাদের নৌবলের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে জার্ম্মানী ও জাপান সম্প্রসারণকামী এবং সেই জন্যই পরাক্রমণের উপযোগী করিয়া তাহাদের নৌবল গঠিত। ইহার মধ্যেও আবার জার্ম্মানী এবং জাপানে পার্থক্য আছে। জার্ম্মানীর অবস্থান য়ুরোপের কেন্দ্রস্থলে এবং সেই জন্যই জলযুদ্ধের চেয়ে স্থলযুদ্ধেই সে প্রত্যক্ষ-ভাবে বিজড়িত বেশী। য়ুরোপে একমাত্র বৃটেন আক্রমণেই তাহার নৌবল দরকার; বৃটেনকে বাদ দিলে য়ুরোপের প্রায় সকল দেশই সে নৌবল ছাড়া দখল করিতে পারে এবং হইয়াছেও তাহাই। জার্ম্মানীর চরম স্বার্থ রহিয়াছে য়ুরোপে। বৃটেনকে বাদ দিলেও য়ুরোপে সম্প্রসারণের ক্ষেত্র প্রচুর। সেই জন্যই হিটলার বৃটেন দখল না করিয়াও য়ুরোপে যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হন। বৃটেন অভিযানের জন্য তাহার একটা বিরাট নৌবহর গড়িয়া তুলিবার

প্রয়োজন হয় নাই। একমাত্র বৃটেনের সামুদ্রিক 'বাণিজ্যপথে হানা দিবার জন্য তিনি সাবমেরিণবহরের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন এবং সেইদিকে তিনি যথেষ্ট সফলও হইয়াছেন। শুনা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার সময় জার্ম্মানীর মাত্র ৭১ খানি সাবমেরিণ ছিল; কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার সাবমেরিণের সংখ্যা প্রায় তিন শতে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সোভিয়েট নৌবিভাগের মুখপত্র 'রেড-ফ্লীট' পত্রিকায় বলা হয়, "মাত্র ৭১ খানি সাবমেরিণ লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেও তিন বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানী প্রায় ৪ শত সাবমেরিণ নির্ম্মাণ করাইয়াছে। মিত্রপক্ষের আক্রমণে তাহার শত দুইএর কিছু কম সাবমেরিণ খোয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখন জার্ম্মান সাবমেরিণের সংখ্যা প্রায় তিন শত।"

জার্ম্মান সাবমেরিণগুলি কেবল য়ুরোপীয় দরিয়ায়ই জাহাজ ডুবায় নাই; আমেরিকার উপকূলবর্ত্তী দরিয়ায় গিয়াও এযাবৎ জার্ম্মান সাবমেরিণ মিত্রপক্ষের বহু জাহাজ ডুবাইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে জার্ম্মান সাবমেরিণের আক্রমণ এইরূপ ব্যাপক হইবে, হিটলারের সামরিক গুরু জেনারেল ফন লুডেনডর্ফের উক্তিতে বহু পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। তিনি একদা বলিয়াছিলেন,—

"সার্ব্বিক যুদ্ধের প্রয়োজনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, তখন আর সীমাবদ্ধভাবে সাবমেরিণ আক্রমণের কোন প্রশ্নই উঠিবে না।"

গত মহাযুদ্ধে বৃটেন অর্থনৈতিক অবরোধ দ্বারা জার্ম্মানীকে যে-ভাবে কাবু করিতে পারিয়াছিল, এইবার তাহা সম্ভব হয় নাই। হিটলার তাঁহার সার্ব্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনায় জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আগেই সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন; অন্ততঃ যুদ্ধকালীন অবস্থায় জার্ম্মানী যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাৎসী অর্থনীতি এতদিন তেমনভাবেই পরিচালিত হইয়াছে। তারপর ফ্রান্সের অপ্রত্যাশিত পতনে বৃটেনের অবরোধনীতি আরও ব্যর্থতার দিকে গিয়াছে। বরঞ্চ এই যুদ্ধে ব্যাপক সাবমেরিণ আক্রমণ চালাইয়া হিটলার

বৃটেনেরই যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি করিয়াছে। কাজেই সার্ব্বিক যুদ্ধের আবর্ত্তনে পড়িয়া বৃটেনের এতদিনের নৌনীতি কেবলই ঘুরপাক খাইয়াছে। স্থল ও বিমান শক্তির মত আজ নৌশক্তিরও রূপান্তর সাধন একান্ত আবশ্যক।

জাপানের অবস্থা কিন্তু ঠিক জার্ম্মানীর বিপরীত। সমুদ্রবক্ষে তাহার অবস্থান এবং সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ছাড়া তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের উপায় নাই। সেইজন্যই প্রশান্ত মহাসাগরে সে এক বিরাট নৌবহর গড়িয়া তুলিয়াছে। সাম্রাজ্য বিস্তারে নৌবলই তাহার প্রধান সহায়। জার্ম্মানীর মত স্থলযুদ্ধের উপর সে অত্যধিক জোর দিতে পারে না। জাপানের নৌবহর কি ভাবে বিদেশে অভিযান চালাইবার উপযোগী করিয়া গঠিত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে তাহার পরিচয় ভালভাবেই মিলিয়াছে।

এতকাল বৃটিশ নৌমহলের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, নৌবলই যুদ্ধ জয়ের চরম অস্ত্র। সেই ধারণা যে কত ভুল বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে তাহা ভাল ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। বিখ্যাত সমর বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স বার্ণার তাঁহার 'ব্যাটল্ ফর দি ওয়ারল্ড' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"যথেষ্ট বেশী নৌবল থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষ য়ুরোপে তৃতীয় রাইখের (নাৎসী জার্ম্মানীর) অসাধারণ জয় ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। কার্য্যতঃ মিত্রপক্ষ তৃতীয় রাইখের বিরুদ্ধে নৌবল প্রয়োগের কোন সুযোগই পায় নাই।"

অতএব নৌবলের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার পক্ষপাতী এতদিন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা আজ সমস্যায় পড়িয়াছেন। আধুনিক বিমানবলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কেবল যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ও টনেজ ধরিয়া এখন আর নৌবলের মান নির্ণয় করা চলে না; কোন্ নৌবাহিনীতে কত বিমানবল আছে এবং কোথায় কোন্ অবস্থায় নৌবাহিনী স্বপক্ষের স্থলঘাঁটি হইতে বিমানসাহায্য পাইতে পারে—তাহাই আজ বিভিন্ন দেশের নৌকর্ত্তৃপক্ষের বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিমান

আক্রমণ যে আধুনিক রণপোতগুলির পক্ষে কতদূর মারাত্মক হইতে পারে জার্ম্মান ব্যাটল্‌শিপ 'বিসমার্ক' এবং বৃটিশ ব্যাটল্‌শিপ 'প্রিন্স অব অয়েল্‌স্' ও বৃটিশ ব্যাটল্ ক্রুজার 'রিপাল্‌স্' ডুবিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অকূল সাগরে নৌযুদ্ধ হইলে কেবল নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমানবলেরই উপর নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু উপকূলের অদূরবর্ত্তী দরিয়ায় নৌযুদ্ধ হইলে স্থলঘাঁটি হইতে বিমান গিয়াও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। মালয়ের স্থলঘাঁটি হইতে কোন বিমানসাহায্য না পাওয়ায়ই 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্' ও 'রিপাল্‌স্' আরও বেশী অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল।

অতএব আজ বিভিন্ন দেশে চেষ্টা চলিয়াছে, কিভাবে নৌবাহিনীতে বিমানবল বৃদ্ধি করা যায়। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ দুই উদ্দেশ্যেই এখন নৌবাহিনীতে বিমানবল বাড়ান দরকার। বিশেষ করিয়া জাপানের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, প্রতিপক্ষের বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধজাহাজগুলিকে বর্ম্মাবৃত করা এবং সেইগুলিতে বিমানধ্বংসী কামান রাখাই যথেষ্ট নয়; বিমানকে ঠেকাইতে হইলে বিমানেরই প্রয়োজন। এই জন্যই কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপাততঃ অতিকায় রণতরী নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিয়া অধিক সংখ্যায় বিমানবাহী জাহাজ নির্ম্মাণ করাইবে। সম্প্রতি আরও খবর আসিয়াছে যে, নূতন ধরণের ৪৫ হাজার টনী ব্যাটল্‌শিপ-গুলিকে যাহাতে যুদ্ধজাহাজ এবং বিমানবাহী জাহাজ দুই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা চলে তেমন চেষ্টা চলিয়াছে এবং পরিকল্পনা হইয়াছে যে, এই সকল অতিকায় রণতরীগুলির কিয়দংশে বিমানবাহী জাহাজের মত ডেক নির্ম্মিত হইবে এবং তাহা হইতে বিমান উড়িবে। এই জাহাজগুলি কেবল গোলাগুলী লইয়াই চলিবে না, বিমানবাহী জাহাজের ন্যায় বক্ষে কিছুসংখ্যক বিমানও ধারণ করিবে। আধুনিক বড় বিমানবাহী জাহাজগুলিতে সত্তর আশীখানি বিমান ধরে; বিমানবাহী-ব্যাটল্‌শিপগুলিতে অবশ্য তত বিমান

ধরিবে না ; কিন্তু খান পনর ফাইটার ও খান তিন চারেক পর্য্যবেক্ষক বিমান এইগুলি অনায়াসেই বহন করিতে পারিবে। কেবল তাহাই নয়, এই সকল অতিকায় ব্যাটল্‌শিপের বক্ষে চারিখানি করিয়া দ্রুতগামী মোটর বোটও থাকিবে। বোটগুলি দৈর্ঘ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট হইবে এবং ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ নট চলিবে। এক একটি বোটে চারিজন করিয়া লস্কর, চারিটি শক্তিশালী মেশিনগান এবং একাধিক টর্পেডো থাকিবে। বিপক্ষের সাবমেরিণের সন্ধান পাইলেই বোটগুলিকে জাহাজের কক্ষ হইতে সমুদ্রবক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং কাজ সারিয়া ঐগুলি আবার জাহাজের বক্ষে আসিয়া আশ্রয় লইবে। এই নূতন পরিকল্পনায় অদ্যাবধি কোন জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত হইবে ; কেন না আধুনিক নৌযুদ্ধে বিমানবল একান্ত আবশ্যক।

স্থলযুদ্ধ

যুদ্ধের প্রকৃত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় স্থলযুদ্ধের দ্বারা। জলপথেই যাক, আর বিমানপথেই যাক, দেশ দখল করিতে হইলে ভূমিতে অবতরণ করিতেই হইবে। সেইক্ষেত্রে আবার পদাতিক সৈন্যবলেরই উপর নির্ভর করিতে হয় বেশী। সম্মুখযুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে যাইয়া শত্রুর ঘাঁটি দখল করিতে হয়। রাত্রির অন্ধকারে অথবা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন করিয়া তাহারা গিয়া শত্রুঘাঁটির মধ্যে পড়ে। তাহাদের আর তখন পশ্চাদপসরণের অবসর থাকে না—হয় মৃত্যু, না হয় বিজয়। পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের সাহায্য করে গোলন্দাজবাহিনী। আধুনিক যন্ত্রসজ্জার ফলে মোটরবাহিনীর বিস্তর উন্নতি হওয়ায় পদাতিকবাহিনীর অনেকখানি সুবিধা হইয়াছে। তাই পূর্ব্বের তুলনায় এখন গোলন্দাজবাহিনী পদাতিকবাহিনীকে অধিকতর সাহায্য করিতে পারে।

স্থলপথে যাহারা যুদ্ধ করে তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজবাহিনী। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে সম্মুখযুদ্ধের পক্ষে পদাতিকবাহিনীই হইল সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। অতি স্বল্পপরিসর স্থলে মারণাস্ত্র লইয়া তাহারা শত্রুপক্ষের সহিত লড়াই করিতে পারে; কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান না পাইলে যুদ্ধ করিতে তেমন সুযোগ পায় না। যে-সব দেশে পার্ব্বত্য নদী-নালা বেশী, সেই সব স্থানে কিন্তু আবার অশ্বারোহীদলেরই যুদ্ধ করিতে সুবিধা; কারণ সেখানে তাহারা নদী-নালা অনায়াসে পার হইয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত যে-সকল দেশে রাস্তাঘাটের তেমন সুবিধা নাই সে-সব দেশেও অশ্বারোহীদল যুদ্ধে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু যন্ত্রসজ্জার ফলে

যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহী দলের এখন আর তেমন গুরুত্ব নাই। অশ্বারোহীর স্থান আসিয়া দখল করিয়াছে আধুনিক সাঁজোয়া বাহিনী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্য নূতন সমরায়োজনের ফলে সমরকৌশলও



যুদ্ধরত পদাতিক সৈন্য

অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উন্মুক্ত প্রান্তরে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া মাঝে মাঝে পরিখা খনন করিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালাইত। বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যেরা সুবিধামত কখনও বা অগ্রসর হইত, আবার কখনও বা

পশ্চাদপসরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিত। এই ছিল স্থলযুদ্ধের সাধারণ রীতি। কিন্তু ট্যাঙ্কবাহিনীর উন্নতির ফলে এই যুদ্ধকৌশল অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে।

পোলাণ্ডের পতনের পর য়ুরোপে যে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাহাকে বলা যায় য়ুরোপের পাতাল-দুর্গমালা, অর্থাৎ একদিকে ফ্রান্সের 'মাজিনো লাইন' এবং অপর দিকে জার্ম্মানীর 'সিগফ্রীড লাইন'। দুই দিকের এই দুর্ভেদ্য দুই দুর্গমালার উপর কয়েক মাস য়ুরোপের ভাগ্য টলমল করে।

ফ্রান্সের মাজিনো লাইন বেলজিয়ম হইতে সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সমাধা হয়। অনবরত ১৫ হাজার লোক খাটিয়া এই কাজ সম্পন্ন করে।


অশ্বারোহী সৈন্য

মাজিনো লাইন স্থাপনের জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটার মাটি খনন করা হয়। ১৫ লক্ষ কিউবিক মিটার কংক্রীট এবং ৫০ হাজার টন ইস্পাতের পাত ইহাতে লাগে। ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটিয়া এই দুর্গমালা নির্ম্মাণ করা হয়। এই লাইন প্রস্তুত করিতে খরচ পড়ে প্রায় ৬০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮ শত কোটি টাকা। ইহার একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। জগতে সর্ব্ববৃহৎ রণতরী ছিল 'হুড'। সাধারণ একখানি ব্যাটল্‌শিপ নির্ম্মাণে যে খরচ পড়ে, একখানি 'হুড' শ্রেণীর রণতরী নির্ম্মাণে খরচ পড়ে প্রায়

তাহার দ্বিগুণ। মাজিনো লাইন নির্ম্মাণে যে অর্থব্যয় হইয়াছে তদ্দ্বারা একশতখানি 'হুড' শ্রেণীর রণতরী নির্ম্মাণ করা চলে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে জগতে যতগুলি অতিকায় রণতরী ছিল সেগুলি একত্র করিলে সংখ্যায় ষাট পঁয়ষট্টিখানির বেশী হইবে না। ইহা হইতেই বুঝা যায়, মাজিনো লাইন প্রস্তুতে কি বিপুল অর্থব্যয় হয়। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কোথায় কিভাবে ইহার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহার কিছুই সন্ধান পাইবার উপায় নাই। কামান পাতিবার জন্য ভূপৃষ্ঠে মাঝে মাঝে এমন সব সুদৃঢ় কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছে যেগুলি বোমা বা কামানের গোলায়ও বিধ্বস্ত হইবে না। তারপর ভিতরে এত সব সুব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের বিষবাষ্প প্রবেশ করিয়াও সেখানে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ভিতরে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে; বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে বাহিরের তুলনায় ভিতরের আবহাওয়ার কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে।



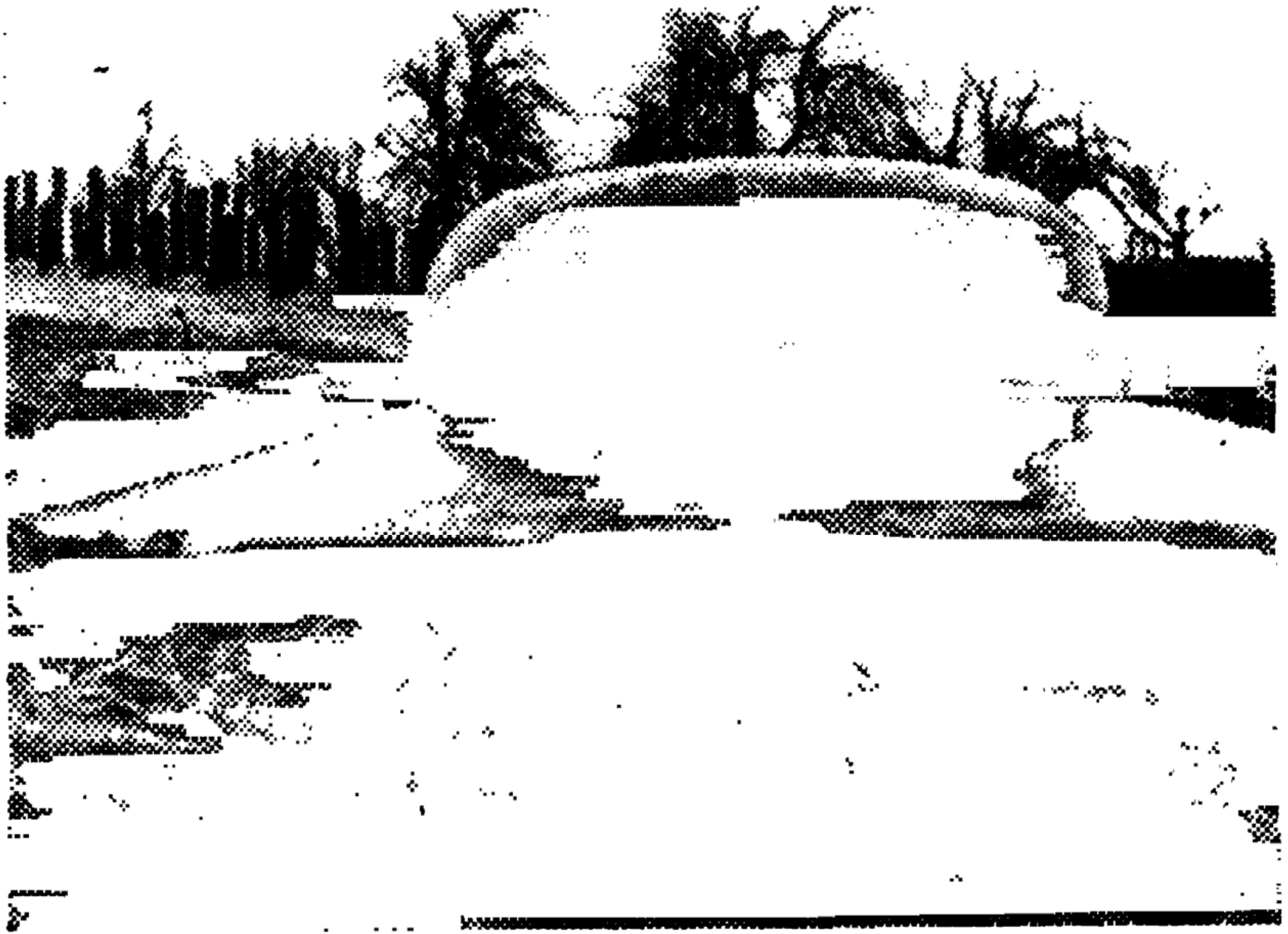
মেশিনগানধারী গোলন্দাজ সৈন্য

কেল্লাগুলির উপরে আছে দুর্ভেদ্য ঢাকনি, তাহার মধ্য দিয়া থাকে কামানের মুখগুলি বাহির করা। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুপক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া তদনুসারে কামান দাগিবার ব্যবস্থা আছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী এমনভাবে স্থাপিত যে, তাহা শত্রুপক্ষের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতে পারে না।

ভিতরে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। সমরনায়কগণ এই টেলিফোনেই যুদ্ধের নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। একটি লাইন খারাপ হইয়া গেলে পাছে অসুবিধা হয়, সেজন্য ডবল টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দুর্গের অভ্যন্তরে রেল রাস্তা পাতা হইয়াছে। রেলগাড়ী বাহির হইতে রসদ লইয়া একেবারে দুর্গের ভিতরে চলিয়া যায়। একতলা নয়—দুইতলা



ভূপৃষ্ঠের দুর্ভেদ্য কেল্লা

নয়; মাটি খুঁড়িয়া ছয়তলা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার কোথাও আছে সৈন্যদের থাকিবার স্থান, কোথাও আছে রন্ধনশালা—আবার কোথাও আছে বারুদখানা। আহত ও পীড়িত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালও দুর্গের অভ্যন্তরেই রহিয়াছে। এই পাতাল দুর্গে এমন সব ব্যবস্থা করা

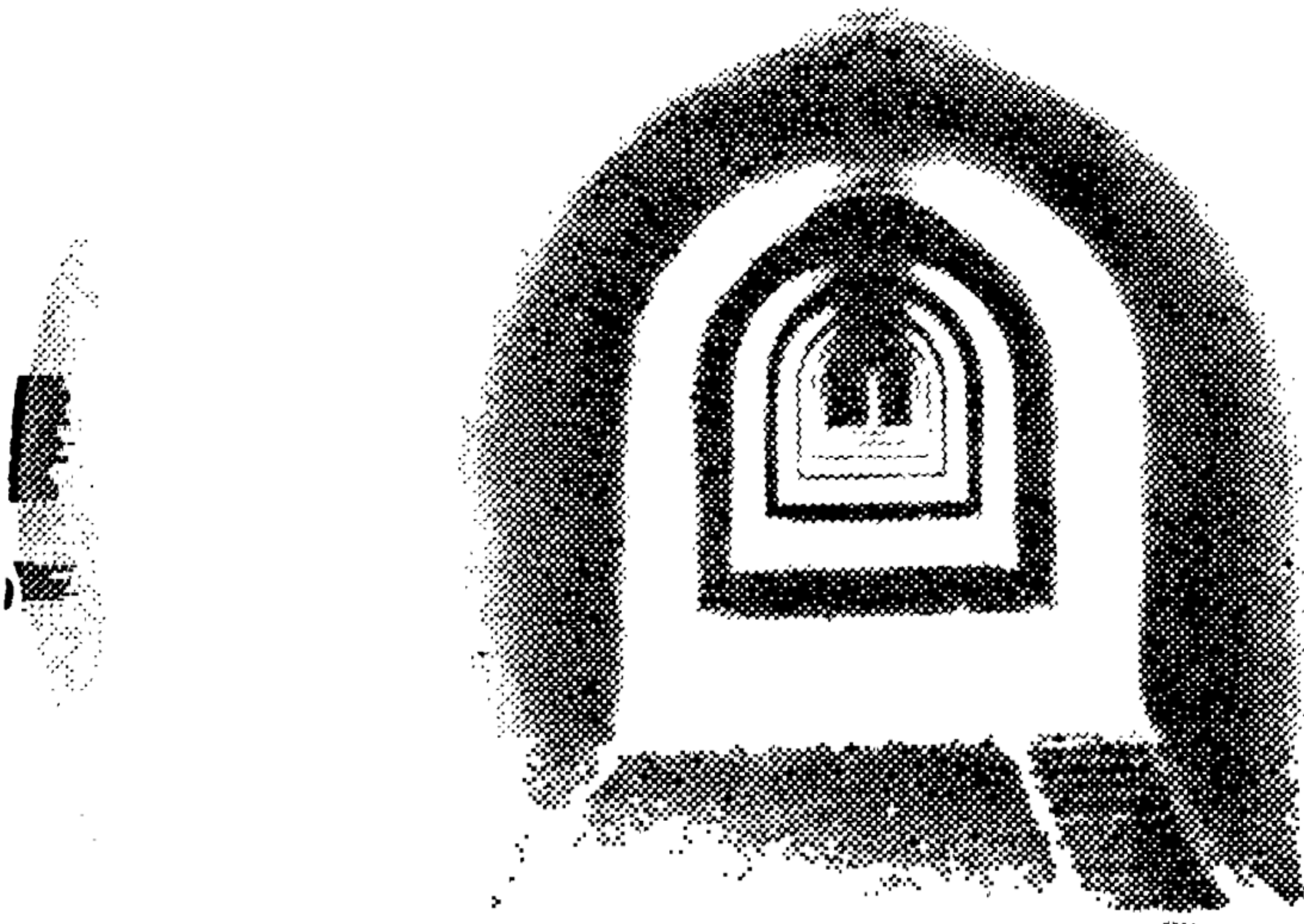
হইলে এবং সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে শত্রুপক্ষের স্থলপথে অগ্রগমন অবশ্যই প্রতিহত হইবে এই ছিল সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা। তাছাড়া হল্যাণ্ডে শত্রুপক্ষের পথরোধের আরও একটি ব্যবস্থা করা হয়। যে-পথে শত্রুসৈন্যের আসিবার সম্ভাবনা সেদিকে বড় বড় গাছগুলিতে ডিনামাইট বাঁধিয়া রাখা হয়। শত্রুপক্ষের আগমন বার্ত্তা পাইলে বৈদ্যুতিক তার-সাহায্যে সেই ডিনামাইট বিস্ফোরিত করার ব্যবস্থা থাকে। বিস্ফোরণের ফলে গাছগুলি মাটিতে পড়িয়া যাইবে এবং শত্রুপক্ষের তাহাতে অগ্রসর হইবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে এতদুদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রুমানিয়ায় সীমান্ত রক্ষার জন্য আবার এক অভিনব ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে শত শত মাইলব্যাপী এমন খাল কাটা হয় যাহা ভূগর্ভস্থ নল সাহায্যে যে কোন সময় তেলে ভরিয়া ফেলা যায়। সেই তেলভরা খালে আগুন লাগাইয়া দিলে যে অগ্নিগঙ্গার সৃষ্টি হইবে তাহা অতিক্রম করা শত্রুপক্ষের সত্যই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে, রুমানিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ এই ভাবিয়াছিলেন। রুমানিয়ায় যথেষ্ট তেল পাওয়া যায় বলিয়াই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

ফ্রান্সের অনুকরণে 'ম্যানারহাইম লাইন' দাঁড় করাইয়া ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তও সুরক্ষিত করা হয় এবং সেই বলেই রুশ-ফিন যুদ্ধে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণের প্রথম চোট সামলায়।

ফ্রান্সের মাজিনো লাইন এবং জার্ম্মানীর সিগফ্রীড লাইন স্থাপিত হইবার ফলে স্থলযুদ্ধের ভবিষ্যৎ লইয়া বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হয়। দুই পক্ষের এই দুর্গমালার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। এই দুই দুর্গমালা না থাকিলে হয়তো পোলাণ্ডের পতনের পরই সংবাদ আসিত, ফরাসী বাহিনী জার্ম্মানীতে প্রবেশ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, অথবা জার্ম্মান বাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু দুই দুর্গমালার অন্তরালে থাকিয়া উভয় পক্ষই কিছুকাল ইতস্ততঃ করিল। সকলেই তখন ভাবিল, এই স্বল্প পরিসর

স্থানেই হইবে য়ুরোপের যথার্থ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ভূগর্ভে ইস্পাত ও কংক্রীটে নির্ম্মিত এই দুর্গমালায় পদাতিক সৈন্যেরা আসিয়া কিভাবে আক্রমণ করিতে পারে তাহারও নানা



ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথ

পরিকল্পনা শুনা গেল। কেহ কেহ বলিল, ধূমজালের অন্তরালে থাকিয়া পদাতিক বাহিনী যদি কোন প্রকারে আসিয়া ভূপৃষ্ঠের ছোট ছোট কেল্লাগুলির মুখে পড়িতে পারে তবে ঐগুলির জানালা দিয়া তাহারা

ভিতরে হাতবোমা নিক্ষেপ করিতে পারিবে। ফলে কেল্লার অভ্যন্তরে গোলন্দাজ সৈন্যদের বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। কামান দাগিয়া দূরের জিনিসকেই বিনাশ করা যায়, হাতের কাছে কিছু করা যায় না। কাজেই বাহির হইতে বিপক্ষ আড়ালে থাকিয়া সুযোগমত গবাক্ষপথে হাতবোমা ছুঁড়িবার সুবিধা পাইবে এবং ভিতর হইতে তাহাদের উপর পাণ্টা আক্রমণ চালান কঠিন হইবে। বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তখন কেল্লার গবাক্ষপথ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ফলে বাহির হইতে দুর্গমধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। এতদুপরি যদি রসদ সরবরাহের পথও বন্ধ করা যায়, তবে দুর্গমধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া কিছু অসম্ভব নয়। এইভাবে দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়া রাখিতে পারিলে বিপদ যথেষ্টই হইতে পারে। অবশ্য বিপক্ষের গোলাগুলী অতিক্রম করিয়া পদাতিকবাহিনীর এরূপ অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন; কিন্তু একবার অগ্রসর হইতে পারিলে বিপক্ষকে কাবু করা মোটেই অসম্ভব হইবে না। পরিখা খনন করিয়া যেখানে যুদ্ধ হয় সেখানে শত্রুপক্ষের গোলাগুলী অতিক্রম করিয়া পদাতিক বাহিনীকে যাইয়া সঙ্গীন হস্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয় শত্রুপক্ষের উপর—আর মাজিনো লাইন বা সিগফ্রীড লাইনে আক্রমণ চালাইতে হইলে পদাতিক বাহিনীকে আসিয়া পড়িতে হইবে ঐভাবে শত্রুপক্ষের কেল্লামুখে। কিন্তু এই জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটাইয়া জার্ম্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিল ভিন্ন পথে। মাজিনো লাইনের দুর্ভেদ্য অঞ্চল এড়াইয়া জার্ম্মানরা উহার দুর্ব্বল স্থানগুলি দিয়া হানা দিল এবং তাহা ঠেকাইতে না পারিয়াই ফ্রান্স আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। অনেকে বলেন যে, ফ্রান্সের মাজিনো লাইন তৈয়ার করিতে যাওয়াই একটা মস্ত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারকগণ বলেন যে, মাজিনো লাইন প্রস্তুত করায় কোন দোষ হয় নাই; বরঞ্চ প্রথম দিকে জার্ম্মানদের আক্রমণ ঠেকাইতে তাহা বিশেষ সাহায্যই করিয়াছিল। মাজিনো লাইন প্রস্তুতের জন্য ফ্রান্সের পতন

হইয়া থাকিলে সিগফ্রীড লাইন প্রস্তুত করায় জার্ম্মানীরও পতন হইতে পারিত; কেন না সিগফ্রীড লাইনের জন্য জার্ম্মানীও কম খরচ করে নাই। আসল কথা হইল, ফরাসী রক্ষণশীল সমরনায়কগণ স্থিতযুদ্ধে বিশ্বাসী হইয়া আধুনিক গতীয় যুদ্ধের উপযোগী অতি দ্রুতগতিশীল সাঁজোয়া বাহিনী গঠনের দিকে সময় থাকিতে বেশী নজর না দেওয়ায়ই ফ্রান্সের এই দুর্গতি হয়। দ্রুত গতিশীল জার্ম্মান সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণমুখে মিত্রপক্ষের মন্থরগতি-সম্পন্ন স্থলসেনা বেসামাল হইয়া পড়ে এবং এক দিকে ঠেকাইতে গেলে অন্য দিক দিয়া জার্ম্মানরা জোয়ারের জলের মত প্রবেশ করে। ফ্রান্সের পতনের জন্য কেবল সে নিজেই দায়ী নয়; তাহার মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কেহই তখন যন্ত্রসজ্জায় জার্ম্মানীর সমকক্ষ ছিল না। সেইজন্যই ফ্রান্সের রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

ফ্রান্সের পতনের পর জার্ম্মানরা মাজিনো লাইনের বহু বড় কামান সরাইয়া পশ্চিম উপকূলে নিয়া বসায় এবং বৃটেন ও তাহার মিত্রশক্তিবর্গ পশ্চিমদিক হইতে ফ্রান্সে কখনও পাল্টা অভিযান চালাইলে যাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে মাজিনো লাইন ব্যবহার করা চলে, জার্ম্মানরা তেমন ব্যবস্থা করিয়া রাখে।

ঝটিতি-যুদ্ধ

সীমান্ত রক্ষার জন্য মাজিনো ও সিগফ্রীড লাইনের মত দুর্ভেদ্য দুর্গমালা প্রস্তুত এবং আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনী গঠন করিতে হইলে যে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়, তত অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য সকল দেশের নাই। মাজিনো লাইনের মত 'ম্যানারহাইম লাইন' ছিল বলিয়াই ফিনল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও প্রবল শক্তিশালী সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে যা হোক তবু কিছুকাল লড়িতে পারিয়াছিল; কিন্তু তেমন কোন সুরক্ষিত সীমান্ত না থাকায়

কয়েকদিনের মধ্যেই পোলাণ্ডকে জার্ম্মানীর কবলিত হইতে হয়। পোলাণ্ডের সৈন্যবল যে নিতান্ত কম ছিল এমন নয়, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় জার্ম্মানীর তুলনায় সে ছিল অনেকখানি নিকৃষ্ট। এই জন্যই জার্ম্মান বাহিনীর ঝটিতি-যুদ্ধের মুখে সে দাঁড়াইতে পারে নাই। সুরক্ষিত সীমান্ত এবং যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী থাকিলে বোধ হয় জার্ম্মানীর আক্রমণে পোলাণ্ডকে এত শীঘ্র পরপদানত হইতে হইত না। কাজেই দেখা যায়, বর্ত্তমান যুগে সুরক্ষিত সীমান্ত এবং যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী না থাকিলে কোনও প্রবল রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে প্রতিবেশী দুর্ব্বল রাষ্ট্রের রক্ষা পাওয়া কঠিন।

জার্ম্মানী পোলাণ্ড দখলে যে যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে তাহাকে বলা হয় 'ব্লিৎসক্রীগ' বা ঝটিতি-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের কৌশল হইল এই যে, আক্রমণকারীরা এত দ্রুত গতিতে যুদ্ধ চালাইবে যে, আক্রান্ত পক্ষ আত্মরক্ষার জন্য ভালমত অবসরই পাইবে না। কোনও দুর্ব্বল রাষ্ট্রের পক্ষে বহু অর্থব্যয়ে সীমান্ত সুরক্ষিত করাও যেমন কষ্টকর, তেমনই সীমান্তে সর্ব্বদা বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা ও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। কাজেই কোনও প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র যখন অকস্মাৎ সীমান্তে হানা দিয়া বসে, তখন আক্রান্ত পক্ষ না পারে তাড়াতাড়ি সীমান্তে সৈন্য পাঠাইয়া বাধা দিতে—না পারে আত্মরক্ষার জন্য অভ্যন্তরে থাকিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে। যুদ্ধের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষ আসিয়া তাহাদের দুয়ারে হানা দেয়। সেই অবস্থায় প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের আত্মসমর্পণ বা মৃত্যুবরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

জনৈক সমর বিশেষজ্ঞের একটি পরিকল্পনা হইতে ঝটিতি-যুদ্ধের কিছু নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। পরিকল্পনাটি এই :—মনে করুন, দুইটি রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রবাহিত একটি নদী। প্রবল পক্ষ একদিন অকস্মাৎ নদীর এপার হইতে ওপারে অবস্থিত বিপক্ষের কেল্লাগুলির উপর করিল ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ। কামান দাগিয়া তাহারা দিঙমণ্ডল ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে

আক্রমণকারীরা আধুনিক কায়দায় নদীর উপর চটপট ভাসমান সেতু প্রস্তুত করিয়া লইল। ধূমজালে গা ঢাকা দিয়া সেতুর উপর দিয়া আক্রমণকারীদের পদাতিক ও ট্যাঙ্কবাহিনী ওপারে চলিয়া গেল।



কৃত্রিম ডালপালায় সজ্জিত রসদবাহী অশ্ব। বিপক্ষের বৈমানিকদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হয়

যে-সকল ট্যাঙ্ক অতি গুরুভার সেইগুলি পার করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইতে থাকিল। আক্রমণকারীরা পার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, বিপক্ষের কেল্লাগুলি হইতে আর কোন কামান গর্জ্জে না—অর্থাৎ কামান দাগিবার জন্য সেখানে আর কেহ নাই। আক্রমণকারীরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া এমন স্থানে উপস্থিত হইল যেখানে আধুনিক যুদ্ধের আয়োজন—যেমন

পরিখা, কাঁটাতারের বেড়া, ট্যাঙ্ক ফেলিবার ফাঁদ প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ করিবার বড় বিশেষ কেহ নাই। অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য আক্রান্ত রাষ্ট্র প্রস্তুত ছিল না ; কাজেই তাহার সৈন্যসামন্ত আসিয়া তখনও সেখানে পৌছিতে পারে নাই। আক্রমণকারীদের বোমারু বিমানগুলি ততক্ষণ আগাইয়া গিয়া বোমা ফেলিয়া চালাইল প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা। উপর হইতে বোমাপতন, নীচ হইতে গোলাবর্ষণ—এই যুগপৎ আক্রমণে ঘাঁটিগুলি রক্ষার জন্য যে সামান্য সংখ্যক রক্ষী ছিল তাহারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। ইতিমধ্যে প্রবল পক্ষের উন্নত যন্ত্রসজ্জার ফলে নূতন সমরসম্ভার ও সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। আক্রমণকারীরা তখন নূতন উদ্যমে বিপক্ষের প্রধান ঘাঁটিগুলি দখল করিরা লইল এবং বোমারু পাঠাইয়া রাজধানীর উপর আক্রমণ চালাইল। আক্রান্ত রাষ্ট্রের সমরনায়কগণ তখন বেগতিক দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য পরিখাদি খনন করিয়া নূতন ব্যূহ-রচনায় বাধ্য হইলেন। একে সমরসজ্জায় নিকৃষ্ট, তদুপরি সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি শত্রুর হস্তগত—এ অবস্থায় তাড়াহুড়ার মধ্যে প্রস্তুত নূতন ব্যূহে থাকিয়া প্রবল পক্ষকে বাঁধা দেওয়া বেশীদিন সম্ভব হইল না। কাজেই অতি অল্পেই তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইতে হইল। রাজধানী বা কোন প্রধান দুর্গকে আশ্রয় করিয়া আক্রান্ত পক্ষ আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করিল ; কিন্তু বিপক্ষের গোলন্দাজ, পদাতিক ও বিমান-



কৃত্রিম ডালপালা লাগান শিরস্ত্রাণ পরিহিত সৈনিক

বাহিনী চারিদিক হইতে বেড়াজালের মত তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নির্ব্বিচারে ধ্বংসলীলা চালাইল। নগরের চারিদিক অবরুদ্ধ—রসদ বন্ধ—পানীয় জলের অভব—অবাধ হত্যাকাণ্ড—অনশন—মহামারী—সর্ব্বত্র মহা-শ্মশানের বীভৎস দৃশ্য—দুর্ব্বলের পরাজয়—প্রবলের কণ্ঠে জয়োল্লাসের মহারোল। ঝটিতি-যুদ্ধের এইখানেই যবনিকাপাত।

বলা বাহুল্য, এক পক্ষ যেখানে দুর্ব্বল সেখানেই ঝটিতি-যুদ্ধের দ্বারা আশু সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। দুই পক্ষ যেখানে সামরিক বল ও রণকৌশলে সমান সেখানে যে ঝটিতি-যুদ্ধে বিশেষ ফল লাভ হয় না, রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধেই তাহা ভালভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

স্থলসেনার গঠন

এইবার সৈন্যদলের গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। স্থলযুদ্ধে ডিভিসনের কথা আজকাল অহরহই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধে ডিভিসনকে ডিভিসন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া খবর আমরা সচরাচরই পাই। খবর পড়িয়া ডিভিসন নামটির সহিত আমাদের যতটা সহজ পরিচয় হইয়াছে, উহার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা ততটা সচেতন কিনা সন্দেহ। যুদ্ধের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতার ফলে অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, দুই এক ডিভিসন সৈন্য ধ্বংস হওয়াটা যেন সংবাদপত্রপাঠকদের নিকট আজকাল আর তেমন একটা বড় খবর নয়। কিন্তু যুদ্ধ যাঁহারা করেন এবং একটি ডিভিসন সম্বন্ধে যাঁহাদের সম্যক ধারণা আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—একটি ডিভিসন গড়িয়া তোলা কি আয়াস ও ব্যয়সাধ্য এবং উহা ধ্বংস হওয়া কতখানি ক্ষতিকর।

ডিভিসনের গঠন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই প্রথমে সৈন্যচালনার সুবিধা অসুবিধার কথা ওঠে। যুদ্ধসময়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও শান্তির সময়েই

কোন দেশের যদি পাঁচ লক্ষ সৈন্য থাকে তবে এক স্থান হইতে উহার রসদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধের সময় তো কথাই নাই। প্রতিপক্ষের আক্রমণে সমস্ত সরবরাহের ব্যবস্থাই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং তাহাতে যে বিপদ ঘটে উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। কাজেই সৈন্যগণকে বিভক্ত করিয়া এমন ভাবে দল গঠন করা দরকার যাহাতে ঐভাবে সমস্ত সৈন্যের বিপদ একসঙ্গে না আসিতে পারে এবং যুদ্ধ চালাইতেও সুবিধা হয়। সেই দলই হইল ডিভিসন। এই দলগুলিকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র স্থলসেনা গড়িয়া উঠে।

একটি ডিভিসন স্বতন্ত্র ভাবেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম। উহাতে যুদ্ধের সকল প্রকার অস্ত্রই থাকে এবং উহার সরবরাহের ব্যবস্থাও নিজস্ব। উহাকে একটি ছোটখাট 'আর্মি' বলিলেই চলে। নিজ রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালাইবার জন্য অন্য কোন বাহিনীর উপর উহাকে নির্ভরশীল হইতে হয় না। উহার পার্শ্ববর্ত্তী একটি ডিভিসন একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহাও যে যুদ্ধশক্তি হারাইবেই বা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে এমন নাও হইতে পারে। সৈন্যসংখ্যা যেখানে খুব বেশী সেখানে দুই বা তিন ডিভিসন লইয়া এক একটি 'আর্মি কোর' গঠিত হয়। তার চেয়ে আরও বেশী সৈন্য যেখানে একসঙ্গে নিয়োগ করা দরকার সেখানে দুই বা তিন আর্মি কোর লইয়া এক একটি 'আর্মি' গঠিত হয়।

এক একটি ডিভিসনে আজকাল অফিসার ও অন্যান্যে মিলিয়া অন্ততঃ ১২ হাজার লোক থাকে। লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নয়—স্থানবিশেষ ইহার বেশীও থাকে। কোথায় এবং কি অবস্থায় যুদ্ধ করিতে হইবে তাহারই উপর ডিভিসনের লোকসংখ্যা নির্ভর করে। যে-কোন ক্ষেত্রেই লোকসংখ্যার চাইতে অস্ত্রশস্ত্রের উপর ডিভিসনের রণসামর্থ্য নির্ভর করে বেশী। যন্ত্রসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতির ফলে আগের তুলনায় এখন কম লোক লইয়া ডিভিসন গঠিত হয় এবং যাহাদের অস্ত্র যত উন্নত তাহাদের ডিভিসনে লোক তত

কম। লোক কম হইলেও আধুনিক ডিভিসনগুলির রণসামর্থ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। রণসামর্থ্য হ্রাস না করিয়া ডিভিসনের লোক যত



পার্ব্বত্য নদী অতিক্রমের মহড়ায় পদাতিক সৈন্যগণ

কমান যায় ততই সুবিধা। কেন না, লোক বেশী থাকিলেই রসদ সরবরাহে অসুবিধা এবং প্রতিপক্ষের গোলাগুলীতে হতাহতের সংখ্যা বেশী হইবার সম্ভাবনা।

আগেই বলা হইয়াছে যে, কোথায় কি ধরনের যুদ্ধ করিতে হইবে তাহার উপর ডিভিসনের গঠনপদ্ধতি নির্ভর করে। কোন দেশে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে ডিভিসন গঠিত হইবে, বাহিরে অভিযাত্রী বাহিনী পাঠাইতে হইলে তাহার ডিভিসন নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে না। তারপর যে দেশে রাস্তাঘাটের একান্ত অভাব এবং বেশীর ভাগই পার্ব্বত্য অঞ্চল সেখানে চলাচলে যে অসুবিধা, সমতলক্ষেত্রে এবং ভাল রাস্তাঘাটবিশিষ্ট এলাকায় সেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কাজেই এই দুই অঞ্চলে যুদ্ধচালনার জন্য ডিভিসন গঠনে পার্থক্য হইতে বাধ্য। অরণ্যপ্রধান অঞ্চলের জন্য ডিভিসন গঠনের সময় নিশ্চয়ই উন্মুক্ত প্রান্তরের ডিভিসনের চেয়ে কম সংখ্যক ট্যাঙ্ক দেওয়া হইবে। এই সব হিসাব ছাড়া আজকাল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ডিভিসন গঠিত হয়, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন মত তাহার রদবদলও হয়। দুই শ্রেণীর ডিভিসনের মধ্যে এক শ্রেণীর ডিভিসনগুলিকে বলা হয় মোটরসজ্জিত ডিভিসন এবং ঐগুলি প্রধানতঃ হাল্‌কা মেশিনগানের উপর নির্ভরশীল। আর এক শ্রেণীর ডিভিসনগুলি প্রধানতঃ ট্যাঙ্ক লইয়া গঠিত এবং এইগুলিকে বলা হয় যন্ত্রসজ্জিত সাঁজোয়া বাহিনী। প্রথমোক্ত ডিভিসনগুলি দ্রুতগতিশীল আর শেষোক্ত ডিভিসনগুলি বন্ধুরপথেও যাইতে সক্ষম। উভয় প্রকার ডিভিসনই আর্ম্মির নানা শ্রেণীর সৈন্য লইয়া গঠিত। ক্যাভাল্‌রী (আগে ক্যাভাল্‌রী বলিতে অশ্বারোহী দলকেই বুঝাইত, আজকাল ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনীকেও ক্যাভাল্‌রীই বলা হয়), গোলন্দাজ, এঞ্জিনিয়ার, পদাতিক, মেডিক্যাল কোর, আর্ম্মি অর্ডনান্স কোর (অস্ত্র সরবরাহ বাহিনী), আর্ম্মি ভেটেরিনারী কোর (পশু চিকিৎসক বাহিনী), সিগন্যাল কোর, সামরিক পুলিশ প্রভৃতি বিভিন্ন দল লইয়া একটি ডিভিসন গঠিত হয়। তাহাতেই বুঝা যায়, রণক্ষেত্রে উহার কাজ কত ব্যাপক এবং কি ভাবে উহা আত্মনির্ভরশীল। ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন শাখা রেজিমেণ্ট হিসাবে গঠিত হয় এবং কোন কোন শাখা

'কোর' হিসাবে গঠিত হয়। ডিভিসনে অতি অধুনা যে-সকল শাখা যুক্ত হইয়াছে সেইগুলি 'কোর' হিসাবেই গঠিত।

প্রত্যেক ডিভিসনেই যোদ্ধা ও অযোদ্ধা আছে। যার যার কাজ নির্দ্দিষ্ট এবং একের চেয়ে অন্যের কাজ যে তুচ্ছ এমন নয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় একটি ডিভিসন পূর্ণ রণসামর্থ্য লাভ করে। অনেক অযোদ্ধাকেও এমন বিপদের মধ্যে কাজ করিতে হয় যাহা ধারণাতীত এবং জরুরী অবস্থায় অনেক সময় অযোদ্ধাকেও যুদ্ধ করিতে হয়।

আজও স্থলসেনার মেরুদণ্ড পদাতিক বাহিনী। ট্যাঙ্ক বা গোলন্দাজ বাহিনীর চেষ্টায় কোনও স্থান হইতে যখন প্রতিপক্ষ বিতাড়িত হয় তখন একমাত্র পদাতিক বাহিনীর পক্ষেই গিয়া সেই স্থান দখল এবং রক্ষা করা সম্ভব। তাহারা তাহা না করিতে পারিলেই ডিভিসনের অন্যান্য শাখার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। মোটরসজ্জা হওয়া সত্ত্বেও পদাতিক বাহিনীকে যুদ্ধের সময় পায়ে দাঁড়াইয়াই লড়িতে হয়; রণক্ষেত্রে মোটরযানে করিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয় মাত্র। মোটরসজ্জার ফলে আগের মত পায়ে হাঁটিয়া তাহাদিগকে মার্চ্চ করিতে হয় না; তবে দুর্গম অঞ্চলে আজও সেই পন্থার অনুসরণ ছাড়া উপায় নাই।

মোটরসজ্জিত পদাতিক বাহিনীতে সৈন্য ও রসদচালানের জন্য সাধারণতঃ মোটরগাড়ী, ট্রাক ও মোটরলরী ব্যবহৃত হয়। ট্রাকগুলিতে জন আটেক এবং বড় লরীগুলিতে জন ত্রিশেক পর্য্যন্ত লোক তাহাদের পুরা অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া যাইতে পারে।

জার্ম্মানীর দুই প্রকার যন্ত্রসজ্জিত ডিভিসন আছে। এক প্রকার হইল 'লাইট ডিভিসন' এবং আর এক প্রকার হইল 'পানৎসার ডিভিসন' বা সাঁজোয়া ডিভিসন। লাইট ডিভিসনগুলিতে সাধারণতঃ মোটর সাইকেলারোহী সেনা, মেশিনগানধারী সেনা, হাল্‌কা ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত পদাতিক সেনা থাকে। আর 'পানৎসার' বা সাঁজোয়া ডিভিসনে থাকে ছোট, বড়,

মাঝারি সকল প্রকার ট্যাঙ্ক, ভারী গোলান্দাজ বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ী এবং স্থলযুদ্ধের আনুসঙ্গিক অন্যান্য অস্ত্র। শত্রুর ব্যূহভেদে জার্ম্মান পানৎসার বাহিনী অদ্বিতীয়।

ডিভিসনের ভিত্তিতে যেমন 'আর্ম্মি' গড়িয়া ওঠে, তেমনি মোটরসজ্জিত পদাতিক বাহিনী গড়িয়া ওঠে প্ল্যাটুনকে ভিত্তি করিয়া। প্ল্যাটুনের বড় কোম্পানী, কোম্পানীর বড় ব্যাটেলিয়ন এবং ব্যাটেলিয়নের বড় রেজিমেণ্ট। পদাতিক বাহিনীতে রেজিমেণ্টের গঠন কেবল দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, কার্য্যতঃ যুদ্ধকালে রেজিমেণ্ট হিসাবে যুদ্ধ করা হয় না।

আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রমণের সময় ট্যাঙ্ক বাহিনী পদাতিক বাহিনীর আগে গিয়া যুদ্ধ করে এবং গোলন্দাজ বাহিনী সাধারণতঃ পশ্চাতে থাকিয়া দূর পাল্লার কামানসাহায্যে ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর কাজে সহায়তা করে। এ ছাড়া অযোদ্ধ, বাহিনীর নানা শাখা ডিভিসনে থাকিয়া সাহায্য করে আগেই বলিয়াছি। ডিভিসনের বিভিন্ন শাখার কার্য্যের ফিরিস্তি দিতে হইলে প্রসঙ্গ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদল-গুলিতে নীচের দিক হইতে ধরিয়া উপরের দিকে গেলে কোন্ অফিসারের উপর কোন্ দলের নায়কত্ব সাধারণতঃ অর্পিত হয় তাহা সংক্ষেপে বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। পদাতিক বাহিনীতে প্ল্যাটুন অফিসারের উপরেই থাকে ক্যাপ্টেনের স্থান, তিনি কোম্পানীর অধিনায়কত্ব করিয়া থাকেন। ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল এবং রেজিমেণ্টের অধিনায়ক কর্ণেল। ক্যাভালরীতে স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক মেজর বা ক্যাপ্টেন এবং রেজিমেণ্টের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল। গোলন্দাজ বাহিনীতে ব্যাটারীর অধিনায়ক মেজর এবং ব্রিগেডের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল।

আগেই বলিয়াছি, ক্ষেত্র বুঝিয়া ডিভিসনের রূপ-পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই জন্যই বিভিন্ন দেশের ডিভিসন গঠনে অল্পবিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। তবে মূল কাঠামো প্রায় একই।

গোলন্দাজ ও পদাতিক

প্রথমেই বলা দরকার যে, ট্যাঙ্কধ্বংসী এবং বিমানধ্বংসী বাহিনীও আধুনিক গোলন্দাজ বাহিনীরই অন্তর্গত। আধুনিক গোলন্দাজ বাহিনার কামানগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। বড়, মাঝারি ও ছোট। গোলন্দাজ বাহিনীর ছোট কামানগুলিকে সাধারণতঃ 'ফিল্ড আর্টিলারী' বলা হয়। ১৮ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি এবং নূতন ধরণের ১৪ ইঞ্চি মুখের (ব্যাস) কামান ও ৯·২ ইঞ্চি এবং ৮ ইঞ্চি মুখের হাউইটজারগুলিকে বড় কামানশ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়; এইগুলির কোন কোনটি হইতে বিশ মাইল পর্য্যন্ত গোলা যায়। নৌবাহিনীতেই বড় কামানগুলির ব্যবহার হয় বেশী; তবে উপকূলরক্ষী কামানের পাল্লাও কম থাকে না। স্থলযুদ্ধে এখন দূর পাল্লার কামানগুলির স্থান আসিয়া দখল করিয়াছে বোমারু বিমান। তাই বলিয়া স্থলযুদ্ধে বড় কামানের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এমন নয়; কিন্তু বোমারু বিমানের আবির্ভাবে পূর্ব্বের তুলনায় ঐগুলির গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই দূর হইতে বড় কামান না দাগিয়া আজকাল তৎপরিবর্ত্তে বোমারু বিমান আকাশে ব্যারেজ বা আচ্ছাদন সৃষ্টি করে এবং তাহার অন্তরালে স্বপক্ষের পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হয়। এখন বোমারু বিমানগুলি আগাইয়া গিয়া বিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগেও আক্রমণ চালায়।

মাঝারি কামানগুলির পর্য্যায়ে পড়ে ৪·৭ ইঞ্চি মুখের ৬০ পাউণ্ড ওজনের গোলাবর্ষী কামান ও ৬ ইঞ্চি গোলাবর্ষী হাউইটজারগুলি। এই সব কামানের পাল্লা ১০ হাজার হইতে ২১ হাজার গজ পর্য্যন্ত। ১৮ পাউণ্ড ওজনের গোলা-বর্ষী এবং নূতন ধরণের ২৫ পাউণ্ড ওজনের গোলবর্ষী কামানগুলি 'ফিল্ড আর্টিলারী' অর্থাৎ ছোট কামানশ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। ঐগুলির গোলা ১৪ হাজার গজ পর্য্যন্ত যায়।

আগের দিনে বড় কামানগুলি এক স্থানে বসাইয়া গোলা দাগা হইত;

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া সেইগুলির সাহায্যে যুদ্ধ করা কঠিন ছিল। ফিল্ড গানগুলি ঘোড়ায় টানিত ; তাও দুই টনের বেশী ওজন হইলে রণাঙ্গনে টানাটানি করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। একটু বড় কামান হইলেই স্পেশ্যাল ট্রাকে বসাইয়া রেলওয়ে হইতে তাহা ব্যবহার করিতে হইত। কাজেই বড় কামানগুলি যত্রতত্র ব্যবহার করা চলিত না। কিন্তু এখন যন্ত্রসজ্জার ফলে শক্তিশালী ট্র্যাক্টরে চাপাইয়া বড় কামানগুলিকে রণক্ষেত্রের দুর্গম অঞ্চলেও লইয়া যাওয়া হয়।

বিমানধ্বংসী কামান ও ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের কথা প্রসঙ্গান্তরে বলা হইয়াছে। এইবার পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। পদাতিক সেনার প্রধান অস্ত্র হইল রাইফেল, ৩ ইঞ্চি মুখের মর্টার কামান, বড় মেশিনগান, লাইট মেশিনগান, রাইফেল গ্রিণেড, হাতবোমা এবং রিভলবার। ছয় গুলীবর্ষী রিভলবার একেবারে কাছাকাছি যুদ্ধে সৈন্যেরা ব্যবহার করে। সেইগুলিকে সৈন্যদের ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অস্ত্র বলিলেও চলে। কার্য্যতঃ রাইফেলই হইল স্থলসেনার প্রধান অবলম্বন। রাইফেল সাহায্যে নির্ভুল লক্ষ্যভেদে খুবই সুবিধা। উহার পাল্লা সাধারণতঃ হাজার গজের মধ্যেই ধরা হয় ; তার বেশী দূরে লক্ষ্যভেদে সুবিধা হয় না। হাজার গজ পৌঁছিতে রাইফেলের গুলী বড় জোর ৪ সেকেণ্ড সময় নেয়। নির্ঘাত লক্ষ্যভেদের পাল্লা আরও কম—ছয় শত গজের কাছাকাছি। রাইফেলের গুলী উপরে না উঠিয়া সোজাসুজি ছোটে। মাটিতে শুইয়া কেহ রাইফেলের গুলী ছুঁড়িলে ছয় শত গজের মধ্যে তাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ছয় ফুটের বেশী উপরে ওঠে না। কাজেই ছয় শত গজের মধ্যে কেহ দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে তাহাকে গুলীবিদ্ধ হইতেই হইবে। ছয় শত গজের বাহিরে গুলী ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেকখানি উপরে উঠিয়া যায়, কাজেই শত্রুনিধনে এই অস্ত্র আর সেখানে তেমন কার্য্যকরী হয় না। অবশ্য রাইফেলের গুলী ২৮ শত গজ পর্য্যন্তও যাইতে পারে, কিন্তু অতখানি দূরে যাইতে যাইতে গুলী ভূপৃষ্ঠ



একটি অতিকায় কামানে গোলা ভরা হইতেছে

হইতে প্রায় সাত শত ফুট উর্দ্ধে ওঠে এবং পথ অতিক্রমে প্রায় দশ সেকেণ্ড কাল কাটিয়া যায়। কাজেই পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধে উহা কোন কাজে আসে না। এক প্রতিপক্ষের বিমান 'গ্রাউণ্ড ষ্ট্রেফিং' করিতে আসিলে কোন কোন সময় এই দূর পাল্লায় গুলীবর্ষণ করিয়া রাইফেলধারীরা সফলকাম হয়।

রাইফেল হইতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে পাঁচটি গুলী ছোঁড়া যায়। তবে হাত পাকা হইলে মিনিটে পনরটি পর্য্যন্ত গুলী ছোঁড়াও সম্ভব। রাইফেলের গুলীতে আধুনিক ভারী ট্যাঙ্কগুলির বর্ম্ম ভেদ করা না গেলেও এক সঙ্গে গুলী ছুঁড়িয়া অনেক সময় ট্যাঙ্কের অগ্রগতি রোধ করা যায়; কারণ রাইফেলের গুলীতে ট্যাঙ্কের কোন কোন অংশ বিকল করিয়া দেওয়া সম্ভব।

রাইফেলের পরই বলা যায় মেশিনগানের কথা। তবে রাইফেলের মত মেশিনগান পদাতিকদের একান্ত সহচর নয়; কারণ ঐগুলি ব্যবহারে কিছু অসুবিধা আছে বড় মেশিনগানগুলিকে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি হইতে আড়ালে রাখা অনেক সময়ই কঠিন হইয়া পড়ে; তাছাড়া দুইজনের কম উহা বহন করিতে পারে না। এই অসুবিধার জন্যই অটোমেটিক রাইফেল বা লাইট মেশিনগান আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমে যে বৃটিশ লাইট মেশিনগান তৈয়ারী হয় তাহার নাম 'লুইস গান'। এক একটি লুইস গান প্রস্তুতে খরচ পড়ে প্রায় আট নয় শত টাকা। এইগুলি সহজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। কেবল পদাতিক সৈন্যেরাই এইগুলি ব্যবহার করে এমন নয়, বিমানেও এইগুলি বসান হয়। ইহার গুলীর কক্ষে ৪৭টি গুলী থাকে। প্রয়োজন হইলে একটি কিংবা একে একে কয়েকটি অথবা ক্রমাগত সমস্ত গুলীই বর্ষণ করা চলে। কার্ত্তুজের গ্যাসে একটি পিষ্টন পিছনের দিকে চলিয়া যায় এবং পরবর্ত্তী গুলীটি আনিয়া ঠিক স্থানে বসায়। কাজেই গুলী ভরার কাজ অটোমেটিক অর্থাৎ একটি গুলী ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুলী আসিয়া সেখানে হাজির হয়।

বৃটেনের অতি আধুনিক মেশিনগান হইল 'ব্রেন গান'। লুইস গান

হইতেও এইগুলি হাল্‌কা এবং নাড়াচাড়া করিতে বেশী সুবিধা। সমতল ক্ষেত্রে, পরিখায়, ট্যাঙ্কে এবং ট্যাঙ্ক ও বিমান ধ্বংসে সর্ব্বত্রই ব্রেন গান ব্যবহার করা চলে। মাত্র একটি গুলী ছোঁড়াও যেমন যায়, তেমনই পর পর অনেক-গুলি গুলী ছোঁড়াও চলে। ক্রমাগত গুলী ছুঁড়িতে হইলে চার জনের দরকার।



গোলন্দাজ সৈন্যগণ মেশিনগান দাগিতেছে

একজন গুলী ছুঁড়িবে, একজন পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং দুইজন গুলী বারুদ যোগাইবে। ব্রেন গানের কক্ষে ত্রিশটি গুলী থাকে। তাক করিয়া মিনিটে সাধারণতঃ দেড় শত হারে গুলী ছোঁড়া যায়। এক একটি ব্রেন গানের ওজন

২১ পাউণ্ড অর্থাৎ সের দশেক। লুইস গানের ওজন ইহাপেক্ষা সের তিনেক বেশী। ৬০০ গজের মধ্যে ব্রেন গানের গুলী নির্ঘাত লক্ষ্য ভেদ করে। সাধারণ বন্দুকের ন্যায় হাতে রাখিয়াও এইগুলি দাগা যায়, আবার দ্বিপায়া কি তেপায়ার উপর বসাইয়াও গুলী ছোঁড়া চলে। সাধারণতঃ বিমানধ্বংসী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের সময়ই মুখ উঁচু করার জন্য ইহা দ্বিপায়া কি তেপায়ার উপর বসান হয়। মাত্র একজনে চালাইতে পারে বলিয়া ব্রেন গানের ব্যবহার এখন একরূপ রাইফেলের মতই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রেন গানকে বায়ুর দ্বারা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আছে। তবে ক্রমাগত গুলীবর্ষণের ফলে যখন ব্যারেল অত্যন্ত গরম হইয়া ওঠে তখন কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্রেন গানের ব্যারেল বদলান চলে। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও গুণ এই যে, গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসে ব্যারেলের অভ্যন্তর সাফ হইয়া যায় এবং অন্যান্য কামানবন্দুকের ন্যায় ইহার মুখে আগুনের ঝলক দেখা দেয় না। নলের মাথায় বলের মত ধাতু নির্ম্মিত একটি জিনিস বসান থাকে এবং উহাই আগুনের ঝলক ঢাকিয়া রাখে, অথচ উহার ভিতর দিয়া অনায়াসে গুলী বাহির হইয়া যায়। এই আগুনের ঝলক ঢাকা পড়ায় ব্রেন গান ব্যবহারে সুবিধা হইয়াছে এই যে, প্রতিপক্ষ বুঝিতে পারে না কোথা হইতে গুলী বর্ষিত হইতেছে।

লাইট মেশিনগান বাহির হওয়ায় পদাতিক বাহিনীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে; তবে একথা মনে করার কোন কারন নাই যে, এইগুলির আমদানীতে ভারী মেশিনগানের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। আগাইয়া গিয়া আক্রমণের সময় ট্রাকবাহিত ভারী মেশিনগান খুবই দরকারে আসে। তারপর আত্মরক্ষায়ও প্রতিপক্ষ খুব কাছে আসিয়া পড়িলে মুহুর্মুহু গুলীবর্ষণের দ্বারা তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতে হইলে ভারী মেশিনগানেরই দরকার। একটি ভারী মেশিনগান হইতে গুলীবর্ষণ করিয়া সামনে প্রায় পঞ্চাশ গজ প্রস্থ রণাঙ্গন রক্ষা করা যায়। কাজেই চারিটি মেশিনগানের একটি প্ল্যাটুন

প্রায় দুই শত গজ প্রস্থ রণাঙ্গন রক্ষায় সক্ষম। বড় মেশিনগান হইতে মিনিটে ২৫০টি পর্য্যন্ত গুলী ছোঁড়া যাইতে পারে।

পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতিতে আর এক শ্রেণীর অস্ত্র বিশেষ সাহায্য করে। এইগুলিকে বলা হয় 'মর্টার'। ৩ ইঞ্চি মুখের মর্টারগুলি হইতে প্রায় দশ পাউণ্ড ওজনের গোলা ১৫ শত গজ দূরে গিয়া পড়ে। মর্টার চালান সহজ এবং স্থানান্তরেও সুবিধা। এক মিনিটে প্রায় ৪০টি গোলা দাগা যায়। অনেক সময় ছোট ট্যাঙ্কে করিয়া এইগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। প্রতিপক্ষের কাঁটা তারের বেড়া ভাঙ্গিয়া প্রবেশ এবং পরিখা ও মেশিনগানের আস্তানা হইতে প্রতিপক্ষকে বিতাড়িত করিতে মর্টারগুলি খুবই সাহায্যে আসে। খুব মজবুত বাড়ী ভাঙ্গিতে না পারিলেও মর্টারের গোলা অনেক সময় বাড়ীর ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পরিখায় পড়িয়া এমন ভীষণ ভাবে বিদীর্ণ হয় যে, প্রতিপক্ষ তাহাতে বিষম কাহিল হইয়া পড়ে। আকারে ছোট হওয়ায় এবং স্থানান্তরে সুবিধা থাকায় রাইফেল ব্যাটেলিয়নকে দ্রুত সাহায্য করার পক্ষে মর্টারগুলি বিশেষ উপযোগী। কামানের গোলা এবং রাইফেলের গুলী যেমন লাটিমের মত পাক খাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে ছোটে, মর্টারের গোলা ঠিক সেইভাবে পাক খায় না। এইগুলি সোজা আকাশে উঠিয়া আবার দ্রুত বেগে নীচের দিকে গিয়া পড়ে। মর্টার হইতে কেবল উগ্র বিস্ফোরক গোলাই নিক্ষিপ্ত হয় না, ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য অনেক সময় ধূমোৎপাদক গোলাও ঐগুলি হইতে বর্ষিত হয়। কোথাও পশ্চাদপসরণ করিতে হইলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি হইতে স্বপক্ষের পৃষ্ঠদেশরক্ষীদিগকে আড়াল করিবার জন্য মেশিনগানের সঙ্গে মর্টার চালান হয়।

মর্টারের উন্নতির জন্য বিভিন্ন দেশে নানা চেষ্টা করা হইতেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এদিক দিয়া অনেকখানি অগ্রসরও হইয়াছে। রুশ রণাঙ্গনে লাল ফৌজ এমন এক শ্রেণীর ট্রেঞ্চ-মর্টার ব্যবহার করিতেছে যেগুলি হইতে একবারে ৪২টি পর্য্যন্ত গোলা বাহির হয়।

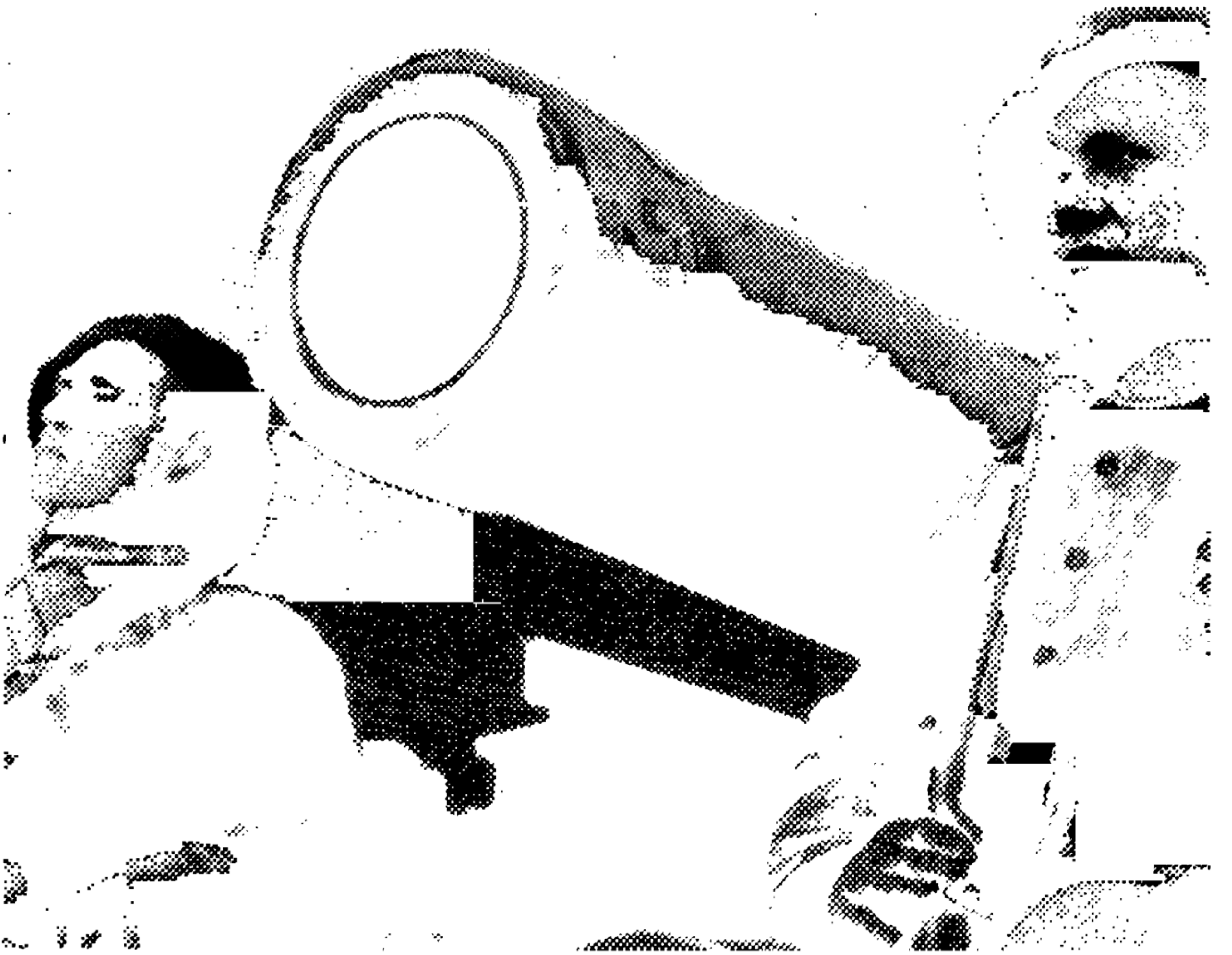
পদাতিকগণ আর দুইটি অস্ত্র ব্যবহার করে 'গ্রেনেড' এবং 'মিল্‌স্‌ বোমা'। গ্রেনেড দুই ভাবে ছোঁড়া হয়—রাইফেল সাহায্যে এবং হাতে। রাইফেলের সঙ্গে একটি বিস্ফোরণের পাত্র সংযুক্ত থাকে। তাহা ফুটাইয়া গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। এই ভাবে গ্রেনেড ছুঁড়িবার ব্যবস্থা হওয়ায় পাল্লা কিছু বাড়িয়াছে। প্রায় দুই শত গজ পর্য্যন্ত একটি গ্রেনেড যাইতে পারে। হাতে গ্রেনেড ছোঁড়ার পদ্ধতি অনেক আগেও ছিল। তবে আজকাল যে-সব গ্রেনেড হাতে ছোঁড়া হয় সেইগুলি মিল্‌স্‌ বোমারই অন্য সংস্করণ। ১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে মিল্‌স্‌ বোমা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরিখায় অবস্থিত প্রতিপক্ষকে কাছে গিয়া আক্রমণের পক্ষে এইগুলি ছিল অব্যর্থ অস্ত্র। পাকা হাত হইলে একজন প্রায় ত্রিশ গজ দূরে পর্য্যন্ত একটি মিল্‌স্‌ বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে। আকৃতি হাঁসের ডিমের মত এবং এক একটির ওজন সের দেড়েক। স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রথম এই অভিজ্ঞতা লাভ হয় যে, মিল্‌স্‌ বোমা নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় ছোট ট্যাঙ্কও ঘায়েল করা যায়। বিশেষ করিয়া কোন নগর দখলের জন্য যখন রাস্তায় ট্যাঙ্ক চলিতে থাকে তখন উপর তলা হইতে মিল্‌স্‌ বোমা নিক্ষেপ করিয়া প্রতিপক্ষের ক্ষতি করিতে আরও সুবিধা।

পদাতিক সেনার শেষ অস্ত্র 'বেয়নেট' বা সঙ্গীন। এক পক্ষ যখন অপর পক্ষের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে এবং অন্য কোন অস্ত্রই যখন আর চালাইবার অবসর থাকে না, তখন একমাত্র সঙ্গীন সাহায্যেই একে অন্যের বুকে ঝাপাইয়া পড়ে।

কামান ও গোলা

যুদ্ধে যে-সকল কামান ও গোলা ব্যবহৃত হয় সেইগুলি সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। যুদ্ধোত্তরকালে বোমারু বিমানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় অতি দূর পাল্লার বিরাট কামান প্রস্তুতের দিকে আধুনিক যুগে ঝোঁক কম। কারণ

একালের বোমারু বিমানগুলি অতি প্রকাণ্ড এক একটি বোমা লইয়া যাইয়া শত্রুপক্ষের উপর যে-ভাবে ফেলিয়া আসিতে পারে—গত মহাযুদ্ধের সময় তাহা সম্ভব ছিল না। তখন দূর হইতে বিপক্ষের নগরী বা দুর্গাদি ধ্বংসের প্রধান অস্ত্র ছিল কামানের গোলা। গত মহাযুদ্ধে ৭৬ মাইল দূর হইতে জার্ম্মানরা প্যারিস নগরীর উপর কামানের গোলা ফেলিয়াছিল। উক্ত



একটি অতিকায় কামান

কামানের গোলার এক একটির ওজন ছিল ২৫৬ পাউণ্ড। ঐ গোলার গতি-বেগের কথা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়; প্রতি সেকেণ্ডে সেইগুলি ৫ হাজার ফুট অতিক্রম করিত। ৫৫ ডিগ্রী কোণে মুখ রাখিয়া কামান দাগা হইত—ফলে গোলা বহু উর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলের অতি লঘুস্তর দিয়া ছুটিত। তাহাতে

বায়ুর বাধা কম পাইয়া গোলার গতিবৃদ্ধি হইত। এইভাবে ভূপৃষ্ঠ হইতে গোলা প্রায় চব্বিশ মাইল উপরে উঠিত। কিন্তু এই গোলা ছুঁড়িতে কামানের উপর এত বেশী চোট পড়িত যে, ত্রিশটি গোলার বেশী কিছুতেই ছোঁড়া যাইত না। উহাতেই কামান বিকল হইয়া পড়িত। এতদ্ব্যতীত আবহাওয়ার উপরও অনেকখানি নির্ভর করিতে হইত। কামানের নূতন অবস্থায় কয়েকটি গোলা প্রথম দিকে হয় তো গিয়া লক্ষ্যের উপর ঠিক মতই পড়িত ; কিন্তু পরে গোলা গিয়া আর নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌছিতে পারিত না। এত সব অসুবিধার দরুণই আজকাল অতদূরে কামানের গোলা পৌছাইবার চেষ্টা না করিয়া বোমারু বিমান সাহায্যে কার্য্যসাধনের চেষ্টা হয়। পঁচিশ ত্রিশ মণ ওজনের এক একটী বোমা আজকাল বোমারু বিমানগুলি বহুদূরে যাইয়া অনায়াসেই ফেলিয়া আসিতে পারে ; কামানের গোলা কিছুতেই ততদূর যাইতে পারে না। বড় কামান দাগিতে খরচও পড়ে বিস্তর। একটী গোলা ছুঁড়িতে যে বারুদ পোড়াইতে হয় তাহার দাম পড়ে প্রায় হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ তেরচৌদ্দ হাজার টাকা। কাজেই বোমারু বিমান না পাঠাইয়া অত্যধিক দূরে কামান দাগিতে গেলে যতটা খরচান্ত হইতে হয়, কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা ততটা থাকে না।

পূর্ব্বে হাউইটজার ও কামানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল ; কারণ হাউইটজার হইতে যে গোলা ছুটিত সেইগুলি বহু উর্দ্ধে উঠিয়া তারপর অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া লক্ষ্যস্থলের দিকে নামিয়া আসিত। আর কামান হইতে গোলা বাহির হইয়া প্রায় সোজাসুজি ছুটিত। হাউইটজারের গোলার গতিবেগ ছিল কম এবং কামানের গোলার গতিবেগ ছিল সেই তুলনায় ঢের বেশী। অপেক্ষাকৃত মৃদু বারুদে হাউইটজার হইতে গোলা দাগা যাইত ; কাজেই চোট কম পড়ায় হাউইটজারগুলি টিকিত বেশী গোলাকে দ্রুতগামী করিবার জন্য কামান দাগিতে বারুদের চোট বেশী পড়িত বলিয়া কামানগুলি সকালেই নষ্ট হইয়া যাইত।

আজকাল কিন্তু আর এইসব কিছুই নাই। এখন সকল কামানই লোহার কাঠামোর উপর এমন ভাবে বসান হয় যাহাতে কামানের মুখ যতদূর ইচ্ছা উঁচু করিয়া গোলা দাগা যায়। ইহাতে



হাউইটজার

অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বারুদ পোড়াইয়াও কামানের গোলাকে উহার চরম লক্ষ্যে পাঠান চলে। কাজেই উগ্র বারুদের চোটে কামানগুলি

অল্পেই আর বিকল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই দিক দিয়া হাউইটজার ও কামানে আজকাল পার্থক্য বড় বিশেষ কিছুই নাই।

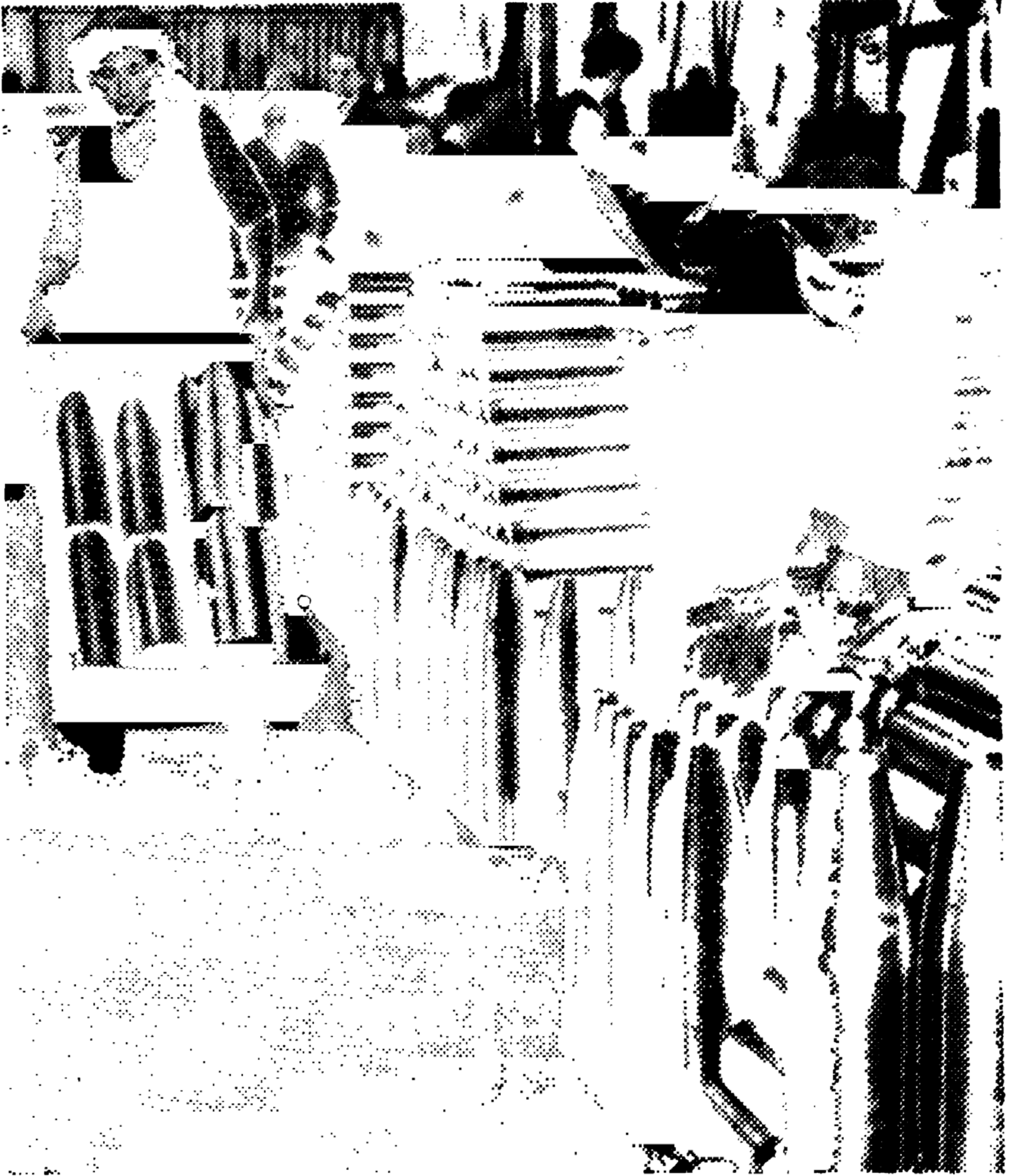
আধুনিক যুদ্ধে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন রূপ কামানের গোলা বা 'শেল' ব্যবহৃত হয়। মুখচোখা সাধারণ গোলা ; উগ্র বিস্ফোরক গোলা ; বুলেট গোলা ; কঠিন বর্ম্মভেদী গোলা ; গ্যাস গোলা ; ধূমোৎপাদক গোলা ; তারা গোলা ; আগ্নেয় গোলা ; প্যারাশুট গোলা প্রভৃতি কত রকম গোলাই না আছে ! এইগুলির এক একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

মুখচোখা সাধারণ গোলাগুলি ব্যবহৃত হয় পাতলা বর্ম্মভেদের উদ্দেশ্যে। এইগুলির মুখে ফিউজ না বসাইয়া গোড়ার দিকে বসান হয় ফিউজ। মুখে বসান হয় শক্ত ইস্পাতের টোপর—আর ভিতরে ভরিয়া দেওয়া হয় বিস্ফোরক। খুব পুরু বর্ম্ম না হইলে তাহা ফুটা করিয়া ইহা ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাহার পর বিস্ফোরণ হয়। গোড়ার দিকে ফিউজ দেওয়ায় আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ না হইয়া গোলা ভিতরে প্রবেশ করিলে পর বিস্ফোরণ হয়।

উগ্র বিস্ফোরক গোলার কিন্তু মাথা অথবা গোড়া দুই দিকেই ফিউজ দেওয়া চলে। আবার কোন কোন স্থলে দুই দিকেই দুইটি ফিউজ বসান থাকে। এই শ্রেণীর গোলার মধ্যে অতি উগ্র বিস্ফোরক ভরিয়া দেওয়া হয়।

বুলেট গোলাগুলিকে ইংরাজীতে বলে 'শ্র্যাপনেল'। এইগুলির মধ্যে লোহার বল ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। এমন ভাবে ফিউজ বসান হয় যাহাতে গোলাটি নির্দ্দিষ্ট দূরে গিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনা আপনি বিস্ফোরিত হয়। গোলাটি বিস্ফোরিত হইলেই উহার অভ্যন্তর হইতে বিস্ফোরণের ধাক্কা খাইয়া লোহার বলগুলি বুলেটের মত ছুটিতে থাকে। এই গোলার দ্বারা বন্দুকের গুলীর কাজ হয় ; কাজেই শত্রুপক্ষের সৈন্যদিগকে দূর হইতে গুলীবিদ্ধ করিতে হইলে এই গোলার ব্যবহারই সুবিধাজনক। বিমানধ্বংসী কামানেও এই শ্রেণীর গোলা ব্যবহৃত হয়।

কঠিন বর্ম্মভেদী গোলাগুলির মুখ অতি শক্তধাতুতে নির্ম্মিত হয়। মুখের দিকে একটুও ফাঁপা থাকে না। তাহার উপরে আবার পরান হয়



অস্ত্রের কারখানায় কামানের গোলার খোল প্রস্তুত হইতেছে

ইস্পাতের চোখা টোপর। ফলে যাহার উপর ঐগুলি গিয়া পড়ে তাহা ভেদ করিয়া ভিতরে চলিয়া যায় এবং পরে ভীষণ ভাবে বিস্ফোরিত হয়। এই শ্রেণীর গোলার মধ্যে অতি উগ্র বিস্ফোরক ভরা থাকে।

বোমা ও গ্যাস প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে গ্যাস-গোলার কথা বলিয়াছি। ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় ধূমোৎপাদক গোলার। আর শত্রুপক্ষকে আগুনে পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয় আগ্নের গোলা। গ্যাস এবং ধূমোৎপাদক গোলাগুলিতে এমন ভাবে ফিউজ বসান থাকে যাহাতে কোন কিছুর সহিত সংঘর্ষ হওয়ামাত্রই গোলাটি ফাটিয়া যায়। আগ্নেয় গোলার দুই রকম ফিউজই ব্যবহৃত হয়। ফলে কোন গোলা সংঘাতমাত্রই বিদীর্ণ হয় এবং কোনটি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলে তবে ফাটিয়া যায়।



তারা-গোলার বিস্ফোরণে বিচ্ছুরিত আলো

আর এক প্রকার আছে তারা-গোলা। রাত্রির অন্ধকার দূর করিবার জন্য এই শ্রেণীর গোলা ব্যবহৃত হয়। নৈশ আক্রমণের সময় প্রায়ই অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে গোলা ছুঁড়িতে হয়। ইহাতে বিস্তর গোলাগুলী যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বৃথা অর্থ নষ্ট হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ ভাবে গোলাবারুদের অপচয় নিবারণের জন্যই তারা-গোলার দরকার হইয়াছে। এই শ্রেণীর গোলার গোড়ার দিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফস্‌ফরাসের আবরণ থাকে। ফলে কামান দাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলা অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত করিয়া শত্রুবাহিনীর উপর গিয়া পড়ে। উক্ত ফস্‌ফরাসের প্রলেপ হইতে এতই আলো বিচ্ছুরিত হয় যে, শত্রুপক্ষের অবস্থান স্বপক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। সুতরাং ঘোর অন্ধকার রজনীতেও তুমুল সংগ্রামের সময় আন্দাজে কামান দাগিয়া অনর্থক বারুদ খরচের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই তারা-গোলা ছুঁড়িয়া শত্রুপক্ষের অবস্থান ও ব্যবস্থাদির সকল

খুঁটিনাটি জানিয়া লইয়া সেই অনুসারে উপর্য্যুপরি যত ইচ্ছা কামান দাগা যায়।

কিছুদিন আগে শুনা গিয়াছিল, আমেরিকায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আর এক প্রকার নূতন গোলার আবিষ্কার হইয়াছে। ঐগুলিকে বলা যায় প্যারাশুট গোলা। দেখিতে উহা সাধারণ গোলারই মত; কামান হইতে ছুঁড়িলে আকাশে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। আকাশে উঠিলেই গোলার মুখটি খুলিয়া যায় এবং উহার ভিতর হইতে প্যারাশুট বাহির হয়। গোলার ভিতরে ইস্পাতের ফিতা গুটান থাকে। ফিতার এক মুখ আটকান থাকে প্যারাশুটের সহিত। প্যারাশুট ছাড়া পাইয়াই ফিতা টানিয়া বাহির করে এবং আকাশে উড়িয়া চলে। কোন বিমানের চাকায় লাগিলেই উক্ত ফিতা তাহাতে জড়াইয়া যায়; ফলে বিমান অচল হইয়া পড়ে। এইরূপ একাধিক গোলা ছুঁড়িলে অন্তরীক্ষে যে লৌহজাল সৃষ্টি হয় তাহা অতিক্রম করা কোনও বিমানের পক্ষে সত্যই কঠিন।

যথাসময়ে এবং যথাস্থানে কামানের গোলা ফাটাইবার জন্য দরকার হয় ফিউজ বা পলিতার। মারাত্মক বিস্ফোরকপূর্ণ কামানের গোলা নাড়াচাড়ার সময় অথবা কামান দাগিবার কালে চোঙ্গার মধ্যেই যাহাতে উহা বিদীর্ণ না হয় তজ্জন্য ফিউজ বসান থাকে। ফিউজের সাহায্য ব্যতীত আধুনিক বিস্ফোরকপূর্ণ মারণাস্ত্রগুলি কিছুতেই ফাটে না। ফিউজকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: সংঘাত-ফিউজ ও বিলম্বিত ফিউজ। কামানের গোলা বা বোমা কোন কিছুর উপর পড়িলে আঘাতের ফলে যখন ফাটিয়া গেল তখনই বুঝিতে হইবে উহাতে সংঘাত-ফিউজ বসান ছিল। অর্থাৎ ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—সংঘাত-ফিউজযুক্ত কামানের গোলা বা বোমা কোন কিছুর উপর পড়িলে উহার সম্মুখভাগে যে চোট লাগে তাহাতে ভিতরে একটি সূচ যাইয়া ডিটোনেটরে খোঁচা দেয়। ফলে কামানের গোলা বা বোমা ফাটিয়া যায়। সংঘাত-ফিউজের মধ্যেও তারতম্য আছে। কোনটি

কম চোটেই সক্রিয় হয়—আবার কোনটিকে সক্রিয় করিতে দরকার হয় বেশী চোটের।

কামান দাগিবার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহাতে গোলা বিস্ফোরিত হয় তজ্জন্য প্রয়োজন হয় বিলম্বিত ফিউজের। কোন কিছুর সহিত আঘাত না লাগিলেও নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলেই এই ফিউজযুক্ত কামানের গোলা আপনা আপনি বিস্ফোরিত হইবে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, মারণাস্ত্রের মাথায় ও গোড়ায় দুই দিকেই ফিউজ বসান চলে। যে-সকল মারণাস্ত্রের কোন কিছুর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া উপরেই ফাটিয়া যাওয়া দরকার সেইগুলিরই সাধারণতঃ মুখের দিকে ফিউজ বসান হয়। এই জন্যই গ্যাসগোলা প্রভৃতির মুখের দিকে ফিউজ বসান থাকে এবং কোন কিছুর উপর পড়িবামাত্রই এইগুলি ফাটিয়া যায়। আর কঠিন লৌহবর্ম্ম, কংক্রীটের প্রাচীর প্রভৃতির ন্যায় সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিবার জন্য যে-সব গোলাগুলী ব্যবহৃত হয় সেইগুলির গোড়ায় বা পশ্চাৎদিকে বসান থাকে ফিউজ ; কারণ সেক্ষেত্রে মাথায় ফিউজ বসাইলে তাহা আঘাত সহ্য করিতে অক্ষম হয়।

বেশীরভাগ কামানের গোলাই সংঘাতের ফলে বিদীর্ণ হয়। বিলম্বিত ফিউজ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বিমানধ্বংসী গোলা ও শ্র্যাপনেলে। আবার ভূপৃষ্ঠে যে-সকল শ্র্যাপনেল ব্যবহৃত হয় সেগুলি বিস্ফোরিত হয় সংঘাতেরই ফলে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোলা ফাটাইবার জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটি বারুদের পলিতা পোড়ান হয়। উক্ত পলিতা পোড়া শেষ হইলেই সামান্য একটু বিস্ফোরণের ফলে ডিটোনেটর সক্রিয় হইয়া কামানের গোলাকে বিস্ফোরিত করে। এতদ্ব্যতীত বারুদ না পোড়াইয়া অতিসূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কামানের গোলাকে বিস্ফোরিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

কামানের জন্য সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর বিস্ফোরক দরকার হয়। কামান দাগিয়া গোলাকে দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য যে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়,

উহাকে বলে 'প্রোপেলাণ্ট'। এই শ্রেণীর বিস্ফোরক খুব বেশী উগ্র নয়; কারণ বেশী উগ্র হইলে উহা কামানের চোঙ্গাকে ফাটাইয়া ফেলে। কামানের গোলাকে জোরে ধাক্কা দিবার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন এই বিস্ফোরক তেমন ভাবেই প্রস্তুত হয়। আর কামানের গোলার মধ্যে যে বিস্ফোরক ভরা হয় তাহা অতি উগ্র। উহার বিস্ফোরণে কামানের গোলার লৌহাবরণ ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। তবে শ্র্যাপনেল শ্রেণীর গোলার মধ্যে উগ্র বিস্ফোরকের পরিবর্ত্তে মৃদু বিস্ফোরক ব্যবহার করিতে হয়; কারণ শ্র্যাপনেলের লৌহ আবরণ ফাটাইবার প্রয়োজন নাই বা ফাটিলে কার্য্যোদ্ধারও হয় না। শ্র্যাপনেলের কাজ হইল যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার মধ্যে বিস্ফোরণের দ্বারা লোহার বলগুলিকে সম্মুখের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত করা। কামান দাগিবার সময় বিস্ফোরণের ফলে কামানের চোঙ্গা ফাটিয়া গেলে যেমন গোলা আর ছোটে না—তেমনই বিস্ফোরণে শ্র্যাপনেলের আবরণ বিদীর্ণ হইলে উহার অভ্যন্তরস্থ লোহার বলগুলিও আর সম্মুখের দিকে ধাবিত হয় না। এইজন্যই শ্র্যাপনেলে উগ্র বিস্ফোরকের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত মৃদু বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়।

কামানের গোলার মধ্যে—শুধু কামানের গোলা কেন, আধুনিক প্রায় সকল প্রকার মারণাস্ত্রেই—আজকাল ট্রাই-নাইট্রো-টোলুয়েন নামে এক প্রকার অতি উগ্র বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়। ইহা সাধারণতঃ টি-এন-টি নামে পরিচিত। এই বিস্ফোরক আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা তরল আকারে কামানের গোলার মধ্যে ভরা হয় এবং পরে ইহা জমিয়া কঠিন আকার ধারণ করে। শত হাতুড়ীপেটা করিলেও ইহা বিস্ফোরিত হয় না যতক্ষণ না ইহার বিস্ফোরণ-যন্ত্রটি সক্রিয় হয়। ইহাকে সক্রিয় করিবার জন্যই দরকার হয় ফিউজ বা পলিতার। নাইট্রিক এসিডে দ্রবীভূত পারদের সহিত কোহল মিশ্রিত যে রাসায়নিক পদার্থ বিস্ফোরণ-যন্ত্রের মধ্যে থাকে, তাহার সহিত মূল বিস্ফোরকের যোগাযোগ ঘটাইয়া দেয় ফিউজ বা পলিতা। তাহারই

ফলে হয় বিস্ফোরণ। যতক্ষণ এই যোগাযোগ না হয় ততক্ষণ বিস্ফোরণের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

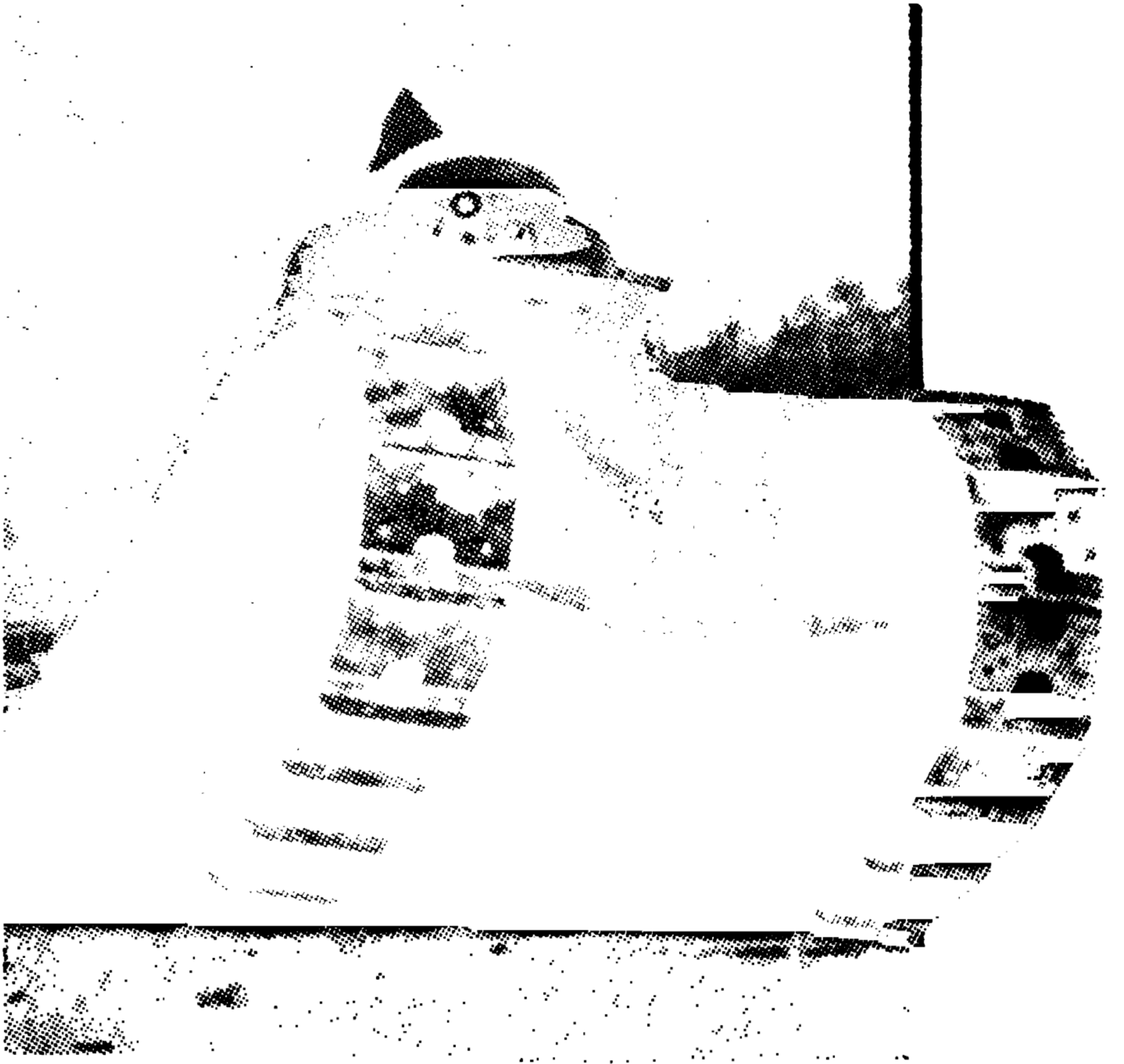
বিমান হইতে যে বোমা ফেলা হয় তাহাও কামানের গোলার মতই ফিউজের সাহায্যে ফাটে। কামানের গোলা ও বোমার মধ্যে পার্থক্য এই-টুকু যে, কামানের গোলা যত প্রচণ্ড গতিতে যাইয়া লক্ষ্যস্থলের উপরে পড়ে, বোমা ততখানি প্রচণ্ড গতিতে পড়ে না। কামানের গোলাগুলি গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২ হাজার ফুট অতিক্রম করে, আর সেই ক্ষেত্রে বিমান হইতে কোনও বোমা প্রতি সেকেণ্ডে কোনক্রমেই হাজার বারশত ফুটের বেশী নীচের দিকে নামিয়া আসিতে পারে না। এই গতিবেগের তারতম্য হিসাব করিয়াই কামানের গোলা ও বোমার ফিউজের মধ্যে যা পার্থক্য করা হয়। ইহা ছাড়া আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কামানের গোলা যেমন ধাক্কা খাইয়া ছোটে, বোমা ছাড়া পাইবার কালে তেমন কোন প্রচণ্ড ধাক্কা খায় না। এজন্য কামানের গোলাসমূহকে অত্যন্ত আঘাতসহ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা ছাড়া কামানের গোলা এবং বোমায় পার্থক্য বড় বিশেষ কিছুই নাই।

ট্যাঙ্ক

য়ুরোপে গত মহাযুদ্ধের সময় লৌহকূর্ম্ম ট্যাঙ্কের আবির্ভাব হয়। ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল তখনই যখন দেখা গিয়াছিল যুদ্ধরত উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলী চলিয়াছে বিস্তর, কিন্তু কেহই কাহারও দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না একটুও। সেই অগ্নিবর্ষণের মধ্যে অগ্রসর হইবার জন্যই সৃষ্টি হইল ট্যাঙ্কের।

ট্যাঙ্কগুলিকে সোজা কথায় বলা যায় এক একটি ছোটখাট চলন্ত লৌহ-দুর্গ। মহাযুদ্ধের পর গত পঁচিশ বৎসরে জার্ম্মানী এবং রুশিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে ট্যাঙ্কবাহিনী গঠন করে। ট্যাঙ্কের উন্নতিও হইয়াছে যথেষ্ট। পূর্ব্বে ট্যাঙ্ক

ঘণ্টায় দশ মাইলের অধিক অগ্রসর হইতে পারিত না; এখন ঘণ্টায় উহা প্রায় ত্রিশ মাইল অগ্রসর হইতে পারে। পূর্ব্বে পনর মাইল গেলেই ট্যাঙ্কের তেল ফুরাইয়া যাইত; পুনরায় তেল ভরিয়া না লইলে তাহার আর চলা



ফ্রান্সের একটি বিরাট ট্যাঙ্ক

সম্ভব হইত না। এখন একবার তেল ভরিয়া লইলেই সে একশত পঁচিশ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে। আগের দিনের ট্যাঙ্কগুলি মাত্র আধ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতে আচ্ছাদিত থাকিত, আর আজকাল সেই আচ্ছাদনের পাত

থাকে দেড় ইঞ্চি পুরু। আধুনিক ট্যাঙ্কগুলি চালাইতেও খুব সুবিধা এবং কোন সঙ্কটমুহূর্ত্তে বিগড়াইয়া যাইয়া এগুলি ফ্যাসাদও ঘটাইয়া বসে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত কোন কোন সমর বিশেষজ্ঞের ধারণা ছিল, ফ্রান্সের ট্যাঙ্কই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফ্রান্সের ট্যাঙ্কবহরে হাল্‌কা ধরণের ট্যাঙ্কের সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাহার কারণ গত মহাযুদ্ধে ঐ ধরণের ট্যাঙ্কই তাহার কাজে আসিয়াছিল বেশী। ফ্রান্স বৃহদাকারের কতকগুলি ট্যাঙ্কও প্রস্তুত করায়। সেইগুলি আয়তনে যেমনই বড়, ওজনেও তেমনই বেশী। ফ্রান্সের ছোট ট্যাঙ্কগুলির এক একটির ওজন আট নয় টনের অধিক নয়; আর ফ্রান্স যে-সকল বড় ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করায় সেইগুলির এক একটির ওজন প্রায় ষাট সত্তর টন। ইহাতেই বুঝা যায়, এই বিরাট লৌহদানবগুলি এক একটি কি বস্তু! বৃহদাকারের এই সকল ট্যাঙ্ক পুরু লোহার পাতে আবৃত। উহাতে থাকে দুইটি করিয়া কামান আর দুইটি মেশিনগান। ঘণ্টায় ঐগুলি প্রায় কুড়ি মাইল চলে।



সাঁজোয়া গাড়ী

ফ্রান্সের অনুকরণে জার্ম্মানীও কতকগুলি হাল্‌কা ধরণের ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করায়। ফ্রান্সের উপর টেক্কা মারিবার জন্য জার্ম্মানী এত ছোট ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করায় যাহার ওজন মাত্র চার টন। উহাতে দুইজন লোক বসিতে পারে

এবং মাত্র দুইটি মেশিনগান রাখা চলে। গতির দিক দিয়াও উহা ফ্রান্সকে ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধে দেখা যায়, জার্ম্মানীর ঐ সকল ক্ষুদে ট্যাঙ্ক বড় বিশেষ কাজে আসে না। কাজেই উহার পর সে নূতন আকারের দুই প্রকার ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করায়; কতকগুলির ওজন আট টন এবং কতকগুলির ওজন বার টন। জার্ম্মানীর আট টনী ট্যাঙ্কগুলিতে হাল্কা ওজনের একটি কামান ও একটি মেশিনগান থাকে; আর বার টনী ট্যাঙ্ক-গুলিতে থাকে একটি করিয়া ছোট আকারের হাউইটজার। এ ছাড়া কতগুলি অতিকায় ট্যাঙ্কও জার্ম্মানী নির্ম্মাণ করায়।

ট্যাঙ্কবাহিনীর দিক দিয়া সোভিয়েট রুশিয়া আবার জার্ম্মানীর সঙ্গে পাল্লা



রুশিয়ার উভচর ট্যাঙ্ক। ইহা স্থলে জলে সমান ভাবেই বিচরণ করিতে পারে

দেয়। রুশিয়ার ট্যাঙ্কগুলি অনেকটা ফ্রান্সের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। তবে সোভিয়েট রুশিয়া ট্যাঙ্কনির্ম্মাণের দিক দিয়া কিছু নূতনত্বও না দেখায় এমন নয়। তাহার নূতন ধরণের ট্যাঙ্কগুলি জলকাদা ভাঙ্গিয়াও অগ্রসর হইতে পারে; কাজেই কোন দেশকে বন্যাপ্লাবিত করিয়া সোভিয়েটের ট্যাঙ্ক-

গুলিকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। ইতালীও ঐ ধরণের কতকগুলি ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করায়। ইতালীর ট্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই হালকা ধরণের; সেইগুলির গতি খুব বেশী এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে বন্ধুর পথ অতিক্রমেও সেইগুলি পটু। বৃটিশ ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়াও যেমন কঠিন, দেওয়াও মোটেই তেমনই নিরাপদ নয়। তবে মোটামুটি যতটুকু সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ছোট বড় সকল রকম ট্যাঙ্কই বৃটেনের রহিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় ট্যাঙ্কচালনায় যে-সকল অসুবিধা দেখা গিয়াছিল, বৃটেনের নবনির্ম্মিত ট্যাঙ্কগুলিতে সেই সকল অসুবিধা দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। 'মার্ক এইট' নামক একটি বড় বৃটিশ ট্যাঙ্কের বিবরণ দিলেই বৃটেনের ট্যাঙ্কগুলির আকার ও অস্ত্রসজ্জার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। যে ট্যাঙ্ক-খানির কথা বলিলাম, উহার ওজন ৩৭ টন। লম্বায় উহা ৩৫ ফুট। উহাতে ৮ জন লোকের বসিবার স্থান আছে। ঐ ট্যাঙ্ক অনায়াসে ১৩ ফুট চওড়া খাদ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারে। উহার এঞ্জিনের শক্তি তিন শত অশ্বশক্তির সমান। উহাতে থাকে দুইটি ছয় পাউণ্ডার কামান, দুই শত শেল এবং সাতটি মেশিনগান। মেশিনগানগুলি হইতে মোট তের হাজার গুলী ছোঁড়া যায়। উহা যখন চলিতে থাকে মনে হয় যেন চাকার উপর একটি দুর্গ চলিয়াছে। এতদপেক্ষা বড় ট্যাঙ্কও বৃটেনের আছে। তাহার কোন কোন ট্যাঙ্কের ওজন প্রায় ৭০ টন। বৃটেনের নবনির্ম্মিত "চার্চ্চিল" ট্যাঙ্কগুলির খুব নাম শুনা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে জার্ম্মানীতে ট্যাঙ্ক লইয়া নূতন ধরণের পরীক্ষা চলে। সেখানে ছয় টন ওজনের এক প্রকার ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করা হয় যেগুলি মোটর গাড়ীর সহিত সমানে পাল্লা দিয়া ছুটিতে পারে। এইগুলি কতখানি লাফ দিয়া যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা যায়, দূর হইতে পূর্ণগতিতে ছুটিয়া গেলে উহা ২০ ফুট চওড়া পরিখা পার হইয়া যাইতে পারে। ব্রেক কষিলে ঠিক মোটরের মতই উহা লাফ দেয় এবং এক

পার হইতে অপর পারে গিয়া পড়ে। অপর পারে গিয়া পড়িবার সময় অবশ্য ট্যাঙ্কটি ভীষণ ঝাঁকুনি খায়, কিন্তু উহা এমনই মজবুত যে কিছুই উহার ভাঙ্গেচোরে না। পরিখা পার হইয়াই উহা আবার চলিতে থাকে। যুদ্ধে এই ট্যাঙ্ক কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।



একটি হাল্‌কা ট্যাঙ্ক

য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে নানা দেশে ট্যাঙ্কের মহড়া এবং কোন কোন স্থানে রণাঙ্গনেও তাহার পরীক্ষা হয়। আবিসিনিয়া এবং চীনে ইতালী ও জাপান ট্যাঙ্ক চালাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে খুবই সুবিধা করে; কিন্তু প্রথমোক্ত উভয় দেশেই ট্যাঙ্ক-আক্রমণ প্রতিরোধের সত্যিকারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয়; কিন্তু সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, রুশিয়ার ভারী ট্যাঙ্কগুলি

ইতালী ও জার্ম্মানীর হাল্‌কা ওজনের ট্যাঙ্কগুলিকে হটাইয়া দিয়াছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্পেনীয় সৈন্যগণ পেট্রোলের টীন ও মশাল সাহায্যে ট্যাঙ্কগুলিকে ঘায়েল করিয়াছে। সেখানে দ্রুতগতিতে আক্রমণ করিতে গেলেই হাল্‌কা ধরণের ট্যাঙ্কগুলিকে লইয়া ফ্যাসাদে পড়িতে হইত। অপর-দিকে রুশিয়ার বৃহদাকারের ট্যাঙ্কগুলি একটু নরম জমিতে গেলেই মাটিতে বসিয়া যাইত—আর অগ্রসর হইতে পারিত না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যে-সকল অসুবিধা দেখা গেল, জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়া পরে সেইগুলি সারিয়া লইল এবং উভয় দেশই ট্যাঙ্কশক্তি বাড়াইবার দিকে নজর দিল।

একজন ফরাসী বিশেষজ্ঞ স্পেনযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বলেন—"যেখানেই ট্যাঙ্ক-আক্রমণ প্রতিরোধের সুব্যবস্থা ছিল সেখানেই দেখা গিয়াছে, ট্যাঙ্ক-আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। ট্যাঙ্কগুলি সেই সব ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যেখানে আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল না কেবল সেখানেই দেখা গিয়াছে, ট্যাঙ্ক-আক্রমণ ষোলআনা সফল হইয়াছে।"

এইবার দেখা যাক, ট্যাঙ্ক-আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য কি কি পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। এক হইল ট্যাঙ্কের অগ্রগতি ব্যাহত করিবার জন্য পথে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় হইল গোলাগুলীর সাহায্যে ট্যাঙ্কবিনাশ।

ট্যাঙ্কের অগ্রগতি রোধের যে-সকল ব্যবস্থা আছে প্রথমে তৎসম্বন্ধেই বলি। ট্যাঙ্ক যাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে তজ্জন্য মাইলের পর মাইল কংক্রিটের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বেড়া দেওয়া হয়। এই স্তম্ভগুলি দেখিতে অনেকটা মিশরের পিরামিডের মত। এইগুলি স্থাপিত হয় আড়াআড়ি ভাবে এবং সেইজন্যই এই পিরামিডশ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া ট্যাঙ্কের অগ্রসর হওয়া কঠিন। কংক্রিটনির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণীর পশ্চাতেই থাকে সুদৃঢ় লোহার বেড়া। আজকাল বাড়ী বা পাকা পুল নির্ম্মাণে যেমন লোহার কাঠামো তোলা হয়, তেমনই বড় বড় মোটা লোহার বরগা দিয়া ট্যাঙ্ক-আক্রমণ প্রতিরোধক লৌহবেড়া নির্ম্মিত

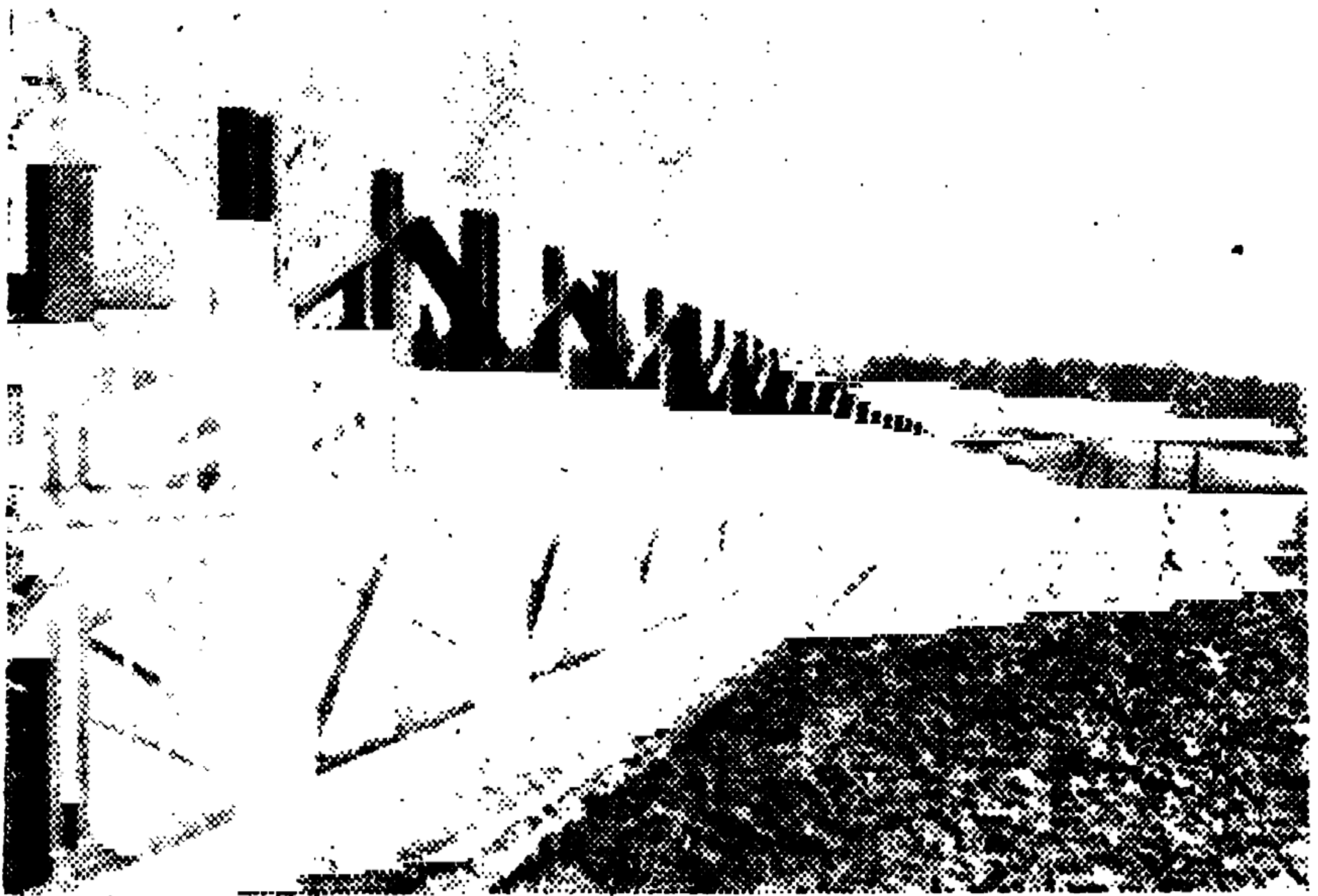
হয়। জার্ম্মানী যখন পোলাণ্ড আক্রমণ করে তখন পোলাণ্ডের এইরূপ লৌহবেড়ায় বাধা পাইয়া প্রথম দিকে জার্ম্মানীর ট্যাঙ্কবাহিনীকে বেশ একটু বিব্রতই হইতে হইয়াছিল। খুব হিসাব নিকাশ করিয়া এই বেড়া নির্ম্মাণ করিতে হয়; শত্রুপক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে একবার যদি ইহাতে ভাঙ্গন ধরে তবে দ্বিতীয় বার ইহা আর কোন কাজে আসে না। ট্যাঙ্কগুলিকে বাধা দিবার জন্য আর একটি উপায় হইল চোরা খাদ প্রস্তুত করিয়া রাখা। শিকারের জন্য লোক যেমন ফাঁদ পাতিয়া রাখে, ট্যাঙ্কগুলিকে বিপাকে ফেলিবার জন্যও তেমনই চোরা খাদ প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। উপর হইতে দেখিয়া কিছুতেই বুঝিবার সাধ্য নাই যে, কোনরূপ খাদ বা কিছু আছে। ট্যাঙ্ক আগাইয়া চলিয়াছে, কোন বিপদের কিছুই লক্ষণ নাই, ইহার মধ্যে সে অসম্মাৎ হুড়মুড় করিয়া পড়িল একটা খাদের মধ্যে। ফাঁদে পড়িয়াছে, এদিকে ওদিকে



কংক্রীট-নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী

নড়িবার উপায় নাই ; সেই সময় চলিল বিপক্ষের গুলী—নতুবা তাহার উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল শত্রুপক্ষের সশস্ত্র পদাতিক সৈন্যগণ। এই অজানা ও আকস্মিক বিপদের মধ্যে পড়িলে কোনও ট্যাঙ্কের উদ্ধার পাওয়া কঠিন।

ট্যাঙ্কের অগ্রগতি রোধের আর একটি উপায় বড়ই মজার। যে-পথে



লোহার বেড়া

ট্যাঙ্ক আসিবার সম্ভাবনা সেই পথে কুণ্ডলী আকারে কাঁটাতার বিছাইয়া রাখা হয়। এই কাঁটাতারের বেড়াজালে আসিয়া কোন ট্যাঙ্ক পড়িলে তাহার ভিতরের লোকদিগের যে কি অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা আর বলিবার নয়। কাঁটাতার বিছান রাস্তায় আসিয়া ট্যাঙ্ক পড়িলে তারগুলি অক্টোপাশের মত ট্যাঙ্কের 'ট্র্যাক' অর্থাৎ ইস্পাতের খাঁজকাটা ফিতাকে জড়াইয়া ধরে। যতই ছাড়াইবার চেষ্টা করা হয় ঐগুলি ততই যেন আরও মরণকামড় দেয়। কাঁটাতারে একবার জড়াইলে

কোন ট্যাঙ্কের ছাড়া পাওয়া মুস্কিল। সেই শৃঙ্খলিত অবস্থায় ট্যাঙ্ক যে সহজেই শত্রুর কবলে পড়িবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

জাহাজ ঘায়েল করিবার জন্য সমুদ্রে যেমন মাইন পাতা হয়, ট্যাঙ্ক বিনাশের জন্যও স্থলপথে তেমনই মাইন পাতা হয়। যে-পথ দিয়া ট্যাঙ্ক আসিবার সম্ভাবনা সেই পথের উপর অতি কৌশলে মাইন স্থাপন করা হয়। কোনও ট্যাঙ্কের সংস্পর্শে আসিলেই উক্ত মাইনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং



চোরাখাদে ট্যাঙ্ক পড়িয়াছে

ট্যাঙ্কের অবস্থা তখন যারপরনাই কাহিল হইয়া দাঁড়ায়। কেবল ট্যাঙ্কের সংস্পর্শে আসিলেই যে মাইনগুলি বিদীর্ণ হয় এমন নয়; ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য দূর হইতে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যেও মাইনগুলি ফাটান হয়।

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের খবরে জানা গিয়াছিল যে, সোভিয়েট সামরিক বিভাগ বেতার সাহায্যে দূর হইতে মাইন ফাটাইবার চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছে এবং 'পোড়া মাটির' নীতি অবলম্বনের সময় স্থান বিশেষে লাল ফৌজ ইহা প্রয়োগও

করিয়াছে। এই খবর সত্য হইয়া থাকিলে ট্যাঙ্কযুদ্ধে বেতার-মাইন এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। কিছুদিন আগে বৃটিশ সমর বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন সিরিল ফল্‌স্‌ও বলিয়াছেন যে, ট্যাঙ্কধ্বংসের জন্য মাইনের ব্যাপক প্রয়োগ হইবার খুবই সম্ভাবনা।

ট্যাঙ্কের অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য অধুনা যে-সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহারই কয়েকটি নমুনা দিলাম। এইগুলি ছাড়াও অন্য কোনরূপ কৌশল থাকা কিছু অসম্ভব নয়।

আবহাওয়ার উপরও ট্যাঙ্কের চলাচল, আক্রমণ, প্রতিরোধ ইত্যাদি অনেকখানি নির্ভর করে। জলবৃষ্টিতে রাস্তায় কাদা জমিয়া গেলে সাধারণতঃই ট্যাঙ্কগুলির অগ্রসর হইতে অসুবিধা হয়। হাল্‌কা ওজনের ট্যাঙ্কগুলি কাদা মাড়াইয়া যদিও বা অগ্রসর হইতে পারে, ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান বা বন্দুকের গুলী হইতে সেগুলির অব্যাহতি পাওয়া কঠিন; কারণ হাল্‌কা ট্যাঙ্কের লৌহাবরণ এমন পাতলা থাকে যে, অতি সহজেই ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামান বা বন্দুকের গুলীতে তাহা ভেদ হয়। আবার জলকাদার মধ্যে ভারী ট্যাঙ্কগুলি চালাইতেও অসুবিধা; বিশাল বপুর ওজনে উহার চাকাগুলি সহজেই কাদার মধ্যে বসিয়া যায়। অর্থাৎ কাদায় পড়িলে হাতীর যে অবস্থা উহারও ঠিক তাই—না পারে আগাইতে না পারে পিছাইতে।



কাঁটাতারের কুণ্ডলী

এইবার ট্যাঙ্কধ্বংসের যে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বলি। আগ্নেয়াস্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়: এক প্রকার হইল

লাইট রাইফেল বা অটোমেটিক রাইফেল এবং আর এক প্রকার হইল ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান। ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেলগুলির মুখ এক ইঞ্চির অধিক হয় না ; ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানগুলির মুখ এক ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। বৃটিশ স্থলসেনার প্রতি ব্যাটেলিয়নে আজকাল অন্ততঃ বাইশটি করিয়া ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেল থাকে, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তো থাকেই। এই রাইফেলের গুলী ছোট



ট্যাঙ্কধ্বংসী ব্রেন গান

এবং মাঝারি ট্যাঙ্কের লৌহাবরণ ভেদ করিতে পারে। ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেলের গুলী ঠিক জায়গায় লাগিলে ট্যাঙ্কের লৌহাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে যাইয়া বিষম বিপত্তি ঘটায়। ভেদ করার পরও গুলীর গতি একেবারে থামিয়া যায় না ; ফলে ভিতরে যাইয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া উহা এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে। সেই অবস্থায় ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরস্থ লোকের যে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ট্যাঙ্কধ্বংসী বড় কামানগুলির মুখে পড়িলে অতিকায় ট্যাঙ্কগুলিরও নিস্তার নাই। ট্যাঙ্কধ্বংসী বড় কামানগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারে সামান্য কিছু অসুবিধা আছে। ঐগুলি হইতে গোলা ছুঁড়িবার সময় বিদ্যুতের মত আলো চমকায়; ফলে শত্রুপক্ষ ঐগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিতে পারে। কাজেই ঐগুলিকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া ব্যবহার করা কিছু কঠিন।

ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানগুলি হইতে প্রতি মিনিটে প্রায় পনরটি গোলা বর্ষণ করা যায়। এক একটি ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের ওজন প্রায় ষোল শত পাউণ্ড; হাতে ঠেলিয়াই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। তবে সাধারণতঃ যুদ্ধস্থলে স্থাপনের জন্য ছোট লরীর পশ্চাতে বাঁধিয়া এগুলি লইয়া যাওয়া হয়। লরীতে থাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ সৈন্যগণ।

ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানগুলি হইতে গোলা উপর দিকে উঠিয়া পরে নীচের দিকে পড়ে না। সব সময়ই সোজাসুজি গোলা ছুঁড়িতে হয়। গোলাগুলি সাধারণতঃ আটশত গজ পর্য্যন্ত যায়।

ট্যাঙ্কের সম্মুখ দিকটা ঢালু থাকে বলিয়া অনেক সময় ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের গোলা উহার গায়ে নাও লাগিতে পারে। গোলাগুলি সাধারণতঃ ভূমির সমান্তরাল ভাবে ছোটে; কাজেই লক্ষ্যচ্যুত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। এইজন্যই কোনও পরিখা, খাল বা ডোবার কাছাকাছি ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানগুলি পাতা হয়। বিপক্ষের ট্যাঙ্ক সেই পরিখা বা খাল পার হইয়া যখন উপর দিকে উঠিতে থাকে তখন ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ও রাইফেল হইতে গোলাগুলী চালান হয়। সেই ক্ষেত্রে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি কম। অবশ্য ভেড়ার পাল তাড়াইয়া আনিবার মত বিপক্ষের ট্যাঙ্কগুলিকে ঐরূপ বিপজ্জনক স্থানে লইয়া আসিবার জন্যও নানারূপ কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। এমন ভাবে মাইন পাতিয়া রাখা হয় এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয় যাহাতে বিপক্ষের ট্যাঙ্কগুলি অন্য দিকে না যাইয়া ঐ বিপজ্জনক স্থানের দিকেই

অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। ঐভাবে তাড়াইয়া আনিয়া ট্যাঙ্কগুলিকে বিপদের মধ্যে ফেলিবার কৌশল সত্যই বড় চমৎকার।

ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান দাগিবার গোলন্দাজ সৈন্য যাহাতে বিপক্ষের গুলীতে ধরাশায়ী না হয় তন্নিমিত্ত কামানেরই সহিত সংলগ্ন একটি লৌহ-আচ্ছাদন



ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান

থাকে। সেই আচ্ছাদনের আড়ালে বসিয়া গোলন্দাজ সৈন্য ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান দাগে। যে চাকার উপর কামান বসান থাকে গোলা ছুঁড়িবার সময় তাহা খুলিয়া ফেলিয়া কামানটিকে মাটিতে বসান হয়। কামানটি এমন কৌশলে কলের উপর স্থাপিত, যে, ইচ্ছা মত উহাকে চারিদিকেই ঘুরান

যায়। কলকব্জার দিক দিয়া এমনই সহজ করা হইয়াছে যে, একজন নূতন লোকের পক্ষে ঐগুলি আয়ত্তে আনিতে কয়েকদিনের বেশী সময় লাগে না। শত্রুপক্ষের দৃষ্টিপথে যাহাতে না পড়ে তজ্জন্য কামানগুলিকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাখা হয়—নতুবা ডালপালা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

আগে ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান কেবল আত্মরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হইত এবং সেইজন্য সৈন্যদলে ঐগুলির স্থান ছিল পশ্চাৎ দিকে। কিন্তু আজকাল আক্রমণের অস্ত্র হিসাবেও ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ব্যবহার করা হয়। ট্রাকে বসান কামানগুলি স্বপক্ষের হানাদার ট্যাঙ্কসমূহের ঠিক পিছনেই চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং কামানের শক্তিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

পরিশেষ

যুদ্ধ ক্রমশঃই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে। বিখ্যাত সমর বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স বার্নার বলেন, "১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় প্রধান শক্তিবর্গের মোট প্রায় ২৫ হাজার রণবিমান এবং ২৫ হাজার ট্যাঙ্ক ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই প্রধান চারি শক্তির মোট বিমানসংখ্যা ৮০ হাজার এবং ট্যাঙ্কসংখ্যা ৫০ হাজারে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এই চারি শক্তির দেড় লক্ষ রণবিমান এবং ৭০ হাজার ট্যাঙ্ক হইবার কথা।"

বর্ত্তমানে এই অবস্থা। ভবিষ্যতে মানুষের বিজ্ঞানী বুদ্ধি উত্তরোত্তর যুদ্ধকে আরও কতখানি ভয়াবহ করিয়া তুলিবে নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও ইতিমধ্যেই সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের যেটুকু পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছে—তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। সেই ভাবীকালের সমরোপকরণ সম্পর্কেই এখানে দুই চারিটি কথা বলিব।

এমন একদিন হয় তো আসিবে—একটি রশ্মিপাতেই কোন বিমান ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে—আকাশে আগুনের মেঘ উড়িয়া চলিবে—ডুবো-জাহাজ আকাশে বিচরণ করিবে—বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া টর্পেডো ছুটিয়া চলিবে—ট্যাঙ্কগুলি পাখীর মত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইবে—একটা শব্দই মানুষের মৃত্যুবাণ হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার অধিকাংশই আজও কল্পনা মাত্র; কিন্তু যে কয়েকটি বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন তাহাও কম বিস্ময় উৎপাদন করে না।

প্রথমেই বলা যায় বেতার-চালিত বিমানের কথা। আমেরিকায় ইহা লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকগণ এদিক দিয়া অনেকখানি সফলকামও হইয়াছেন। বিমান চলিবে বেতারে—উহাতে কোন চালক

থাকিবে না। বিমানের মধ্যে রাখা হইবে দুইটি বেতারগ্রাহক যন্ত্র; একটি এঞ্জিনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং অপরটি করিবে হাইলের কাজ। ভূপৃষ্ঠে থাকিবে দুইটি বেতার প্রেরকযন্ত্র। উহা দ্বারা সিগ্‌নালের কাজ হইবে। প্রথম পরীক্ষায়ই দেখা গিয়াছে, ইহা বিশেষ সাফল্যের সহিত দুই-মাইল পথ অতিক্রমে সক্ষম হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো ইহা মাইলের পর মাইল, দেশ হইতে দশান্তরে উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইবে। সেইদিন যুদ্ধে করিবে ইহা মহাতঙ্কের সৃষ্টি। এক একটি বিমানই হইবে এক একটি বোমা। হয় লক্ষ্যস্থলের উপর গিয়া ইহা ফাটিয়া পড়িবে—নয় তো কোথাও ভূমিতে অবতরণ করিবার পর বিস্ফোরিত হইবে। কোনটির মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইবে গ্যাস, কোনটিতে থাকিবে উগ্র বিস্ফোরক—আবার কোনটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু। বিমানধ্বংসী কামানের গোলা যদি উহাতে লাগে ক্ষতি নাই; ফাটিয়া গিয়া উহা স্বকার্য্য সাধন করিবেই। বৈমানিক-চালিত বিমানগুলিকে তখন অন্তরীক্ষে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, কেন না এই বিমান-বোমা কখন ফাটিয়া গিয়া কি ফ্যাসাদ ঘটাইবে কে জানে!

শুনা যায়, বিমানধ্বংসের জন্য নানারূপ রশ্মি লইয়াই পরীক্ষা চলিয়াছে। এক রকম রশ্মি ফেলিলেই নাকি বিমানের কলকব্জা বিগড়াইয়া যাইতে পারে। আর এক প্রকার অত্যুজ্জ্বল রশ্মি ফেলিলে সৈন্যেরা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাইবে। আবার সার্চ্চ লাইট হইতে নাকি এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মিও ফেলা যাইতে পারে। রাত্রিতে বিপক্ষের বিমান ও জাহাজের উপর ঐ অদৃশ্য রশ্মি ফেলিয়া সব দেখিয়া লওয়া চলিবে, কিন্তু বিপক্ষের লোক তাহার কিছুই টের পাইবে না। শুধু কি তাই! মানুষমারা শব্দ আবিষ্কারেরও চেষ্টা চলিয়াছে। এক প্রকার যান্ত্রিক শব্দ শুনিবামাত্রই নাকি মানুষের পঞ্চত্ব ঘটিবে। গবেষণাগারে ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর ইহার পরীক্ষা চলিয়াছে—মানুষের উপর প্রয়োগ এখনও হয় নাই।

বিমানধ্বংসের আরও একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কামানের গোলা সাহায্যে আকাশে ধূলিকণার মত এক প্রকার অদৃশ্য ধাতবরেণু বিস্তার করা হইবে। বায়ুর সহিত মিশিয়া উক্ত রেণু যদি উড়ন্ত বিমানের গ্যাসোলিন-এঞ্জিনে প্রবেশ করে তবে এঞ্জিন বিকল হইয়া পড়িবে। ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জার্ম্মানী চেষ্টা করিতেছে ষ্টীম-এঞ্জিনে বিমান চালান যায় কি না; কারণ ষ্টীম-এঞ্জিনে গ্যাসোলিন-এঞ্জিনের মত বাহির হইতে বাতাস লইতে হয় না—কাজেই ধাতবরেণুতে উহার বিগড়াইবার সম্ভাবনা নাই।

ইতালীর মানুষচালিত টর্পেডো লইয়াও এপর্য্যন্ত কম জল্পনাকল্পনা হয় নাই; খবর রটে যে, ইতালী নূতন এক প্রকার টর্পেডো বাহির করিয়াছে যেগুলি মানুষ লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি চালাইয়া লইয়া যাইবে। লক্ষ্যের নিকট গিয়া চালক একটি কল টিপিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। মারণাস্ত্রটি তখন বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে। জিব্রাল্টর পোতাশ্রয়ে একবার এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া গুজব রটে, কিন্তু অদ্যাবধি এ সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই।

অন্তরীক্ষে ধূমজাল সৃষ্টি করিয়া আবার বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করিবারও এক অভিনব চেষ্টা চলিয়াছে। কোনও উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দুই স্তরে ধূমজাল সৃষ্টি করিয়া উপরের স্তরে কোনও দূরবর্ত্তী কলকারখানার দৃশ্য প্রতিফলিত করা চলে। এই মায়াজাল দেখিয়াই প্রকৃত কলকারখানা বিবেচনায় বিপক্ষের বিমান হইতে বোমারুগণ আক্রমণ চালাইতে পারে। বিপক্ষকে জব্দ করিবার ফন্দীটা মন্দ নয়!

শুধু কি এইখানেই শেষ! বৈজ্ঞানিকগণ আরও আগাইয়া চলিয়াছেন। বিমানের শব্দ ধরিবার জন্য যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাকে ফাঁকি দিবার জন্যও চেষ্টা চলিয়াছে। চলন্ত বিমানে এমন এক প্রকার শব্দ হইবে যাহাতে ভূপৃষ্ঠে শব্দগ্রাহীযন্ত্র-চালকদের দিক্‌ভ্রম হয়। বিমান যদি আসে পূর্ব্ব দিক

হইতে—মনে হইবে আসিতেছে পশ্চিম দিক হইতে। তদনুসারে বিপক্ষকে ঠেকাইবার জন্য তোড়জোড় চলিবে পশ্চিম দিকে—অথচ বিপক্ষ সেই সুযোগে আসিয়া আক্রমণ চালাইবে পূর্ব্ব দিকে। যুদ্ধও যেন রূপকথার মায়ামৃগ !

আমেরিকায় আবার জাহাজকে অদৃশ্য করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। সেখানে এক বৈজ্ঞানিক নাকি এমন পন্থা বাতলাইয়াছেন যাহাতে কোন জাহাজ আর দুই শত গজের বেশী দূর হইতে দেখা না যায়। যুদ্ধে কোন জাহাজের উপর আক্রমণ চালাইতে হইলে অন্ততঃ দুই তিন শত গজ দূর হইতে আক্রমণ চালাইতে হয়। কাজেই সত্যই যদি জাহাজকে অদৃশ্য করা সম্ভব হয় তবে জলযুদ্ধে ইহা এক নূতন বিস্ময় সৃষ্টি করিবে।

যে-সকল প্রচেষ্টার কথা এখানে বলিলাম এইগুলির অধিকাংশই আজও ভবিষ্যতের কথা ; কিন্তু ভবিষ্যৎ যে অচিরেই বর্ত্তমান হইয়া উঠিবে না—এমন কথা কি জোর করিয়া বলা যায় ?

ইঙ্গিত

এক নট=৬০৮০ ফুট

এক পাউণ্ড (ওজন)=প্রায় আধ সের

এক পাউণ্ড (মুদ্রা)=১৩৷/৪ পাই

এক টন (ওজন)=প্রায় ২৮ মণ

জাহাজী এক টন=৪০ ঘন ফুট।
